আত্মবিশ্বাস

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

আত্মবিশ্বাস আত্মবিশ্বাস আত্মবিশ্বাস

লেখক	ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী
অনুবাদক	রাশেদুল আলম
সম্পাদনা	আরিফ মাহমুদ
প্রকাশনায়	আর-রিহাব পাবলিকেশন্স
প্রকাশক	হাবিবুর রহমান শামিম

আত্মবিশ্বাস

মূল
ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

অনুবাদ
অনুবাদক : রাশেদুল আলম
শিক্ষক : শান্তিপুর আহমাদিয়া মাদরাসা, মানিকগঞ্জ

সম্পাদনা
আরিফ মাহমুদ

প্রকাশনায়
আর-রিহাব পাবলিকেশন্স

আত্মবিশ্বাস
মূল : ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী
অনুবাদক : রাশেদুল আলম
সম্পাদনা : আরিফ মাহমুদ

প্রকাশক : মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৯

প্রকাশনায় : আর-রিহাব পাবলিকেশন্স
কওমী মার্কেট, ২য় তলা ৬৫-৬৬/১, প্যারীদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১০৭০৬০২৯, ০১৮৮৫৫২২৯৮৩

প্রচ্ছদ ডিজাইন : আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পারিবেশক

Pothikshop.com
Rokomari.com
Wafilife.com
Sijdah.com
Amaderboi.com
Alfurqanshop.com
Kitabgor.com
Ruhamashop.com
Boibazar.com
Tariqzone.com
Shobdaloy.com
Islamiboi.net
Niyamahshop.com
Islamicboighor.com
helpfulshop.com

মুদ্রিত মূল্য : ৫২০ টাকা মাত্র

সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

হামদ ও সালাতের পর...

বক্ষ্যমাণ বইটি আরবের প্রখ্যাত শায়খ ড. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আরিফি হাফিযাহুল্লাহর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বক্তৃতার এক প্রাণবন্ত সংকলন "رحلة حياة"-কিতাবের সাবলীল বঙ্গানুবাদ। ড. আরিফির অনুপম ও নিপুণ বর্ণনাশৈলী ও লিখনীতে বইয়ের পৃষ্ঠার পরতে পরতে ফুটে উঠেছে নাস্তিক্যবাদী, সংশয়বাদী ও খৃস্টবাদীদের জন্যে ইসলামের সততা, যথার্থতা, নিষ্ঠা ও প্রত্যয়-প্রত্যাশার সঠিক-প্রাকৃতিক ও যৌক্তিক উপাদান এবং নিজ নিজ ভ্রান্ত মতবাদের অসাড় উপকরণ; মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নববি অপার বিস্ময় ও বিশ্বনবুওয়াতের মহাপ্রত্যয়; অন্যায়-অপরাধে জর্জরিত ক্ষমাহত মনক্ষুণ্ন মুসলিমদের জন্য রয়েছে অন্যায়-অপরাধের ঘোর কাটিয়ে নববি আদর্শে সত্য-সঠিক পথে ঘুরে দাঁড়ানোর হিতোপদেশ; জীবন নিয়ে হতাশ-নিরাশ ব্যক্তিদের জীবন গড়া ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মহৌষধ; জীবন-সাফল্যের চাবিকাঠি; সত্যপথ গ্রহণ ও সে পথে টিকে থাকতে বিনয়ের সুফল এবং দম্ভ-ধৃষ্টতার ভয়াবহতা ও কুফর-কুফল; আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল মানুষকে শিকড় থেকে স্বর্ণশিখরে স্থান দেয়– এর যথার্থতা ও উপদেশমূলক বাস্তব ঘটনা ও শিক্ষা; জীবনকে সুখকর করা ও জীবনে সুখ-শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পাওয়ার অনুপম নববি নীতি আদর্শ; সত্য গ্রহণ ও মিথ্যা

প্রত্যাখ্যানে সালাফদের নীতি-নৈতিকতা; এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব নির্মাণে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নতি-অগ্রগতি ও মহাসাফল্য অর্জনে বিভিন্ন মোটিভেসনাল-অনুপ্রেরণাদায়ক লেকচার।

আশা করি বইটি থেকে সত্যানুসন্ধানী এবং উভয় জগতের মহাসাফল্য ও প্রকৃত নববি সুখ-শান্তি সন্ধানী ও প্রত্যাশী পাঠকবৃন্দ সবিশেষ উপকৃত হবেন।

আল্লাহ তাআলা প্রকাশকসহ বই-সংশ্লিষ্ট সকলকে উভয় জগতে জাযায়ে খায়ের দান করুন; পরকালের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

আরিফ মাহমুদ

৪/৯/২০১৯ইং.

সূচিপত্র

Contents

নাস্তিকদের সাথে কথোপকথন

একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা উল্লেখ করার মাধ্যমে আমাদের আজকের আলোচনা শুরু করবো। ঘটনাটি খুবই বিস্ময়কর। সাথে সাথে এটা আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শক্ত দলিলও বটে। এর মাধ্যমে নাস্তিকদের সাথে আমাদের সালাফদের (পূর্বসূরিদের) আচরণের একটা ধারণা পাওয়া যাবে যে, নাস্তিকদের সাথে আমাদের সালাফদেরব্যবহার কীধরনের ছিলো? নাস্তিকদের অস্তিত্ব কি পূর্বেও ছিল? সালাফগণ কীভাবে তাদের মুকাবেলা করতেন? বর্তমানেও কি নাস্তিকদের অস্তিত্ব আছে? তাহলে আমরা কীভাবে তাদের মুকাবেলা করবো?

বর্তমান সময়ে নাস্তিকদের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। সেই সাথে বাড়ছে তাদের প্রচারণা-প্রতারণাআর মানুষের মধ্যে সংশয়-বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রবণতা। বিভিন্ন সেমিনারে, টেলিভিসনের বিভিন্ন চ্যানেলে এবং ইন্টারনেটে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা মানুষের মধ্যে সংশয় ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

সুতরাং তাদের সাথে আমাদের আচরণ কেমন হবে? তাদের সাথে আচরণ-উচ্চারণের ক্ষেত্রে কীভাবে আমরা সালাফদের বর্ণিত ঘটনাগুলো শিক্ষা গ্রহণ করবো?

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ 'সুমানিয়া' সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোকের সাথে মুনাযারা করলেন। ('সুমানিয়া' হলএক নাস্তিক-জনগোষ্ঠী, যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না; তারা মনে করে গ্রহ-নক্ষত্রেভরা এই বিশাল আকাশ এবং নদী-নালা, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত ও পশুপাখি সমেত এই বিস্তৃত ভূপৃষ্ঠ এমনি এমনিই হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়ে গেছে; এগুলোর কোনো স্রষ্টা নেই, এগুলো সৃষ্টির পিছনে কোনো সৃষ্টিকর্তার হাত নেই।)

Contents

দ্বিপাক্ষিক দীর্ঘ বিতর্কের পরও যখন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেল না তখন উভয় পক্ষই এই সিদ্ধান্তে একমত যে, আগামীকাল সকলেই আমিরের দরবারে সমবেত হবে এবং সেখানে তাদের বিতর্কের ইতি টানবে। পরদিন সকালে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নাস্তিকরা আমিরের দরবারে এসে হাযির হল; কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ সময়মত উপস্থিত হন নি। তিনি ইচ্ছে করেই কিছু সময় দেরি করলেন। এদিকে নাস্তিকরা এসে যখন আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ কে পেলো না; তারা তার আসতে বিলম্ব হতে দেখে হৈচৈ শুরু করে দিল, এবং আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ-এর অনুসারীদের অবজ্ঞা করে বলতে লাগলো, কোথায় তোমাদের আলেম? কোথায় তোমাদের আবু হানিফা? সে দেরি করছে কেনো? সে তো ওয়াদা লঙ্ঘন করছে। তোমরা কি এমন লোকের অনুসরণ করো; এমন লোককে তোমাদের নেতা মনে করোযার ওয়াদাই ঠিক নেই; যে কথা দিয়ে কথা রাখে না, সময় মত আমাদের মজলিসে উপস্থিত হয় না, ইত্যাদি বিভিন্নভাবে তারা মুসলমানদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছিলো। এদিকে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ইচ্ছা করেই দেরি করছিলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ বিলম্বের পর মজলিসে এসে উপস্থিত হলেন। নাস্তিকরা যখন তাঁকে দেখল তখন সকলে একযোগে তাঁর দিকে প্রশ্নের বাণ ছুঁড়ে দিয়ে বলল– আপনি দেরি করলেন কেনো? আপনি দাবি করেন আল্লাহ আছেন, আর আপনি তাঁকে ভয়ও করেন, তিনি আপনার প্রতিটি বিষয়ের হিসেব নিবেন, আর তিনিই তো সকলকে ওয়াদা ঠিক রাখতে বলেছেন, তাহলে আপনার এই কথার বাস্তবতা কোথায়?

আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, হে লোক সকল! তোমরা প্রথমে আমার কথা শুনো তারপর আমার ব্যাপারে যে ফায়সালা করবে আমি তা মাথা পেতে মেন নিবো; কিন্তু আমার কথা শুনার পূর্বে আমার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। আমি সঠিক সময়েই উপস্থিত হতে চেয়েছিলাম; কিন্তু নদীর পারে এসে দেখি সেখানে কোনো নৌকা নেই। অনেক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন কোনো নৌকার দেখা পেলাম না; আমি তখন এখানে উপস্থিতির ব্যাপারে এক ধরনের সন্দেহেই পড়ে গেলাম। আর ঠিক তখনই চার দিক অন্ধকার করে প্রচণ্ড এক ঝড় শুরু হল এবং আমার পাশের বড় একটি গাছের উপর বিশাল এক বজ্র পড়ল আর সাথে সাথে

গাছটি দুই টুকরো হয়ে এমনি এমনি একটু করে মাটিতে আর একটু করে পানিতে পড়লো। আমি বলতে পারবো না, হঠাৎ কোত্থেকে একটা লোহার টুকরো এলো এবং গাছের একটি ডালের সাথে একা একাই লেগে একটি কুড়াল হয়ে গেল। অতঃপর কুড়ালটি একা একাই গাছের ডালপালাগুলো কাটতে লাগলো আর গাছটি এমনি এমনি ফেড়ে তক্তা হতে লাগলো। তারপর এমনি এমনি হাতুড়ি আর পেড়েক এসে পিটিয়ে পিটিয়ে একটা নৌকা তৈরি করে ফেললো। আমি অবাক বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখছিলাম, এরই মধ্যে নৌকাটি পনিতে পড়ে আমার সামনে আসলো আর আমি তাতে চড়ে বসলাম। অতঃপর নৌকাটা একা একাই দাঁড় টেনে টেনে আমাকে নদীর এপার পৌঁছে দিল। এবার এসো আমরা আল্লাহর আস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করি যে, এই বিশ্বজগৎ একা একাই সৃজিত হয়েছে, না-কি এর সৃষ্টির পিছনে রয়েছে কোনো এক মহান স্রষ্টার নিপুণহাতের ছোঁয়া।

এমন আশ্চর্য ঘটনা শুনে নাস্তিকরা বলল, থামেন! আগে বলেন, আপনি কি সুস্থ আছেন? আপনার মাথা কি ঠিক আছে, না আপনি পাগল হয়ে গেছেন? তিনি বললেন, আমি ঠিকই আছি, আমি অসুস্থ নই এবং আমার বিবেক-বুদ্ধিও নষ্ট হয় নি। তারা বললো, এটা কীভাবে সম্ভব? এটা কি কোনো বিশ্বাসযোগ্য কথা হতে পারে যে, এমনি এমনি একটা গাছ ফেড়ে তক্তা হয়ে নৌকা তৈরি হয়ে গেল, অতঃপর তা একা একাই মানুষ পারাপার করল?! ঠিক আছে আমরা ধরে নিলাম একটা বজ্র এসে একটা গাছের উপর পড়েছে, অতঃপর গাছটি দুই টুকরো হয়ে এক টুকরো পানিতে আরেক টুকরো মাটিতে পড়েছে; কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব যে, এমনি এমনি একটা নৌকা তৈরি হয়ে যাবে, অতঃপর তা কোনো মাঝি ছাড়া একাকী দাঁড় টেনে মানুষ পারাপার করবে, অথচ একটা নৌকা তৈরি করতে কত লোকের প্রয়োজন হয়! কেউ গাছ কাটবে, কেউ তক্তা বানাবে, কেউ পেরেক গেঁথে কাঠ লাগাবে, কেউ দাঁড় টানবে ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্যে বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজন; কিন্তু আপনি বলছেন, কোনো মানুষ ছাড়া একাকী একটা গাছ কেটে তক্তা হয়ে নৌকা তৈরি হয়ে গেছে, অতঃপর কোনো মাঝি ছাড়া একাকী তা মানুষ পারাপার করছে! অসম্ভব! এটা হতে পারে না; এটা কোনো বিশ্বাসযোগ্য কথা হতে পারে না?

Contents

ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনারাই বলছেন,এই বিশাল আসমান ও তারগ্রহ-নক্ষত্র এবং এই বিস্তৃত যমিন ও এর নদী-নালা, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত ও পশু-পাখি সবকিছু এমনি এমনি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়ে গেছে; এগুলো সৃষ্টির পিছনে কোনো সৃষ্টিকর্তার হাত নেই, অথচ সেই আপনারাই আবার বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, ছোট্ট একটা নৌকা হঠাৎ করে একাকী কোনো কারিগর ছাড়াই তৈরি হয়ে একাকী মানুষ পারাপার করছে? তখন অবিশ্বাসী নাস্তিকরা নিরুত্তর হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা যালেম সম্প্রদায়কে কখনো হেদায়েত দেন না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! নাস্তিকতার মহামারি ইউরোপে শুরু হয়ে এর ঢেউ আমাদের সমাজে, মুসলিম দেশেও এসে আছড়ে পড়ছে। ইউরোপে নাস্তিকতার সৃষ্টি ও প্রসারকে আশ্চর্যজনক কিছু মনে করি না; বরং সেখানে নাস্তিকতার সৃষ্টি ও বিস্তার উভয়টাই স্বাভাবিক বিষয়,কারণ সেখানে এমন মানুষের বসবাস, যারা সত্য ধর্মের আলো ও সঠিক দীন থেকে অনেক দূরে, যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। তারা বলে আল্লাহ তাআলার সন্তান রয়েছে; ইসা আ. হলেন আল্লাহর সন্তান। দেখুন,কত উদ্ভট-অদ্ভুত এদের দাবি যে, আল্লাহর সন্তান হল একটি, আর আল্লাহর সন্তান (তাদের ধারণানুযায়ী) ইসা আ.-এর কোনো সন্তান নেই!! এটা হলসম্পূর্ণ বাস্তব বহির্ভূত এক দাবি; গণ্ডমূর্খ ছাড়া কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি তা মেনে নিতে পারে না। সাথে সাথে সেখানকার মানুষ বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তিপূজায় ডুবে থাকে; বিশেষ করে যুবক-যুবতী সম্প্রদায়। তারা বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতায় লিপ্ত, তারা কোনো ধরনের ধর্মীয় বিধিনিষেধের প্রতি সামন্যও ভ্রূক্ষেপ করে না– এরপর চলে আসে সোজা নাস্তিকতার দিকে, কেনোই-বা আসবে না? বরং এটাই হওয়ার কথা, কারণ তারা যাচ্ছেতাই করতে চায়। যখন খুশি যেভাবে খুশি মদ পান করতে চায়। যেখানে খুশি যার সাথে খুশি যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হতে চায়। তারা যা ইচ্ছে তাই খেতে চায়; যখন-তখন যেখানে ইচ্ছে ঘুমাতে চায়; যখন ইচ্ছে ঘুম থেকে উঠতে চায়। এখন তারা যদি দীন মান্য করে, তাহলে তাদেরকে বলা হবে– এটা তো হারাম, এটা করা যবে না, এটা করলে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিবেন, তোমার

Contents

পক্ষেএকাজের অনুমতি নেই, এর জন্যে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। যখন এ- ধরনের আহ্বান তার মন থেকে একের পর এক বেরুতে থাকে, তখন মনচাহি জিন্দিগি কাটাতে হলে তাকে খোদ দীন থেকেই বেরুতে হবে, আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হয়ে তাকে নাস্তিক্যবাদই গ্রহণ করতে হবে; তাহলেই সে সবকিছুই যেভাবে যখন খুশি করতে পারবে।

বর্তমানে ইউরোপে নাস্তিকতারব্যাপক ছড়াছড়ি। আমি নিজ বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করছি। আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে আমি ইউরোপের এক খৃস্টান ভূমিতে ছিলাম; সেখানের বেশিরভাগ মানুষই খৃস্টান, দেশের এখানে-সেখানে সর্বত্র গির্জা বিদ্যমান, সব জায়গা থেকে গির্জার ঘণ্টার আওয়ায আসতে থাকে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি বা তার ছাবি টানানো থাকে (যদিও এটা সম্পূর্ণ মনগড়া-মিথ্যা ছবি)। আমি তাদের একটা পরিসংখ্যানের রিপোর্ট দেখেছি। পরিসংখ্যানটি করা হয় কয়েকটি প্রশ্নের উপর; তার একটি প্রশ্ন হল, তোমার ধর্ম কী? এই প্রশ্নের উত্তরে সেখানের ১৩% লোক লিখেছে, আমার ধর্ম হল 'খৃস্টধর্ম'। এরপর প্রশ্ন করা হয়েছে, তুমি কি কোনো কারণে জীবনে একবার হলেও গির্জায় প্রবেশ করেছো? হোক তা যে কোনো কারণে, যেমন পড়ালেখা, বিবাহ বা অন্য কোনো উপলক্ষে? এই প্রশ্নের উত্তরে মাত্র ৭% লোক হ্যাঁ বলেছে। অর্থাৎ তারা জীবনে একবার হলেও গির্জায় প্রবেশ করেছে। এরপর প্রশ্ন করা হয়েছে তুমি কি প্রতি সপ্তাহে গির্জায় প্রবেশ করো? মাত্র ১% লোক বলেছে, তারা সপ্তাহে একদিন গির্জায় প্রবেশ করে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যেমন বৃটেন, জর্মান, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশ থেকে যেসকল লোক আমাদের কাছে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, জুমার পর নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে, আমি তাঁদের অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি যে, আপনি জীবনে কতবার গির্জায় প্রবেশ করেছেন? তাঁদের অনেকেই এই উত্তর দেয় যে, সে জীবনে এতবারের জন্যেও গির্জায় প্রবেশ করেনি, অথচ তাদের কারো বয়স ত্রিশ, কারো চল্লিশ বা তার চেয়ে কম-বেশি। সুতরাং তাদের সমাজে নাস্তিকতা ছড়ানো আশ্চর্যের কিছু না; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল আমাদের

দেশে, মুসলিম সমাজে নাস্তিকতার প্রচার-প্রসার। এমন সমাজে নাস্তিক্যবাদ বিস্তার করা–যেখানে জনগণের ধর্ম ইসলাম, যাঁরা পরকালে বিশ্বাসী, যাঁরা জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি ইমান রাখে, যাদের কাছেরয়েছে অবিকৃত মহান আল-কুরআন। যখন তাদের মধ্যে নাস্তিকতা ছড়ায় তখন বুঝতে হবে যে, কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে, কোথাও কোনো ঝামেলা হচ্ছে, যার প্রতিকার ও প্রতিশেধক প্রয়োজন; যার সংশোধন অত্যাবশ্যক।

পূর্বে এমন কিছু গর্দভ লোক ছিলো, যারা নিজেরাই সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করতো। একবার এদেরই একজন এক আলেমের নিকট গিয়ে বললো, আমি সৃষ্টি করতে পারি– আপনি কি এটি বিশ্বাস করেন? তখন আলেম বললেন, আচ্ছা আপনি সৃষ্টি করতে পারেন!!? সে বললো, হাঁ আমি সৃষ্টি করতে পারি। আলেম বললেন, ঠিক আছে আমাকে কিছু একটা সৃষ্টি করে দেখান, তখন লোকটি উক্ত আলেমকে একটি কর্তিত গাছের নিকট নিয়ে গেল। অতঃপর লোকটি গাছের মধ্যে খোদাই করে একটি গর্ত তৈরি করে ভিতরে কিছু গোশতের টুকরো রেখে তার মুখ বন্ধ করে দিল, এবং সেই আলেমকে বললো, একমাস পর এখানে আবার আসতে হবে। অতঃপর একমাস পার হওয়ার পর লোকটি উক্ত আলেমকে নিয়ে আবারও সেই গাছের নিকট আসল। তখন কী হল?

একমাস পর যখন আলেম সেই 'সৃষ্টিকর্তা' (!) লোকটির সাথে উক্ত গাছের নিকট আসল, তখন লোকটি অগ্রসর হয়ে গাছের মধ্যে সৃষ্ট সেই গর্তের মুখ থেকে আবরণটি সরিয়ে দিলো, আর তখন দেখা গেল সেখানে কিছু পোকামাকড় হাঁটাহাঁটি করছে। তখন লোকটি আলেমকে বললো, এই দেখুন আমি এই পোকাগুলো সৃষ্টি করেছি। তখন আলেম তাকে বললেন, আপনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন? সে বললো, হ্যাঁ আমিই এগুলো সৃষ্টি করেছি। আলেম বললেন, তোমার সৃষ্টির সংখ্যা কত? সে বললো, আমি জানি না। আলেম বললেন, তুমি সৃষ্টি করেছো অথচ তুমিই তোমার সৃষ্টির পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞাত!! আচ্ছা বল দেখি, তোমার সৃষ্টির মধ্যে কতটি পুরুষ আর কতটিমহিলা? সে বললো, আমি জানি না। অতঃপর তিনি বললেন, আচ্ছা বল দেখি, এই পোকাগুলো যে হাঁটছে, এগুলো

এখন কোথায় যাবে, কী খাবে,কতদিন বাঁচবে? সে বললো, আমি জানি না। তখন আলেম বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি সৃষ্টি করলে অথচ তুমি এগুলো সম্পর্কে কিছুই বলতে পারো না যে– তাদের সংখ্যা কত, পুরুষ ক'টি, মহিলা ক'টি, তারা কী খাবে, কোথায় যাবে, কতদিন বাঁচবে? তখন নাস্তিক লোকটি হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

এই নির্বোধের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আসলে যারা আল্লাহর প্রভূত্বের ক্ষেত্রে অংশীদারত্ব দাবি করে তারা নির্বোধ; তাদের কথার কোনো ভিত্তিই নেই। কোনো বুদ্ধিমান লোক তাদের কথা বিশ্বাস করতে পারে না; এমনকি সমাজেও তাদের কথার কোনো ধর্তব্য নেই।

যুবাইর ইবনু মুতইম রা. তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনি একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে মদিনায় এসে মসজিদের নিকটে চলে এলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে নববিতে সাহাবায়ে কেরাম রা.কে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করছিলেন এবং সুরা তুর তেলাওয়াত করছিলেন। মসজিদের বাহির থেকে যুবাইর রা. তেলাওয়াত শুনছিলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন–

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ؕ

'তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?'[১]

যুবাইর ইবনে মুতইম রা. বলেন, যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করা হল, তখন আমার মনে হচ্ছিল, আমার অন্তর খুশিতে উড়তে শুরু করছে। আমি মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, বাস্তবেই কি অনস্তিত্ব থেকে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, না-কি আমাদেরকে আমাদের থেকেই সৃজন করা হয়েছে?

---

১. সুরা তুর, আয়াত : ৩৫

Contents

একবার এক বেদুইনকে প্রশ্ন করা হল, তুমি কীভাবে তোমার প্রতিপালককে চিনতে পেরেছো? বেদুইন লোকটি বলল, এই-যে বিশাল আকাশ ও এর কক্ষপথ; এই বিস্তৃত ভূমি ও এর উপত্যকা-গিরিপথ এবং এই মহাসমুদ্র ও এর ঢেউ-তরঙ্গমালা– এর সবকিছুই কি মহাজ্ঞানী একজন স্রষ্টার প্রমাণ বহন করে না?

পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই মহান স্রষ্টা এক আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে, আর একারণেই আমাদের সালাফগণ পৃথিবীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৃষ্টির মাধ্যমেও আল্লাহর আস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করতেন। যেমনিভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেনঃ

وَ هُوَ الَّذِیۡ یُرۡسِلُ الرِّیٰحَ بُشۡرًۢا بَیۡنَ یَدَیۡ رَحۡمَتِہٖ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَقَلَّتۡ سَحَابًا ثِقَالًا سُقۡنٰہُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنۡزَلۡنَا بِہِ الۡمَآءَ فَاَخۡرَجۡنَا بِہٖ مِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ کَذٰلِکَ نُخۡرِجُ الۡمَوۡتٰی لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُوۡنَ

'তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি ভারী মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই; অতঃপর এ-মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি; অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনিভাবে আমি মৃতদেরকে পুনরুত্থিত করবো, যাতে তোমরা চিন্তা করকে পারো।'[১]

একবার এক মুলহিদ তথা নাস্তিক এক বালককে প্রশ্ন করলো, তুমিকি মুসলিম?

বালক ছেলেটি ছিলো বুদ্ধিমান সে বলল, হাঁ আমি মুসলিম।

নাস্তিক : অর্থাৎ তুমি মুসলিম, তুমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করো?

বালক : হাঁ আমি মুসলিম, আমি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি।

নাস্তিক : তুমি কি তাঁকে কখনো দেখেছো?

বালক : না। আমি তাঁকে কখনো দেখে নি।

---

১. সুরা আরাফ, আয়াত : ৫৭

নাস্তিক : তুমি কি তাঁর কথা কখনো শুনেছো?

বালক : না আমি তাঁর কথা কখনো শুনি নি।

নাস্তিক : তুমি কি তাঁকে কখনো স্পর্শ করেছো?

বালক : না। আমি তাঁকে কখনো স্পর্শ করি নি।

নাস্তিক : তুমি কি কখনো তাঁর ঘ্রাণ শুঁকেছো?

বালক: না আমি কখনো তাঁর ঘ্রাণ শুঁকি নি।

নাস্তিক : তুমি কি কখনো তাঁর স্বাদ গ্রহণ করেছো?

বালক: না আমি কখনো তাঁর স্বাদ গ্রহণ করি নি।

নাস্তিক : তাহলে তোমার রব আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব নেই,কারণ তুমি যাকে কখনো দেখো নি, যার কথা কখনো শুনো নি, যাকে কখনো স্পর্শ করোনি, যার স্বাদ গ্রহণ করোনি, যার ঘ্রাণ শুঁকো নি তার কোনো অস্তিত্বই নেই। অর্থাৎ যাকে পঞ্চন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

বাচ্চাটি ছিলো বুদ্ধিমান, সে তাকে উল্টো প্রশ্ন করে বললো, আপনার কি আকল তথা বিবেক-বুদ্ধি আছে?

নাস্তিক : হাঁ আছে।

বালক : আপনি কি আপনার বিবেক কখনো দেখেছেন?

নাস্তিক : না, আমি তা কখনো দেখি নি।

বালক: আপনি কি এর কোনো কথা কখনো শুনেছেন?

নাস্তিক : না আমি এর কোনো কথা কখনো শুনি নি।

বালক : আপনি কি একে কখনো স্পর্শ করেছেন?

নাস্তিক : না, আমি একে কখনো স্পর্শ করি নি।

বালক: আপনি কি কখনো এর ঘ্রাণ শুঁকেছেন?

নাস্তিক : না আমি কখনো এর ঘ্রাণ শুঁকি নি।

বালক : আপনি কি কখনো এর স্বাদ গ্রহণ করেছেন?

নাস্তিক : না আমি কখনো এর স্বাদ গ্রহণ করি নি।

Contents

বাচ্চাটি তখন তাকে বললো, তাহলে তো আপনি পাগল; আপনার কোনো বিবেক নেই। নাস্তিক লোকটি বলল, না আমি পাগল নই, অবশ্যই আমার বুঝশক্তি আছে।

বালক ছেলেটি বললো, আপনি কীভাবে জানলেন যে, আপনার বুঝশক্তি আছে?

নাস্তিক : আমি এর প্রভাব টের পাই। অর্থাৎ এর বিভিন্ন নিদর্শন থেকে আমি আমার আকলের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি; তাহলে কীভাবে বলবো যে, আমার কোনো বিবেক নেই; আমি পাগল?

নিদর্শন দেখেই তো বিষয় সম্পর্কে জানা যাবে; যেমন পূর্ণ বয়স্ক এক লোক রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে হাঁটছে, বাচ্চাদের সাথে খেলছে, অথবা রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করছে না; এই লোককে দেখে মানুষ বলবে, লোকটি পাগল, তার বিবেক নেই। তারা কীভাবে তাকে চিনতে পারলো? তারা কি তার মাথার খুলি ভেঙ্গে মগজ খুলে দেখেছে? না, তারা তা দেখেনি; তবুও তারা তাকে চিনতে পেরেছে। তার কার্যাবলীর নিদর্শন দেখে চিনতে পেরেছে যে, তার কোনো বিবেক নেই; সে পাগল। অনুরূপভাবে সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকের বিভিন্ন নিদর্শন দেখে জানা যাবে যে, তার জ্ঞান আছে। যখন দেখা যাবে, সে সবকিছু সঠিকভাবে সম্পাদন করছে, উল্টোপাল্টা কিছু করছে না, তখন মানুষ তাকে বলবে, সে জ্ঞানী, তার বিবেক-বুদ্ধি ঠিক আছে।

একটা প্রশ্ন : আমরা কীভাবে জানবো যে, আল্লাহর আস্তিত্ব আছে?

এর উত্তর হল, আমরা তাঁর নিদর্শন দেখে, তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি দেখে; আসমান, যমিন, পাহাড়-পর্বত দেখে এবং আমাদের নিকট যে অবিকৃত কুরআন আছে, এ-মুজেযা দেখে জানতে পারবো যে, আল্লাহ আছেন আর এসবকিছুই বলে দেয় যে, এক আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

আফসোস! বর্তমানে নাস্তিকদের সংখ্যা অনেক; যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তারা যখন ইসলামে প্রবেশ না করে এবং আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস না করে তখন তাদের উপর নেমে আসে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নানা দুশ্চিন্তা ও অশান্তি। আর এই অশান্তি-উদ্বেগ থেকে

বাঁচতে তারা বেছে নেয় আত্মহত্যার ভয়াবহ পথ অথবা জড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন নেশাজাত দ্রব্যে; যাতে তারা এই দুশ্চিন্তা ভুলে থাকতে পারে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে হেদায়েতের উপর রাখুন; এই দীনের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় ও বৃদ্ধি করে দিন; আমাদেরকে সত্যের উপর অটল-অবিচল রাখুন; আমরা যেখানেই থাকি আমাদেরকে পবিত্র-স্বর্গসুখীকরে রাখুন। আমিন।

গাইরুল্লাহর ইবাদত

ইসালাম-পূর্ব মানুষের চিন্তা-চেতনা ছিলো বিক্ষিপ্ত এবং তাদের আকিদা-বিশ্বাস ছিলো ছাড়ানো-ছিটানো। তারা বিভিন্ন মূর্তি-প্রতিমাপূজা করতো। এরপর ইসলাম এসে তাদের সকল বাতিল ও মিথ্যা চিন্তা-আকিদা মুছে দিল। তাদের অসাড় বিক্ষিপ্ত চিন্তা ও বিশ্বাস নিয়ে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি–

ইমরুল কায়েস, জাহেলি আরবের বিখ্যাত কবি। এক লোক এসে তাকে বলল, ইমরুল কায়েস! অমুক তোমার বাবাকে হত্যা করেছে। ইমরুল কায়েস বলল, সে কি আমার বাবাকে হত্যা করেছে? লোকটি বলল, হ্যাঁ সে তোমার বাবাকে হত্যা করেছে। ইমরুল কায়েস জানতো যে, সে এখন বেশ উত্তেজিত হবে এবং বাবা-হত্যার প্রতিশোধ নিতে ছুটে যাবে; তাই সে বললো, আজ মদ পান ও আমোদ-ফুর্তি করবো, আর আগামীকাল বিষয়টি ভেবে দেখবো; প্রতিশোধ নিবো এবং বাবার হত্যাকারীর সাথে বোঝাপড়া করবো। অর্থাৎ সে আজ মদ পান করবে আর আগামীকাল প্রতিশোধ নিবে। অতঃপর সে এটাই করলো।

এরপরআগামীকাল, সে পিতা-হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইলো; তাই সে ভাগ্য নির্ধারণের জন্যে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন কাগজে 'শাজটি কর' 'শাজটি করো না' এই দু'টি বাক্য লিখল এবংতা একটি পাত্রে করে মূর্তির সামনে রাখল, অতঃপর সেখান থেকে একটি কাগজ বের করলো। কাগজ খুলে দেখল তাতে লেখা 'শাজটি করো না', এরপর আরেকটা কাগজ নিলো এবং দেখল ততেও লেখা 'শাজটি করো না' এরপর আবারও আরেকটা

কাগজ খুললো; তাতেও দেখা গেল সে-একই লেখা 'শাজটি করো না'; তখন সে পাত্রটি মূর্তির মুখে ছুঁড়ে মারলো। সে ভেবেছিলো,গোপন-প্রকাশ্য সকল রহস্য মূর্তিটি জানে; তাই তারা মূর্তিকে সম্মান করতো; আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা না করে তার কাছে প্রার্থনা করতো। কখনো কখনো তার সামনে পশু বলি দিতো, বিভিন্ন রঙের বাতি জ্বালাতো, নাচ-গান করতো, তার চতুর্দিকে চক্কর দিতো, এমনকি তুমি ইসলাম-পূর্ব কাবার দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাবে, তার চতুর্পার্শ্বে মূর্তি স্থাপন করা, আর কাফেররা বিভিন্নভাবে তার ইবাদত করছে। তারা বিশ্বাস করতো, এই মূর্তিগুলো তাদের উপকার করতে পারে, তাদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের অসুস্থকে সুস্থ করতে পারে, অনুপস্থিতকে উপস্থিত করতে পারে এবং গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয় জানে। একটা তুচ্ছ পাথরের ব্যাপারেই তারা এতসব ধারণা পোষণ করতো। অতঃপর ইসলাম এসে এসবকিছু বাতিল করে দিয়েছে।

ইমরুল কায়েস মূর্তির সামনে পাত্র রেখে তার মাধ্যমে ভাগ্য যাচাই করতে চাচ্ছিল; কিন্তু তা থেকে বারবার বের হচ্ছিল, 'শাজটি করো না' 'শাজটি করো না' অর্থাৎ তোমার বাবার হত্যাকারীকে হত্যা করো না। প্রথমবার যখন 'শাজটি করো না' লেখা বের হল তখন সে ভাবল, হয়তো মূর্তিকে কিছু সম্পদ দিলে সে সঠিক পরামর্শ দিবে; তাই সে তার সামনে কিছু সম্পদ রাখলো এবং দ্বিতীয়বার ভাগ্য নির্ধারণ করলো, তখনো বের হল 'শাজটি করো না'। এরপর সে ভাবলো হয়তো তার সম্পদের পরিমাণ কম হয়েছে; তাই সে তার সামনে আরো সম্পদ রাখলো এবং ভাগ্য নির্ধারণের জন্যে কাগজ বের করলো; কিন্তু এবারও বেরুল 'শাজটি করো না' লেখা। সে যখন তিনবার দেখলো 'শাজটি করো না' 'শাজটি করো না' 'শাজটি করো না', তখন রাগান্বিত হয়ে পাত্রটি মূর্তির মুখে ছুঁড়ে মারলো এবং বললো, হে মূর্তি! যদি নিহত ব্যক্তি তোর বাবা হতো, তাহলে তুই বলতি 'শাজটি কর', একথা বলে সে পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করতে গেল।

আমার এই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হল একথা বুঝানো যে, জাহেলিয়াতে মানুষ মূর্তির ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের আকিদা পোষণ করতো। আবু রাজা আল-আতারিদি রা. বলেন, আমরা জাহেলি যুগে মূর্তি ও

পাথরের পূজা করতাম। তিনি বলেন, একবার আমরা সফরে বেরুলাম এবং আমরা যে মূর্তির পূজা করতাম তাকেও সফরে আমাদের সাথে নিয়ে নিলাম। সফরে আমাদের যখন রান্নার সময় হতো তখন আমরা তিনদিকে তিনটি পাথর রেখে তার উপর পাতিল রেখে নিচে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করতাম; কিন্তু আমরা যখন তৃতীয় পাথর খুঁজে না পেতাম তখন আমাদের সেই মূর্তিটিকে তৃতীয় পাথর হিসেবে ব্যবহার করতাম আর বলতাম, যখন আগুন এর নিকটবর্তী হবে তখন সে আগুনের তাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। তিনি বলেন, এরকম আমরা একদিন সফরে চলতে লাগলাম। (তুমি জাহিলিযুগে মানুষের নির্বুদ্ধিতার প্রতি একবার লক্ষ করে দেখো, মূর্তিপূজার ব্যাপারে তারা কতটা নির্বোধ ছিলো, এরপর দেখো ইসলাম এসে কীভাবে তা ঠিক করেছে) তিনি বলেন, আমরা একদিন চলতে লাগলাম, তখন আমাদের গোত্রের এক লোক চিৎকার করে বলতে লাগলো, তোমাদের ইলাহ তোমাদের প্রতিপালক হারিয়ে গেছে,তোমাদের ইলাহকে খুঁজে বের করো। আমরা তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে প্রতিটি জায়গায় তার খোঁজ করতে লাগলাম, এমন সময় এক লোক চিৎকার করে বললো, আমি তোমাদের ইলাহকে দেখেছি, তোমাদের ইলাহ কি এমন এমন নয়? তিনি বলেন, আমি তখন তার নিকট গেলাম এবং দেখলাম গোত্রের লোকেরা তার ইবাদত করছে, তার সামনে সিজদাবনত আবস্থায় রয়েছে। আমরা তখন তার সামনে একটি উট বলি দিলাম।

আমি জানি তোমরা আমার এই ঘটনা শুনে হাসবে, যেমন তোমরা হাসো ওমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর ঘটনা শুনে। ওমর রা. বলেন, আমার কোনো সম্পদ ছিলো না, যা দিয়ে আমি মূর্তি ক্রয় করবো। তাই আমি কিছু খেজুর জমাতাম এবং তা দিয়ে মূর্তি বানিয়ে তার উপসনা করতাম, তারপর আমার যখন খিদে লাগতো তখন আমি তা থেকে খেয়ে নিতাম।

জাহেলিয়াতে মানুষ এমন তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন বিষয়ের ইবাদত করতো যেগুলো না মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারে আর না কোনো উপকার করতে পারে। এই তুচ্ছ বিষয়গুলোর ইবাদত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ এখনও মানুষ এ- ধরনের মাটি ও পাথরের মূর্তির ইবাদত করে,

তাদের সামনে মাথানত করে সিজদা করে, তাদের সামনে খাবার রাখে ও পশু বলি দেয়। উদহরণস্বরূপ, তুমি শ্রীলঙ্কা বা জাপানের দিকে তাকাও, তারা জাগতিক দিক থেকে উন্নতি ও অগ্রগতির শীর্ষে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়নি, তারা শিরকমুক্তভাবে এক আল্লার ইবাদত করে না। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। বৌদ্ধ ধর্মও মূর্তিপূজার অন্তর্ভুক্ত। তুমি চিনে যাও, কোরিয়াতে যাও, সেখানেও একই চিত্র দেখতে পাবে। তারা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী, তারা মূর্তির ইবাদত করে এবং মূর্তির নৈকট্য অর্জনের জন্যে তাদের সামনে মাথানত করে। তাদের ইবাদতের নিদর্শন ও পদ্ধতিগুলো দেখলে তুমি আশ্চর্য হবে। কীভাবে তাদের আকল তাদেরকে এই অনুমতি দেয় যে, তারা নিজ হাতে স্বর্ণ, পাথর বা মাটি বা অন্য কোনো পদার্থের মাধ্যমে যে মূর্তি নির্মাণ করলো, আবার নিজেই সে মূর্তিকে রব হিসেবে ইবাদত করে! নিজ-হাতে নির্মিত মূর্তির সামনে গিয়ে বলে, হে প্রভূ আমাকে ক্ষমা করো!! আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করো, আমার অমুক প্রয়োজন পূর্ণ করে দাও!

আল্লাহ তাআলা এদের সম্পর্কে বলেন :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ

‘হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হল, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয় তাহলেতারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না; উপাসক ও উপাস্য উভয়েই দুর্বল।’[১]

---

১. সুরা হজ্জ, আয়াত : ৭৩

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۖ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

'তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কেয়ামতের দিন তারা তোমাদেরশিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করতে পারবে না।'[1]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে বর্ণনা করে বলেছেন যে, ঐসকল বৌদ্ধরা যেসকল মূর্তির পূজা করে এবং পূর্বে যাদের পূজা করাহতো তারা না কোনো ক্ষতি করতে পারে না কারো কোনো উপকার দান করতে পারে।

ঐসকল লোকদের অবস্থা সত্যিই আশ্চর্যজনক। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে চিনে বা জাপানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, হাসপাতালেনর ডাক্তার, বড় ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানী অর্থাৎ অনেক জ্ঞানী ও পণ্ডিত কিন্তু সে লাল কাপড় পরে মূর্তির সামনে এসে মাথানত করছে, তার পাশে তাওয়াফ করছে, তার কাছে মাগফিরাত, নাজাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করছে এবং তার চিন্তা-উদ্বেগ ও রোগ-শোক দূর করার জন্যে তার নিকট প্রার্থনা করতে চাচ্ছে।

সাথে সাথে ঐসকল লোকদের প্রতি লক্ষ করো, যারা বিভিন্ন কবরের নিকট যায় এবং আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে তার কাছে প্রার্থানা করে। কবরের উপর স্তম্ভ নির্মাণ করে, তার উপর গিলাফ বিছিয়ে রাখে, অতঃপর নিজ হাতে সেটাকে মুছে দেওয়াকে, তার উপর টাকা-পয়সা ছিটানোকে নিজের জন্যে কল্যাণকর ও সৌভাগ্য-সমৃদ্ধির কারণ মনে করে। তারা সেই কবরের নিকট বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কামনা করে। অথচ সেই কবরের অধিবাসী নিজেই নিজের কোনো উপকার করার ক্ষমতা রাখে না।

---

১. সুরা ফাতির, আয়াত : ১৪

Contents

হে ভাই! তুমি এসকল কবর নির্মাণের জন্যে টাকা খরচ করার পরিবর্তে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করো বা মানুষের চলাচলের জন্যে রাস্তা নির্মাণ করো; কিন্তু আফসোসের বিষয় হল মানুষ এসকল কবরের জন্যে মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা খরচ করছে, এরপর তারা সেই কবরের কাছে আসছে এবং আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে তার নিকট প্রার্থনা করছে, দয়া ভিক্ষা চাচ্ছে। মাজারের চৌকাঠে চুমু খাচ্ছে, মাথা ঠেকাচ্ছে এবং তাদের কল্যাণকর কাজগুলোকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করছে।

এসকল কবরের সাথে আর হিন্দুদের মূর্তির সাথে কি কোনো পার্থক্য আছে? মূর্তির কাছেও মানুষ যায়, তার সামনে মাথানত করে, তার কাছে প্রার্থনা করে, রহমত ভিক্ষা চায়। আর কবর বা মাজারের কাছেওমানুষ আসে, তার সামনে মাথানত করে, তার কাছে প্রার্থনা করে রহমত ভিক্ষা চায়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা পছন্দ করেন না।তিনি চান না যে, তাঁর সাথে অন্য কারো ইবাদত করা হোক। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۙ

‘এবং এই ওহিও করা হয়েছে যে, সমজিদসমূহ আল্লাহ আআলাকে স্মরণ করার জন্যে। অতএব, তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে ডেকো না।’১

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো জন্যে কোনোধরনের কোনো ইবাদত কখনই জায়েয নেই। যে তার নিজের উপর থেকে একটা মশা তাড়াতে পারে না সে তোমার উপর থেকে বিপদ-আপদ কীভাবে দূর করবে? এবং সে তোমার উপকার করবে কীভাবে?

একেবারে শুরুতে ইসলামে প্রবেশকারী সাহাবায়ে কেরাম রা.ও বিষয়টি বুঝতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব ইবনে উমায়ের রা.কে মদিনায় ইসলাম প্রচারের জন্যে প্রেরণ করলেন। তিনি মদিনায় গিয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, কুরআন শিখাতেন

---

১. সুরা জিন, আয়াত : ১৮

এবং তাদেরকে ইসলামের বিধিবিধান ও হুকুম-আহকাম শিক্ষা দিতেন ও মানুষকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করতে বলতেন। তার দাওয়াতে আমর ইবনে জামুহ রা.-এর চার সন্তান ইসলাম গ্রহণ করলেন। আমর ইবনে জামুহ রা. একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন, তার চার সন্তান তার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তারা চাচ্ছিল তাদের পিতাও ইসলাম গ্রহণ করুন। তাদের পর তাদের মাতাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা তাদের পিতাকে বলল, বাবা! এই শহরে একজন লোক এসেছেন, যিনি মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করছেন। তাহলে আপনি কেনো তার কাছে যাচ্ছেন না এবং তার কথা শুনছেন না? তিনি বললেন, আমি যাচ্ছি না কারণ আমার কাছে 'মানাফ' আছে, আমার কাছে মূর্তি আছে, আমার ইলাহ আছে। তারা বললো, সমস্যা কি? আপনি তার কাছে যাবেন এবং তার কথা শুনে চলে আসবেন, এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। ছেলেদের কথায় তিনি মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর নিকট গেলেন, তার কাছে বসলেন এবং তার কাছ থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনলেন। অতঃপর তার ও তার মূর্তির সাথে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে।

আমর ইবনে জামুহ রা. মদিনার রাস্তায় হেঁটেহেঁটে মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর নিকট গেলেন। তখনকার মদিনা বর্তমানের মদিনার মতো ছিলো না। তখন মদিনার ঘরগুলো ছিলো পুরনো, রাস্তাগুলো ছিলো মাটির এবং রাস্তার পাশে গাছপালা ছিল। তিনি মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর নিকট গিয়ে তার পাশে বসলেন এবং তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কিসের দিকে মানুষকে ডাকেন? মুসআব ইবনে উমায়ের রা. বললেন, আমি এক আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকি, যার কোনো শরিক নেই এবং আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মানুষকে ইমান আনতে আহ্বান করি। অতঃপর মুসআব ইবনে উমায়ের রা. তাকে কুরআন পড়ে শুনালেন। কুরআন শুনে তিনি খুবই প্রভাবিত হলেন; কিন্তু তিনি বললেন, এ বিষয়ে কওমের লোকদের সাথে আমার পরামর্শ করতে হবে। আমি আমার কওমের সরদার, আমি এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না। অতঃপর তিনি বাড়িতে ফিরে এসে মূর্তি মানাফের নিকট গেলেন এবং বললেন, হে মানাফ! লোকটি

তোমাকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়, তুমি তো তার আগমন সম্পর্কে জান। হে মানাফ! এ ব্যাপারে তুমি কি বলো? তুমি কথা বলছো না কেনো? তুমি মনে হয় গত রাতে আমার উপর রাগ করেছো। ঠিক আছে আজ যাচ্ছি, আগামীকাল তোমার কাছে আসাবো। অতঃপর যখন রাত হল তখন তার ছেলেরা মূর্তিটির নিকট আসলো এবং তা নিয়ে বাড়ির পেছনে ময়লা ফেলার স্থানে রেখে এলো।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মূর্তির ঘরে গিয়ে সেখানে মানাফকে পেল না। তখন সে বললো, মানাফ কোথায়? আমাদের রব কোথায়? ছেলেরা বললো, আমরা জানি না। সে তখন তাকে বাড়ির আশপাশে খুঁজতে লাগলো, অবশেষে বাড়ির পিছনে ময়লার স্থানে গিয়ে পেল। তখন সে বললো, মানুষ তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে, তুমি কি তাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলে না? অথচ আমি তোমার কাছে নিজের বিপদাপদ থেকে মুক্তি কামনা করি। এরপরও সে তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে ভালভাবে ধৌত করে সুগন্ধি মেখে ঘরে রাখলো। অতঃপর বললো, হে মানাফ! লোকেরা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করার কারণে, তোমাকে অপমান করার কারণে মনে হয় গত রাতে তুমি আমার উপর রাগ করেছো। এরপর রাতে তিনি একটি তরবারি এনে তার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন এবং বললেন হে মানাফ! একটা বকরিও তো তার পাছাকে হেফাযত করে। তাহলে তোমার কি হল? তুমি কেনো নিজেকে রক্ষা করতে পারো না? এই নাও তরবারি, এটা দিয়ে তুমি আত্মরক্ষা করবে। গভীর রাতে তার ছেলেরা এসে গলা থেকে তারবারিটা সরিয়ে তার সাথে একটা মৃত কুকুর বেঁধে একটি পরিত্যাক্ত কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসলো। পরদিন সকালে উঠে সে মানাফকে খুঁজতে লাগলো; কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিলো না। তখন সে বলল, কে আমাদের ইলাহের সাথে শত্রুতা করছে? ছেলেরা বললো, আমরা জানি না। অতঃপর সে খুঁজতে খুঁজতে সেই পরিত্যাক্ত কূপের কাছে গেল এবং তাতে তাকিয়ে দেখে তার ইলাহ যার ইবাদত সে করে তা একটি মৃত কুকুরের সাথে বাঁধা অবস্থায় সেখানে পড়ে আছে। তখন সে বললেন :

ورب يبول الثعلبان برأسهلقد خاب من بالت عليه الثعالب

Contents

'যার মাথার উপর শিয়াল পেশাব করে সে কি রব হতে পারে। যার উপর শিয়াল পেশাব করে সে তো ব্যর্থ।'

অথবা তিনি বলেন :

والله لو كنت الهالم تكنانت و كلب وسط بئرفي قرن

'আল্লাহর শপথ, তুমি যদি ইলাহ হতে তাহলে তুমি একটি মৃত কুকুরের সাথে পরিত্যাক্ত কূপে থাকতে না।'

এরপর তিনি মুসআবা ইবনে উমায়ের রা.-এর নিকট গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করে, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, রোগ মুক্তি চায়, আল্লাহ তাআলা তাদের বিষয়টা তার সাথেই সম্পৃক্ত করে দেন। সেটা কোনো কবর হোক, মূর্তি হোক বা গরু-ছাগল যাই হোক। মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তাদের ইবাদতের বস্তু দেখলে সত্যিই তুমি আশ্চর্য না হয়ে পারবে না।

সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ ইবাদত প্রবণ, সে কিছুর না কিছুর ইবাদত করবেই। তাই আল্লাহ তাআলা নবি-রাসুলদের মাধ্যমে মানুষের নিকট এই ওহি পাঠালেন যে, তারা যেনো এক আল্লাহর ইবাদত করে, তার সাথে কারো শরিক না করে; কিন্তু মানুষ সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের পূজা করে। তুমি যদি বর্তমানে মানুষের ইবাদতের প্রকার ও প্রকৃতি দেখো তাহলে অবাক হয়ে যাবে। উদহরণস্বরূপ, তুমি হিন্দুস্তানে গেলে দেখবে সেখানে মানুষ অতিতুচ্ছ জিনিসেরও পূজা করছে। তুমি সেখানে অনেক শিক্ষিত লোককে দেখবে সে গাভীর নৈকট্য অর্জন করার জন্যে, তার ইবাদত করার জেন্যে তার পিছনে ছুটছে। গাভী কখনো যদি রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে সেটাকে সরিয়ে দিতে তারা ভয় পায়। অথচ সেটা একটা গাভী! তুমি সেখানে এমন লোকও দেখতে পাবে, যে গাভীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে তার পিছনে অনেক সম্পদ ব্যয় করছে, অথচ এই পরিমাণ সম্পদ সে তার মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে ও পরিবার-পরিজনের জন্যেও ব্যয় করে না। একটা গাভী!! একটা প্রাণী!!!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খৃস্টানদের আলোচনায় বলেন:

إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা সবাই তোমাদের মতোই বান্দা। অতএব, তোমরা যাদেরকে ডাকো, তখন তাদের পক্ষেও তো সে ডাক কবুল করা উচিত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।'[১]

ইসা আ. আল্লাহর বান্দা, তাহলে কীভাবে তুমি তাঁর ইবাদত করো? অনুরূপভাবে গরু আল্লাহর সৃষ্টির একটা অংশ, সেও আল্লাহর ইবাদত করে, তাহলে তুমি কীভাবে তার পূজা করো? আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে বলেন ;

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ ۚ وَ إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۗ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্তকিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেইযা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল।'[২]

অনুরূপভাবে সে নিজেও তো কিয়ামতের দিন আল্লাহর নাজাত কামনা করবে, কারণ কিয়ামতের দিন প্রতিটি প্রাণীর বিচার করা হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'নিশ্চয় কিয়ামতের দিন শিংবিহীন ছাগলের জন্যে শিংবিশিষ্ট ছাগলকে তাড়িয়ে নিয়ে আসা হবে। অর্থাৎ শিংবিহীন ছাগলকে দুনিয়াতে যদি

---

১. সুরা আরাফ, আয়াত : ১৯৪

২. সুরা ইসরা, আয়াত : ৪৪

Contents

শিংওয়ালা ছাগল তার শিং দিয়ে গুতা দেয়, তাহলে শিংবিশিষ্ট ছাগল থেকে শিং নিয়ে শিংবিহীন ছাগলকে দেওয়া হবে, অতঃপর সে দুনিয়াতে যেভাবে তাকে গুতা দিয়েছিলো সেভাবে তাকে গুতা দিবে।'

সুতরাং এই গরুও কিয়ামতের দিন নিজের মুক্তি কামনা করবে। সে জানে যে, কিয়ামতের দিন তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে, কারণ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন এমন কাউকে শাস্তি দিবেন না যাকে তিনি দুনিয়াতে সে ব্যাপারে সতর্ক করেন নি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

'কোন রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।'[১]

এই বিষয়টা গরুও জানে যে, তাকেও কিয়ামতের দিন হিসেবের মুখোমুখি হতে হবে। তা সত্ত্বেও এই লোকগুলো তার সামনে আসে, তাকে পূজা করে। শিক্ষিত অনেক বড় বড় সার্টিফিকিটের অধিকারী লোকজন গরুর পিছন পিছনে দৌড়ায়– তার ইবাদত করার জন্যে, তার নৈকট্য অর্জন করার জন্যে।

মানুষ যদি আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দেয়, তার সাথে অন্য কিছুর শরিক করা শুরু করে (আল্লাহর কোনো শরিক নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়) তাহলেও আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না, কারণ এসবকিছু আল্লাহ তাআলার নিকট একটি মশার পাখার সমানও না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সারা দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহ তাআলার নিকট একটা মশার পাখার সমানও হত তাহলে তিনি একজন কাফেরকেও একফোঁটা পানিও পর্যন্ত পান কারাতেন না।

হে ভাই! সারা দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহ তাআলার কাছে একটি মশার পাখার সমানও না হয় তাহলে ঐ কাফেরের ব্যাপারে তোমার কী মতামত, যে আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্যকে শরিক করে?

---

১. সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ১৫

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

'কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দাউস গোত্রের নারী 'যুল খুয়াইস' নামক মূর্তির সামনে এসে তাদের পাছা নাড়াবে। (অর্থাৎ যুল খুয়াইস নামক মূর্তির পূজা করবে।)'

যুল খুয়াইস একটি মূর্তির নাম। জাহেলি যুগে দাউস গোত্রের লোকেরা যার ইবাদত করতো। আর দাউস হল আরবের দক্ষিণে অবস্থিত কয়েকটি গোত্রের নাম।

সুতরাং মানুষ আবারও মূর্তি পূজার দিকে ফিরে যাবে। আর একথাটাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন :

কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দাউস গোত্রের নারী যুল খুয়াইস নামক মূর্তির সামনে এসে তাদের পাছা নাড়াবে। অর্থাৎ মানুষ তাওহিদ থেকে দূরে সরে গিয়ে আবার মূর্তিপূজায় লিপ্ত হবে। তারা বিভিন্ন শিরকের মধ্যে পতিত হবে।

কার্যতই বর্তমানে তুমি অনেক মানুষকে দেখবে কবরকে সম্মান করছে, তার পাশে তাওয়াফ করছে, ঘুরছে, তার সামনে বসে মাথানত করছে, তার কাছে প্রার্থনা করছে; কিন্তু তুমি তাকে কখনো মসজিদে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে দেখবে না। এরপরও সে বলবে যে, আমি আল্লাহর ইবাদত করি। সত্য কথা হল, তুমি আল্লাহর ইবাদত করো না। তুমি যদি আল্লাহর ইবাদত করতে চাও তাহলে একনিষ্ঠ হয়ে শিরকমুক্তভাবে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো। তুমি ইবাদতের ক্ষেত্রে কখনো সীমালঙ্ঘন করো না। তোমার ইবাদত, তোমার দোয়া-মুনাজাত, কান্না-কাটি যেনো হয় একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যে। তা যেনো কোনো মূর্তি, কবর অথবা কোনো মানুষ বা ভূতের জন্যে না হয়।

হে আল্লাহ! আপনি আমদেরকে শিরকমুক্ত একত্ববাদী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

খৃস্টান বন্ধুদের সাথে কিছুক্ষণ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল নবি-রাসুলদের একই দীন ও একই আকিদা-বিশ্বাস দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

'আমি সকল রাসুলকেই তাঁদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে করে স্পষ্টভাবে তাদের নিকট বর্ণনা করতে পারে।'[১]

নবি-রাসুলগণ তাঁদের কওমের নিকট কী বর্ণনা করবে? অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিষয়টি উল্লেখ করে বলেছেন :

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো মাবুদ নেই।'[২]

সকল নবি-রাসুলই তাদের কওমের লোকদের নিকট এসে তাদের বলতেন, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো মাবুদ নেই; কিন্তু তাদের এই সতর্কবাণী সত্ত্বেওমানুষ শিরকে পতিত হয়। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করে। আল্লাহর জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করে। এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদের ইবাদত করে। যেমন ইহুদিরা করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেন;

---

১. সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪

২. সুরা মু'মিন, আয়াত : ৩২

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ

'ইহুদিরা বলে ওযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে ইসা-মাসিহ আল্লাহর পুত্র। এটা হচ্ছে তাদের মুখের কথা।'[১]

তারা কেনো ওযাইরকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে বলে যে, ওযাইর আল্লাহর পুত্র? কারণ ওযাইর একজন সত্য নবি ছিলেন, তিনি বসে বসে আল্লাহর ইবাদত করতেন আর আসমান থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্যে খাবার আসতো। এ-কারণে ইহুদিরা বলতো, তিনি আল্লাহর পুত্র না হলে আল্লাহ তাঁর জন্যে আসমান থেকে খাবার পাঠাতেন না। তাই তারা তার বংশ আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। অন্য দিকে নাসারারা বলে মাসিহ (হযরত ইসা আ.) আল্লাহর পুত্র....।

আমরা এখন খৃস্টান বন্ধুদের সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটাবো। আমার কিছু খৃস্টান বন্ধু আছে। যাদের কেউ আমার প্রতিবেশী, তাদের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক। তাদের সাথে আমার কথা হয়, গল্প হয়, হাসি-ঠাট্টা হয়। কেউ কেউ আমার সাথে লেখা-পড়া করেছে এবং তাদের কেউ কেউ এখনও আমাকে তাদের বন্ধু মনে করে। যদিও তারা মুসলিম নয় খৃস্টান, তবুও তাদের সাথে আমার চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও ইহুদি প্রতিবেশী ছিল, তিনি তাদের সাথে সর্বদা ভাল ব্যবহার করতেন। তিনি খৃস্টান মুকাওকিসের নিকট হাদিয়া প্রেরণ করেছেন এবং তার দেওয়া হাদিয়া গ্রহণও করেছেন। সুতরাং আমার আজকের আলোচনার বিষয় হল খৃস্টান বন্ধুদের সাথে কিছু আলোচনা এবং এক খৃস্টান গাড়ি চালকের সাথে আমার কথোপকথন।

আমি একবার মিসরে একটা বই মেলায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফেরার সময় বিমানবন্দরে আসার জন্যে আমি একটি ট্যাক্সি ভারা করতে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম এবং হাত দিয়ে একটি ট্যাক্সির দিকে ইশারা করতেই একটি ট্যাক্সি আমার সামনে এসে থামল। আমি চালকের সাথে

১. সুরা তাওবা, আয়াত : ৩০

ভারার বিষয়ে একমত হওয়ার পর গাড়িতে উঠলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর আমি চালককে জিজ্ঞেস করলাম। কেমন আছেন? আল্লাহর রহমতে মনে হচ্ছে ভালই আছেন। ট্যাক্সি চালাতে কি কষ্ট হয়? সে বললো, কষ্ট তো কিছুটা হয়ই, তবে ছেলে-মেয়েদের জন্যে তো এতটুকু কষ্ট করতেই হবে। আমি বললাম, সন্তানদের জন্যে কষ্ট করলে আল্লাহ তাআলা এর প্রতিদান দিবেন।

কিছুক্ষণ পর সামনে এক জায়গায় গাড়ি জ্যামে পড়লো, তখন আমি লক্ষ করলাম তার হতে একটি ক্রুশ ঝুলানো। তখন আমি তাকে বললাম এটা কী? সে বললো, এটা ক্রুশ। আমি বললাম এটা হাতে রেখেছো কেনো? সে বললো, আমি খৃস্টান। আমি বললাম তোমার নাম কী? সে বললো, অমুক। আমি এখন তার নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে আমার মনে হচ্ছে সে বলেছিলো তার নাম ইয়াসির। আমি বললাম ভাল। আচ্ছা ইয়াসির আমি তোমার সাথে ইসলাম ও খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি, তুমি কি এতে সম্মত আছো। সে বললো, ঠিক আছে।

আমি: ইয়াসির! তুমি তো মনে করো যে, ইসা আ. আল্লাহর পুত্র।ঠিক না?

ইয়াসির:হাঁ। ইসা আমাদের রবের পুত্র।

আমি: তাহলে বুঝা যায় আল্লাহ তাআলা সন্তান পছন্দ করেন এবং তিনি একাধিক সন্তান হবে এটাও পছন্দ করেন আর সেজন্যেই তার একটি সন্তান হয়েছে যার নাম ইসা। কথাটা কি সঠিক?

ইয়াসির:হাঁ।

আমি: আল্লাহ তাআলা চান যে, তাঁর অনেকগুলো সন্তান হোক আরএই চাওয়া পূরণের সক্ষমতাও তাঁর রয়েছে। তাহলে তাঁর একটিমাত্র সন্তান কেনো?

ইয়াসির: আল্লাহ আমাদের রব। আর তিনি এটা চেয়েছেন তাই এমনটি হয়েছে।

আমি: ইয়াসির! শুনো, আল্লাহ তাআলার কোনো সন্তান নেই। তোমরাই নিজেদের পক্ষ থেকে আল্লাহর ব্যাপারে এই অপবাদ দিয়েছো। এবার একটু ভিন্ন পয়েন্টে কথা বলি। আল্লাহ তাআলার তো সন্তান আছে যার নাম ইসা, তাহলে ইসার সন্তান নেই কেনো? আর আল্লাহর সন্তান আছে এবং তিনি একাধিক সন্তানও চান, তাহলে তার বাবা-মা নেই কেনো?

ইয়াসির: আল্লাহ আমাদেরকে এটাই জানিয়েছেন। তাই আমরা তাদের ইবাদত করি। আর এটা তাদেরও হক। এর বাইরে আমি কিছুই জানি না, কারণ তিনি আমার রব, তিনি আমার ইলাহ।

আমি: আর একটি বিষয়। তুমি তো মনে কর যে, ইসা আ. আল্লাহর সন্তান আর তিনি গুনাহের কাফফারার জন্যে শূলে বিদ্ধ হয়েছেন?

ইয়াসির: হাঁ।

আমি: কোন গুনাহ বা ভুলের কারণে তিনি শূলে বিদ্ধ হলেন?

ইয়াসির: আদমের ভুলের কারণে।

আমি: আদম আ.-এর ভুলটা কী?

ইয়াসির: আল্লাহ তাআলা আদমকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। তিনি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে ঐ ভুলের কারণে কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করলেন, যার কোনো কাফফারা হয় না এবং তারপর এই অপরাধের গুনাহ তার সন্তানদের উপর থেকে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানদেরকে এই অপরাধ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে নিজ সন্তানতে প্রেরণ করে শূলে চড়িয়েছেন, যাতে করে আদমের ভুলের কাফফারা হয়।

আমি: চমৎকার! ভুলটা মূলত কার? আদম আ.-এর না-কি ইসা আ.-এর?

ইয়াসির : আদম ভুল করেছে।

আমি: ভুল যদি আদম আ.-এর হয়ে থাকে তাহলে ইসা আ.কে কেনো শূলে চড়ানো হল? আদম আ.কেই শূলে চড়ানো হতো।

ইয়াসির: আমি জানি না এটা কেনো হল; কিন্তু বিষয়টি এমনই হয়েছে।

আমি: আদম আ. যে অপরাধটা করেছে তা যেনো কী?

ইয়াসির: একটি গাছের ফল খেয়েছে।

আমি: আদম আ. তো কোনো গাছ উপড়ে ফেলে নি?

ইয়াসির:না।

আমি: তিনি তো কোনো ফেরেস্তাকে হত্যা করেন নি?

ইয়াসির: না।

আমি: তিনি সামান্য একটা গাছের ফল খেয়েছেন, আর এটা তো ছোট্ট একটা অপরাধ। আমি বললাম, এই ছোট্ট একটা অপরাধের কাফফারার জন্যে আল্লাহ তাআলা নিজ সন্তানকে পাঠিয়ে শূলে চড়ালেন!! আল্লাহ তাআলার জন্যে তো এটা সম্ভাব ছিলো যে, তিনি এই ছোট্ট একটি অপরাধের কাফফারা নিজ সন্তানকে শূলে না চড়িয়ে অন্য কোনো ভাবে আদায় করবেন। যেমন তিনি আমাদের সকলকে ঠান্ডা পানি পান করতে নিষেধ করতেন। অথবা নির্দিষ্ট একটা দিনে তিনি আমাদেরকে রোদ্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। অথবা তিনি আমাদের জন্যে একশত রাকাত সালাত ফরয করতেন। অথবা তিনি আমাদের অর্ধেক সম্পদ যাকাত হিসেবে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন, অথবা অন্য কোনো শাস্তি যা অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, কারণ শাস্তি হয়ে থাকে সর্বদা অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ অপরাধ ছোট হলে শাস্তি হবে ছোট, অপরাধ বড় হলে শাস্তি হবে বড়। যেমন আমি ঘর থেকে বের হওয়ার পর আমার দশ বছরের ছোট ছেলে আমার ব্যক্তিগত কম্পিউটার নিয়ে খেলা করলো, অতঃপর আমি যখন বাড়িতে আসলাম তখন তাকে এই অপরাধের জন্যে ধমক দিয়ে বলবো, আর কখনো কম্পিউটারের সামনে আসবে না। এটা একটা শাস্তির প্রকার। আমি যদি অন্য কোনো শাস্তি দিতে চায় তা হলে তাকে বলবো, ছেলে! আমার কম্পিউটারে যে লেখাছিলো তা তুমি লিখে দাও; কিন্তু ছেলে যদি ইচ্ছা করে কম্পিউটারের সামনে এসে তার উপর চা ঢেলে দেয় তাহলে তার শাস্তি হবে ভিন্ন, কারণ এই অপরাধটা আগের তুলনায় বড় অপরাধ। তাই তার শাস্তিও

হবে বড়। আদম আ. যে অপরাধটা করেছে তা হল একটি গাছের ফল খেয়েছেন আর তার কাফফারাস্বরূপ আল্লাহ তাআলা নিজ সন্তানকে পাঠিয়ে শূলে চড়ালেন?! এখন আদম যদি দুইটি অপরাধ করতেন তাহলে এর জন্যে কাফফারা কী হতো? প্রথম ও ছোট অপরাধের কাফফারাই যদি হয়ে থাকে নিজ সন্তানকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা তাহলে দ্বিতীয় অপরাধের কাফফারা কী হতো?

আমি আবার তাকে বললাম, ইয়াসির! তুমি এখন বলবে ইসা ইবনে মারয়াম আ.কে কীভাবে শূলে চড়ানো হল? অথচ আমরা জানি তাঁকে শূলে চড়ানো হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে শূলে চড়ানোর আগেই আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

'অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না তাঁকে শূলে চড়িয়েছে বরং তারা এরূপ ধাঁধাঁয় পতিত হয়েছিলো। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনো খবর রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করে নি।'[১]

ইয়াসির: ইহুদিরা তাঁকে ধরে শূলের উপর রেখে তাঁকে বেঁধেছে. অতঃপর তাঁর হাতে পায়ে পেরেক মেরেছে, তারপর তাঁর উপর সিরকা ঢেলে দিয়েছে, তারপর তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে।

আমি: তোমার কি এই ঘটনা শুনে এই দৃশ্য কল্পনা করে একটুও কষ্টহয় না?

ইয়াসির: হাঁ, আমার অনেক কষ্ট হয়।

---

১. সুরা নিসা, আয়াত : ১৫৭

Contents

আমি: তোমাদের ধারণা মতে রাব্বুল আলামিন তো তাঁর পিতা, তিনি কি এই দৃশ্য দেখেছেন? এবং তিনি কি তাঁর চিৎকারের আওয়ায শুনেছেন?

ইয়াসির: হাঁ, তিনি দেখেছেন ও তাঁর চিৎকার শুনেছেন।
আমি: তিনি কি তাঁকে উদ্ধার করতে সক্ষম ছিলেন না?

ইয়াসির: হাঁ ছিলেন।

আমি: তাহলে তিনি তাঁকে কেনো উদ্ধার করলেন না?

ইয়াসির: আমাদের অপরাধের কাফফারার জন্যে।

আমি: কী জন্যে আল্লাহ তাআলা একজনের ভুলের কাফফারা অন্যজনের মাধ্যমে নিলেন? তিনি এর জন্যে অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করলেননা কেনো? কেনো তিনি আদমের ভুলের জন্যে তাঁর একমাত্র সন্তানকে শূলে চড়ালেন?

এরপর আমি তাকে আরেকটা প্রশ্ন করলাম, ইসা আ.কে কাদের গুনাহর কাফফারার জন্যে শূলিতে চড়ানো হয়েছে, তার পূর্ববর্তীদের জন্যে না-কি তার পরবর্তীদের জন্যে?

ইয়াসির: মাসিহ সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে তাদের জন্যে।

আমি: ঠিক আছে। তাহলে তার আগে যে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ এসেছে ও ইন্তেকাল করেছে তাদের অবস্থা কী হবে? আর ইসা আ. কে কেনো আর অনেক আগে পাঠানো হল না? যাতে তিনি তার পূর্বে যারা এসেছিলো তাদের সকলের অপরাধের কাফফারা করতে পারেন?

ইয়াসির : তিনি আমাদের প্রভু, তিনি এটা চেয়েছেন তাই এমনটা হয়েছে।

আমি: ইয়াসির শুনো! তুমি বলো যে, ইসা আ. আল্লাহর সন্তান,সুতরাং তিনিও ইলাহ। আর ইলাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।এখন কথা হল ইসা আ. একটা জিনিস একভাবে করতে চাচ্ছেন আর আল্লাহ বিষয়টি অন্য ভাবেকরতে চাচ্ছেন, এখন কার কথা কার্যকর হবে? ইসা আ.-এর কথা না-কি আল্লাহর কথা? যেমন মনে করো আল্লাহ চাচ্ছেন, এক লোক আজ মারা

যাবে আর ইসা আ. চাচ্ছেন, না সে আজ মরবে না বরং সে কাল মারা যাবে। তাহলে এখন কার কথা কার্যকর হবে? ইসা আ.-এর না আল্লাহর?

ইয়াসির: আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর কথা চলবে।

আমি: কোনপ্রতিপালক? তোমাদের কাছে তো রব তিনজন। আল্লাহ, তাঁর পুত্র এবং রুহুল কুদস বা পবিত্র আত্মা।

ইয়াসির: আমাদের রব, পিতার কথা চলবে।

আমি: তাহলে ইসা আ. কি রব নন? যতক্ষণ পর্যন্ত ইসার কথা কার্যকর না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসা আ. রব হতে পারবে না, কারণ এটা হতে পারে না যে, রবের কথা চলবে না, তাঁর কথা কার্যকর হবে না।

ইয়াসির : ইসার কথা কার্যকর হবে।

আমি: তাহলে পিতা ইলাহ নয়, কারণ ছেলের কথা কার্যকর হলে পিতার কথা কার্যকর হবে না। আর তখন পিতা ইলাহ হতে পারবে না, কারণ ইলাহ তো সে-ই যিনি যাচ্ছেতাই করতে পারেন।

ইয়াসির:আপনি কি জানেন? তাঁদের সকলের কথাই কার্যকর হবে।

আমি: দুই জনের কথা একই সাথে কোনো একটি বিষয়ের উপর কার্যকর হতে পারে না। অর্থাৎ এক লোক একই সময় মৃত ও জীবিত উভয়টা হতে পারে না।

ইয়াসির:আরে ভাই! এক জনের কথা বাস্তবায়ন হবে।

আমি: কীভাবে? অথচ তাঁদের সকলেই ইলাহ বা প্রতিপালক!!

আর এ-কারণেই বিষয়টি আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন তেমনই, আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّ مَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۙ

'আল্লাহর কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সাথে কোনো মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেতো এবং

একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেতো। তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।’[১]

এই আয়াতই প্রমাণ যে, আল্লাহ তাআলার কোনো সন্তান নেইএবং বিশ্বপরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি পবিত্র,সবকিছুর উর্ধ্বে।

একথা বলার পর আমি তাকে বললাম, ইয়াসির! আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমার কল্যাণকামী, আমি তোমাকে নসিহত করে বলছি, আল্লাহ তাআলা যদি সন্তান চাইতেন তাহলে তিনি তার সৃষ্টিরমধ্যেযাকে ইচ্ছা তাকেই সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতেন। অথচ আল্লাহ তাআলা সন্তান গ্রহণ থেকে অমুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলা কাউকে জন্ম দেন নি, তিনি কারো কাছ থেকে জন্ম গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।

হে ভাই! এই হল আল্লাহ ও ইসা আ. সম্পর্কে তাদের ধারণা। আমি অবশ্যই তাদের কল্যাণকামী, তাদেরকে ভালবাসি। আমি তো পূর্বেই বলেছি অনেক খৃস্টানের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে, যাদের সাথে আমার হাদিয়া দেওয়া নেওয়া হয়। আমি চাই না যে, একজন খৃস্টানও বেইমান হয়ে এই বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করুক যে, আল্লাহ! আপনি তিন জনের একজন, আপনি একক কোনো ইলাহ নন বরং আমি আপনার সাথে আরো দুইজনকে ইবাদত করি। আসলে এধরনের আকিদা-বিশ্বাস তো জায়েয নেই, এটা তো আল্লাহ তাআলার সাথে শিরিক করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ
تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ
يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَ
عَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا.

---

১. সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৯১

'তারা বলে: দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুদ কাণ্ড করেছো। হয় তো এর কারণেই নভোমণ্ডল ফেটে পরবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এ-কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্যে সন্তান আহ্বান করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্যে শোভনীয় নয়। নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদের গণনা করে রেখেছেন। কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।'[১]

কোনো মানুষের জন্যে এ ধারণা করাও বৈধ নয় যে, আল্লাহ তাআলার সন্তান রয়েছে।

আল্লাহ এক তার কোনো শরিক নেই। ইসা ইবনে মারয়াম আ. আল্লাহর একজন নবি। আমরা তাঁকে সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে বেশি ভালবাসি। আমরা যেমনিভাবে আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালবাসি, তেমনিভাবে ইসা আ.কেও আমরা ভালবাসি। আমরা সকল নবিকেই ভালবাসি, তাদের মুহাব্বত করি; বরং আমরা তাঁদের আমাদের নিজেদের চেয়েও বেশি ভালবাসি এবং ইসা আ.-এর উপর ইমান আনা আমাদের উপর ওয়াজিব, যেমনিভাবে সকল নবি আ.-এর উপর ইমান আনা আমাদের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন ;

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟

'রাসুল বিশ্বাস রাখেন সে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পলনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবাদির প্রতি এবং তাঁর নবি-রাসুলের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর নবি-রাসুলের মধ্যে কোনো তারতম্য করিনা।'[২]

---

১. সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৮৮-৯৫

২. সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৫

আমরা কোনো নবি-রাসুলের মধ্যে পার্থক্য করি না। ইসা আ. অথবা মুসা আ. অন্য যেকোনো নবিকে অস্বীকার করা কারো জন্যে বৈধ নয়। সুতরাং আমরা যেমনিভাবে তার উপর ইমান আনি, তেমনিভাবে সকল নবি-রাসুলের উপর ইমান আনি। আমি আমার সকল খৃস্টান জ্ঞানী বন্ধুদের আহ্বান করবো তারা যেনো ভালভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেন। তাহলে তারা দেখতে পাবে যে, এমন কোনো প্রমাণ নেইযার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইসা আ. আল্লাহর পুত্র। এমনকি ইঞ্জিলের কোথাও একথা নেই যে, ইসা আ. নিজে দাবি করেছেন যে, তিনি আল্লাহ পুত্র। বর্তমানে ইঞ্জিলের যে চারটি সংস্করণ রয়েছে তার কোথাও একথা নেই যে, ইসা আ. আল্লাহ তাআলার সন্তান। (যদিও একথা কেউ বলতে পারবে না যে, বর্তমানে যে ইঞ্জিল রয়েছে তা সত্য এবং একথাও কেউ বলতে পারে না যে, তার কোনটি আল্লাহর কথা আর কোনটি তাঁর কথা নয়, তার কোনোটি সত্য আর কোনোটি সত্য নয়।)

পূর্বে মানুষ ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের উপর থাকা সত্ত্বেও তারা এটা জানতো যে, ইসা আ. আল্লাহর প্রেরিত নবি। এবং তারা এটাও জানতো যে, ইসা আ. তাঁর অনুসারী খৃস্টানদেরকে এই সুসংবাদ দিয়ে গেছেন যে, তার পরে এক নবি আসবে যার নাম হবে 'আহমাদ'। তিনি তাদের বলেছেন 'অচিরেই আমার পরে একজন রাসুল আসবে যার নাম হবে আহমাদ'। এবং তিনি তাদেরকে তাঁর অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

'এবং আমি এমনএকজন রাসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম হবে আহমাদ।'[১]

আমাদের হাবিব আমাদের নবি আহমদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করেছেন। সুতরাং তাঁকে অনুসরণ করা এখন সকলের উপর ওয়াজিব। আর একারণেই আমর ইবনুল আস রা.

১. সুরা আস-সফ, আয়াত : ৬

যখন মিসরে আগমন করলেন, মুসলিমগণ মিসর জয় করলেন, তখন মিসরের বেশিরভাগ মানুষ ছিলো খৃস্টধর্মের অনুসারী। তারা যখন ইসলাম ধর্ম ও তার মহানুভবতা দেখলো এবং তারা এটা লক্ষ করল যে, ইসলাম ধর্ম ইসা আ.-এর ধর্মের পরবর্তী ধর্ম এবং ইসা আ.-এর ধর্ম ছিলো তাঁর যুগে, তাঁর জাতির লোকদের জন্যে। আর ইসা আ. নিজেই বলে গেছেন– তাঁর পরে আহমদ নামে একজন নবি আল্লাহর সত্য ধর্ম নিয়ে পৃথিবীতে আগমণ করবেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা সারা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে শেষ নবি হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। তখন তারা তাঁর অনুসরণ করলো এবং হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো।

আমি অনেক খৃস্টান ভাইদেরকে চিনি যারা অনেকে বড় বড় শিক্ষিত, তাদের কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার; কিন্তু তারা এখন ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তারা মুসলমান হয়েছেন। এমনকি অনেক পাদ্রিও রয়েছেন যারা ইসলামে প্রবেশ করেছেন, কারণ তারা বিষয়টি নিয়ে ভালভাবে গবেষণা করেছে, অতঃপর তাদের সামনে যখন সত্য প্রকাশিত হয়েছে তখন তারা সত্যের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

আমার জ্ঞানী খৃস্টান বন্ধুদের যদি জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা বলুন তো আপনারা কি কোনো খৃস্টান পাদ্রিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে দেখেছেন? অবশ্যই উত্তরে তারা বলবে, হ্যাঁ অনেক পাদ্রিই তো আছেন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যেমন আমেরিকার শায়খ ইউসুফ ইসতেস। তাঁর মতো অরো অনেকেই আছেন যারা এখন মুসলমান। তাঁদের লেখা অনেক বই আছে এবং ইন্টারনেটে তাঁদের বিভিন্ন লেকচার রয়েছে, অর্থাৎ তাঁরা সাধারণ কোনো মানুষ ছিলেন না বরং তারা ছিলেন ধর্মগুরু, গির্জার পাদ্রি-পুরোহিত, তা সত্ত্বেও তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আর তুমি কি কখনো শুনেছো যে, কোনো মুসলিম শায়খ, বড় কোনো আলেম ইসলাম ছেড়ে খৃস্টান ধর্মে প্রবেশ করেছেন? কেনো খৃস্টান ধর্মগুরো ও পাদ্রিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আর মুসলিম অলেমগণ ইসলাম ছেড়ে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে না?

আমি এখানে সাধারণ মানুষের কথা বলছি না। বরং আমি বলছি বড় বড় ব্যক্তিদের কথা যারা ধর্মের শায়খ। হাঁ তাঁদের ইসলামে প্রবেশের কারণ একটাই আর তা হল ইসা আ.-এর অসিয়ত অনুসরণ।

তুমি যদি ইসা ইবনে মারয়াম আ.কে প্রকৃতপক্ষেই ভালবেসে থাকো, তাহলে তাঁর অনুসরণ করো। ইসা ইবনে মারয়াম আ. একথা বলেননি যে, তোমরা আমার ইবাদত করো বরং তিনি বলেছেন তোমরা আমার অনুসরণ করো। যেমনিভবে আল্লাহ তাআলা বলেন ;

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ۝ يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّ مَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۝ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

'অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললো, হে মারয়াম! তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছো। হে হারুন-ভাগিণী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিলেন না ব্যভিচারিণী। অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন, তারা বললো, যে কোলোর শিশু তাঁর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলবো?'[১]

অনুরূপভাবে ইসা আ. একথাও বলেননি যে, আমি ইলাহ বা আমি আল্লাহর সন্তান বরং তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَ جَعَلَنِىْ نَبِيًّا ۙ وَّ جَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَ اَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۪

'সন্তান বললো, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং আমাকে নবি বানিয়েছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি

---

১. সুরা মারইয়াম, আয়াত : ২৭-২৯

আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন– যতদিন জীবিত থাকি ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে।'[১]

প্রিয় ভাই! সত্যি বলছি, আমি সকলের কল্যাণকামী। অনুররূপভাবে সকল মুসলমানই পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে কল্যাণকামী। আমরা যেমনিভাবে মুসলমানদের জন্যে কল্যাণ কামনা করি, অনুরূপভাবে ইহুদি-খৃস্টানদের জন্যেও কল্যাণ কামনা করি। প্রতিটি মানুষই নিজের কল্যাণ কামনা করে এবং তার ও তার রবের মাঝে আকিদা-বিশ্বাসকে স্বচ্ছ রাখতে চায় এবং আল্লাহর কাছে সর্বদা কল্যাণের প্রার্থনা করে।

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেনো আমাকে এবং তোমাদের সকলকেই হেদায়াত দান করেন এবং সর্বদা কল্যাণের সাথে রাখেন এবং আমাদের সকলকেই এক আল্লাহর ইবাদত করার তাওফিক দান করেন। আমিন।

ইসলাম কি শুধু তরবারির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে?

মানুষের মধ্যে সর্বদা একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খায় আর তা হল ইসলাম কি শুধুমাত্র তরবারির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে? মানুষ কি বাধ্য হয়ে দীনে ইসলামে প্রবেশ করেছে? না-কি তাঁরা এই দীনের ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে এই দীনকে ভালবেসে তা গ্রহণ করেছে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবিভিন্ন অঞ্চলে সাহাবায়ে কেরামের প্রেরণ করেছেন, তাঁরা সেখানে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তাদেরকে হত্যা করেছেন, অনেককে বন্দি করেছেন, সুতরাং ইসলাম কি এভাবেই শুধুমাত্র রক্তপাতের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে?

আমরা ইতিহাসের পাতায় পড়ি, মুসলমানগণ বিভিন্ন দুর্গে আক্রমণ করেছেন, তা অবরোধ করে রেখেছেন এক মাস, দুই মাস, তিনি মাস বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে। যেমন মুসলমান কর্তৃক বাইতুল মাকদিস

১. সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৩০-৩১

অবরোধ করে রাখা, এছাড়া স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক খায়বার অবরোধ করে রাখা। এ সকল অবরোধের সময় বিভিন্নভাবে অনেক মানুষ নিহত হয়েছে, যেমন কেউ দূর্গ থেকে পড়ে, কেউ আগুনে পুড়ে, কেউ নিক্ষিপ্ত তীরে আক্রান্ত হয়ে, এছাড়াও বিভিন্নভাবে অনেক মানুষ নিহত হয়েছে, অনেকে আহত হয়েছে, সুতরাং ইসলাম কি এভাবেই তরবারির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে?

আমরা সামনের আলোচনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার চেষ্টা করবো ইন-শা-আল্লাহ। আমি এখানে একটা তালিকা পেশ করবো যার মাধ্যমে প্রমাণ হবে যে, ইসলাম কি শুধুমাত্র তরবারির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে না-কি এখানে অন্য আরো কোনো পদ্ধতি রয়েছে যার সাহায্যেও ইসলাম প্রচারিত হয়েছে?

ইসলাম কি শুধুমাত্র তরবারির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে? না-কি অন্য কোনো পদ্ধতিও রয়েছে যার সাহায্যেও ইসলাম প্রচারিত হয়েছে? এটা অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। আমি জানি এটা মানুষের মধ্যে বারবার উচ্চারিত হওয়া একটি প্রশ্ন; কিন্তু কিছু প্রশ্ন এমন রয়েছে যা বারবারই করা হয়ে থাকে, সুতরাং আমাদেরও উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা এবং তা নিয়ে কথা বলা। অর্থাৎ কিছু বিষয় থাকে যতবারই তা উচ্চারিত হোক না কেনো প্রজন্ম তার উত্তরের মুখাপেক্ষী, সুতরাং তাদেরকে তা জানাতে হবে এবং সে সম্পর্কে তাদের সতর্ক করতে হবে। যেমন আমি প্রতি বছর বা দের/দুই বছরের মধ্যে একবার মাতা-পিতার সাথে সদাচার সম্পর্কে জুমআর দিন একটি খুৎবা দেই। মাঝে মাঝে কেউ কেউ আমার কাছে আসে, আমাকে বলে, শায়খ এ-বিষয়ে তো এক দেড় বছর পূর্বে খুৎবাহ দিয়েছেন! আমি তো তখনো আপনার পিছনে সালাত আদায় করেছি, তাহলে কেনো এ-সম্পর্কে আবারও খুৎবাহ দিলেন? আমি তখন তাকে বলি দুই কারণে একই বিষয়ে বারবার খুৎবা দেই। প্রথম কারণ: বিষয় বস্তু এক হলেও খুৎবার মধ্যে নতুনত্ব থাকে, অনেকটাই ভিন্নতা থাকে, যেমন ভিন্নভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করি, এ বিষয়ের অন্যান্য আরো হাদিস নিয়ে আসি যা পূর্বে বলা হয়নি। দ্বিতীয় কারণ : বিষয়টা এমন যা নিয়ে সমাজ ও জাতির মঝে বেশি বেশি আলোচনা

হওয়া উচিত। এছাড়াও এক দুই বছর পূর্বে যেনো ছেলেটির বয়স ছিলো ১৪ বছর এখন তার বয়স ১৫/১৬ বছর অর্থাৎ এরই মধ্যে তার জীবনে অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে, তার উপর একটি দায়িত্ব এসে গেছে। তাই তার জন্যে মাতা-পিতার সাথে সদাচারের আলোচনা করা প্রয়োজন।

এরকম আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা বারবার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, যেমন 'মন্দ লোকের সাহচর্য গ্রহণ', কারণ সমাজে মন্দ লোকদের সংখ্যা অনেক, তাদের সাহচর্যে অনেক ভাল মানুষ মন্দ স্বভাবের হয়ে যায়। এরকমই সকল মানুষ যদি মা-বাবার সাথে ভাল ব্যবহার করতো তাহলে এ বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন হতো না; কিন্তু পরিবার ও সমাজের চিত্র তো ভিন্ন। তাই এসকল বিষয় নিয়ে বারবার আলোচনার প্রয়োজন পড়ে।

এই দীর্ঘ ভূমিকার পর আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবি হিসেবে প্রেরিত হলেন, তিনি মানুষের মাঝে দীনে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন, মক্কার কুরাইশরা তাঁকে বাধা দিল, তাঁকে কষ্ট দিতে শুরু করলো এবং তাঁর মাঝে এবং দীন প্রচারের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালো, এমনকি মক্কায় তাঁর চলাচল ও বেঁচে থাকাটাই সংকীর্ণ হয়ে গেল। এভাবেই একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করলেন। তিনি মদিনায় গিয়ে কিছু কাল অবস্থান করার পরই সেটাকে একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুললেন। মদিনায় তখন মুসলমানগণ ব্যতীত অন্য আরো কিছু অধিবাসীরাও ছিল, তারা হল ইহুদি ও মুনাফিক সম্প্রদায়। সুতরাং মদিনা একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের আকার ধারণ করার পর তার নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল, তাই সাহাবায়ে কেরাম রা. মদিনার সীমান্তে পাহারা দেওয়া শুরু করলেন, যেনো বহিরাগত সন্দেহভাজন কেউ মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে। অথবা কোনো দিক থেকে যেনো হঠাৎ করে কেউ মদিনায় আক্রমণ করতে না পারে। সন্দেহভাজন কাউকে মদিনার আশপাশে দেখলে তাকে ধরে মদিনায় নিয়ে আসতে হবে, কারণ হতে পারে সে কোনো বাহিনীর অগ্রগামী দলের কেউ।

Contents

প্রহরী সীমান্তরক্ষীরা একদিন মদিনা-সীমান্ত দিয়ে ইহরাম পরিহিত এক লোককে পাড় হতে দেখল। তখন তারা লোকটির নিকটে গিয়ে পরিচয় জানতে চাইল ও এ দিক দিয়ে চলাচলের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলো; সে বললো, আমি ছুমামা ইবনে উসাল, বনি হানিফার সরদার (বনু হানিফা নাজদ–বর্তমানে রিয়াদ–বসবাসকারী একটি গোত্র) তখন সীমান্তরক্ষী সাহাবিরা তাকে বলল, এখান দিয়ে কোথায় যাচ্ছ? সে বললো, আমি মক্কায় যাবো। সাহাবায়ে কেরাম রা. জানতেন যে, মক্কা হল রিয়াদের পশ্চিমে অবস্থিত, সুতরাং কেউ রিয়াদ থেকে মক্কায় যেতে চাইলেমদিনার এই পাশ দিয়ে আসার কথা নয়। তাই তাঁরা মনে করলো যে, অবশ্যই লোকটা কোনো বাহিনীর অগ্রগামী দলের সদস্য হবে। অন্যথায় সে এখান দিয়ে হাঁটাহাটি করবে কেনো? তাই তাঁরা তাকে ধরে মদিনায় নিয়ে এলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাই তাঁরা তাকে মসজিদের পিলারের সাথে বেঁধে রাখলো।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এসে সালাত আদায় করার পর তাঁরা তাঁকে বলল, আমরা সীমান্ত থেকে এই লোকটাকে ধরে এনেছি, সে সীমান্তের আশপাশে হাঁটাহাঁটি করছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অত্যন্ত কোমলতা ও সহানুভূতির সাথে বললেন, কে তুমি? সে বললো, আমি ছুমামা ইবনে উসাল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বললেন তুমি কি নাজদের বনি হানিফের সরদার? সে বললো, হাঁ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে রেখে সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর নিকট গেলেন এবং তাঁদের বললেন তোমরা কি জানো তোমরা কাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছো? তাঁরা বললো, না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নাজদের বনি হানিফের সরদার ছুমামা ইবনে উসালকে গ্রেফতার করেছো। মক্কা যত গম ও যব আমদানি করে তা এই লোকটির নিকট থেকেই আসে। এমন একজন লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে, যে নাজদের বনি হানিফের সরদার এবং মক্কা যত গম ও যব আমদানি করে তা এই লোকটির নিকট থেকেই আসে!!

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আসলেন এবং তাকে বললেন, হে ছুমামা! ইসলাম গ্রহণ করো। সে বলল, না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ছুমামা তোমার সাথে কী আচরণ করা হবে বলে তুমি মনে করো? সে বলল, আপনি হত্যা করতে চাইলে একজন রক্ত-মাংসের মানুষকে হত্যা করুন (এটা একজন দৃঢ়চিত্তসম্পন্ন বাদশার মতোই কথা)। তিনি বললেন, আপনি হত্যা করতে চাইলে একজন রক্ত-মাংসের মানুষকে হত্যা করবেন, আর যদি অনুগ্রহ করতে চান তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করবেন। অর্থাৎ আপনি যদি আমার উপর দয়া করে আমাকে মুক্ত করে দেন তাহলে আপনি একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করলেন। আর যদি আপনি সম্পদ চান তাহলে আপনার যা ইচ্ছা তা চাইতে পারেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাকে তা দিয়ে দিবে। তারা আপনাকে মিলিয়ন দেরহাম দিতেও প্রস্তুত আছে; কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনোটাই চাচ্ছিলেন না। তিনি তাকে হত্যাও করতে চাচ্ছিলেন না, আবার তার কাছ থেকে ফিদয়া নিয়ে তাকে কাফের অবস্থায়ও ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন যে, সে ইসলামের প্রতি প্রভাবিত হয়ে এখান থেকে ফিরে যাক।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঐ অবস্থাতে রেখে আজকের মতো বিদায় নিলেন এবং সাহাবয়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেনো তার সাথে উত্তম ব্যবহার করে, ভাল ভাল খাবার পরিবেশন করে, এবং তার বাহনটিকে প্রতিদিন সকাল বিকেল তার সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়, কারণ মানুষ তার বাহনকে অনেক ভালবাসে। বর্তমানে যেমন অনেকের পছন্দের মডেলের গড়ি থাকে, কোথাও গেলে পছন্দের সেই গাড়ি নিয়ে যায়। কোনো কারণে গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার পরিবর্তে একই মডেলের আরেকটি গাড়ি কিনে নেয়; কিন্তু আগে মানুষের নিকট গাড়ি ছিলো না; তারা পশুর উপর আরোহণ করতো, তাই তাদের নিকট বাহনের কদর ছিলো অনেক বেশি, কারণ অনেক কষ্ট করে একটি পশুকে বহনের উপযুক্ত করে প্রশিক্ষিত করতে হত। আর একটি প্রশিক্ষিত পশু তার মালিকের মেজায ও অনুভূতি বুঝতো ও সে অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করতো। সুতরাং সেকালে মানুষের কাছে বহন-উপযোগী পশুর কদর ছিলো অনেক বেশি। বিশেষ করে দূরদূরান্তে সফর-উপযোগী প্রশিক্ষিত পশুর। আর একারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুমামা ইবনে উছালের সামনে দিয়ে সকাল বিকেল তার বাহনটি ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, যাতে সে আশ্বস্ত থাকতে পারে যে, তার বাহনটির কোনো ক্ষয়ক্ষতি করা হয়নি। বর্তমানে অসংখ্য উট রয়েছে যেগুলো ভ্রমনের উপযোগী নয়। সেগুলো খাওয়ার উপযুক্ত। তুমি সেগুলো জাবাই করে তার গোশত খেতে পারবে; কিন্তু সেগুলোতে আরোহণ করে কোথাও ভ্রমণ করতে পারবে না। এখন তো ভ্রমণের উপযোগী পশু খুবই কম বরং একশ'র মধ্যে একটি পাওয়াও কঠিন। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুমামা ইবনে উছালের সামনে দিয়ে সকাল-বিকেল তার বাহনটি ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, যাতে সে আশ্বস্ত থাকতে পারে যে, তার বাহনটির কোনো ক্ষতি করা হয়নি, তাকে হত্যা করা হয়নি বরং সেটা এখনও জীবিত রয়েছে এবং আগের মতই অক্ষত রয়েছে।

পর দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। ছুমামা ইবনে উসাল নামাযে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন তেলাওয়াত শুনলেন। এরপর সারা দিন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর আচরণ দেখলেন। অতঃপর দ্বিতীয় দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে বললেন, ছুমামা! তোমার সাথে কী আচরণ করা হবে বলে তুমি মনে করো? আমি গতকাল যা বলেছি তাই, আপনিহত্যা করতে চাইলে একজন রক্ত-মাংসের মানুষকে হত্যা করবেন,আর যদি অনুগ্রহ করতে চান তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরঅনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি সম্পদ চান তাহলে আপনার যা ইচ্ছা তা চাইতে পারেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাকে তা দিয়ে দিবে। তারা আপনাকে মিলিয়ন দেরহাম দিতেও প্রস্তুত আছে; কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তিনটি প্রস্তাবের কোনোটিই পছন্দ করলেন না। তিনি তো চান ছুমামা ইসলামের সুশীতল হাওয়ায় মোহিত হোক।

তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রইলেন এবং তার কাছ থেকে চলে গেলেন। আর ছুমামা সাহাবায়ে কেরামের সাথে

মসজিদে রয়ে গেল, তিনি সাহাবায়ে কেরামের আচার-আচরণ দেখছিলেন আর মুগ্ধ হচ্ছিলেন। তিনি দেখছিলেন সাহাবায়ে কেরামের কেউ সালাত আদায় করছেন, কেউ আল্লাহ তাআলার দরবারে কান্নাকাটি করছেন, কেউ কুরআন তেলাওয়াত করছেন। এই দৃশ্যগুলো তার মধ্যে ধীরেধীরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকলো। এর পরের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ছুমামা তোমার সিদ্ধান্ত কী? সে বললো, আমি আগে যা বলেছি তাই।

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কী করলেন? তিনি কি তার মাথার উপর তরবারি ধরে তাকে বললেন যে, ইসলাম গ্রহণ করো, না হলে হত্যা করবো!! না তিনি এটা করলেন না, কারণ জোর করে ভয় দেখিয়ে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করানো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۙ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

'দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত (সত্য-সঠিক পথ) ভ্রষ্টতা থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যে পথভ্রষ্ট তাগুতকে না মেনে আল্লাহতে বিশ্বাস করবে সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ়-মজবুত হাতল যা ভাঙ্গবার নয়। আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।'[১]

অন্য আয়াতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ

'অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুন এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।'[২]

---

১. সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬

২. সুরা কাহাফ, আয়াত : ২৯

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে কারো উপর চাপ সৃষ্টি করেন নি এবং ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কাউকে বাধ্যও করেননি। তিনি বলেন :

হে মানুষ! তোমরা 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহু' বলো, সফল হবে, নাজাত পাবে।

এমনকি তিনি মক্কার মানুষদেরও ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন নি, যারা তাকে নির্যাতন করে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন ছুমামা ইসলাম গ্রহণ করছে না এবং তার ইসলাম গ্রহণের কোনো সম্ভাবনাও নেই; সে ইসলাম গ্রহণের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কীধরনের আচরণ করলেন?

ছুমামা ইবনে উসাল ছিলেন সম্মানিত মানুষ। তাই তার সাথে তিনি সেই ব্যবহারই করলেন যা তার জন্যে উপযুক্ত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তৃতীয়বার তার কাছে আসলেন এবং তার সিদ্ধান্ত জানতে চাইলেন এবং সে আগের মতই তার উত্তর দিল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবায়ে কেরাম রা.কে বললেন, তোমরা ছুমামাকে ছেড়ে দাও। সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, আমরা তার কাছ থেকে কোনোধরনের মুক্তিপন আদায় না করেই তাকে ছেড়ে দিব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ তাকে ছেড়ে দাও।

অথচ ছুমামা ছিলো এমন এক কওমের সরদার যে কওমের কাছে রয়েছে প্রচুর সম্পদ, গম-যবের ভান্ডার। তা সত্ত্বেও তিনি বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। আর ছুমামা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের এই আচরণ ও কোমল ব্যবহার দেখে সেখান থেকে বের হলেন।

ছুমামা ইবনে উসাল মসজিদ থেকে বের হয়ে নিকটের একটি পানির স্থানে গেলেন এবং গোসল করে দ্বিতীয়বার ইহরাম পরিধান করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন :

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল। এরপর ছুমামা ইবনে উসাল রা. বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনার চেহারার চেয়ে ঘৃণিত চেহারা আমার কাছে আর একটাও ছিলো না। আর এখন আপনার চেহারা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় চেহারা। আল্লাহর শপথ আপনার শহরের চেয়ে ঘৃণিত শহর আমার কাছে আর একটাও ছিলো না, আর এখন আপনার শহরই আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় শহর। আপনার ধর্মের চেয়ে ঘৃণিত আর কোনো ধর্ম আমার কাছে ছিলো না. আর এখন আপনার ধর্মই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম। হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে কিছুর নির্দেশ দিন। আমি এখন মুহরিম (ইহরাম পরিহিত) অবস্থায় আছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি তোমার ওমরাহ পূর্ণ করো।

ছুমামা ইবনে উসালা রা. মক্কার দিকে যাত্রা করলেন, তিনি যখন মক্কায় গেলেন তখন তাঁর তালবিয়া পাল্টে গেল। তিনি–

لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك

এই তালবিয়ার পরিবর্তে বললেন :

لبيك لاشريك لكان الحمد و النعمة لك لاشريك لك

তখন কুরাইশরা তার নিকট জড়ো হয়ে তাঁকে বলল, নতুন তালবিয়া!! তিনি বললেন হাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল। তখন মক্কার লোকেরা তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং তাঁকে প্রহার করতে শুরু করলো, যাতে করে তারা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আবার অন্ধকারের দিকে নিয়ে যেতে পারে। হাঁ এটাই হচ্ছে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে পার্থক্য, ইসলাম কাউকে তরবারি উঁচিয়ে জোরপূর্বক ইসলামে প্রবেশের কথা বলে না বরং কাফেররাই মানুষকে ইসলাম থেকে বের করার জন্যে শক্তি ও তরবারি উভয়টাই ব্যবহার করে। আমরা দেখেছি এবং একথা আমরা কখনো ভুলতে পারবো যে, ক্রুসেডাররা

বাইতুল মাকদিস দখলের পর সেখানকার মুসলমানদের সাথে তারা কীধরনের আচরণ করেছিলো, তারা সেখানে নির্বিচারে নিরিহ মুসলমানদের হত্যা করেছে, এমনকি শিশুরাও পর্যন্ত তাদের হাত থেকে রেহায় পায়নি, মসলমানদের রক্তে তাদের ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে গিয়েছিলো। মুসলমানদের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন একটি ঘটনাও নেই। যাই হোক পূর্বের ঘটনায় ফিরে আসি, ছুমামা রা.কে প্রহার করতে দেখে আব্বাস রা. চিৎকার করে বললেন, হে লোকেরা! তোমরা কাকে মারছো? এ-তো বনি হানিফার সরদার! এ-তো ছুমামা ইবনে উসাল। আল্লাহর শপথ তোমরা যদি ছুমামাকে প্রহার করো তাহলে তোমাদের নিকট বনি হানিফা থেকে গমের একটি দানও আসবে না। তোমরা তো নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করতে চাচ্ছো। সে তো তোমাদের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করবে, তোমাদের নিকট খাদ্য রপ্তানি বন্ধ করে দিবে। আব্বাস রা.-এর কথা শুনে লোকেরা তাঁকে প্রহার করা বন্ধ করলো। ছুমামা রা.তখন বললেন, আল্লাহ শপথ! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম আমাকে অনুমতি না দিলে তোমাদের নিকট গমের একটি দানাও আসবে না।

অতঃপর কুরাইশরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন দূত পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, হে মুহাম্মদ! এই লোকটি আমাদের খাদ্যের উপর অবরোধ আরোপ করেছে। তখন রাসুলুল্লাহ তাঁকে কুরাইশদের নিকট খাদ্য রপ্তানি করতে বললেন।

হাঁ, এভাবেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। এভাবেই উত্তম আখলাকের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচার করেছেন। মানুষ তাঁর উত্তম চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে ইসলামগ্রহণ করেছেন। আর যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে ঐসকল অপশক্তিকেই রুখে দেওয়া হয়েছে যারা মানুষকে সত্য দীন ইসলাম গ্রহণ করাথেকে বাধা দিচ্ছিলো। যারা মানুষের মাঝে ও ইসলামের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন এখানে আমি আপনাদের সামনে একটি পরিসংখ্যান পেশ করছি যা আমি ড. রাগেব আস-সিরজানির একটি বইয়ে পড়েছি, তিনি তাতে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে এবং তাতে মুসলমানদের থেকে যত জন শহিদ হয়েছেন তার সংখ্যা এবং কাফেরদের থেকে যারা নিহত হয়েছে তার একটা তালিকা উল্লেখ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় সর্বমোট যুদ্ধ হয়েছে ৬৩ টি। এর মধ্যে গাযওয়া হচ্ছে ২৭টি। আর সারিয়্যা হচ্ছে ৩৮টি। আর সবগুলো যুদ্ধ মিলিয়ে মুসলমানদের থেকে সর্বমোট শহীদের সংখ্যা হল ২৬২ জন। আর কাফেরদের থেকে নিহতের সংখ্যা হল সর্বমোট ১০২২ জন। এবার তুমি যদি অনুসন্ধান করো দেখতে পাবে যে, যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুসলিম মুজাহিদদের মোট সৈন্যের মাত্র ১% যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। আর কাফেরদের থেকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মোট সৈন্যের মাত্র ১.৫% যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এর অর্থ কী? এর অর্থ কি এটা দাঁড়ায় না যে, ইসলাম ও মুসলমানরা কখনো করো রক্ত চায় না, অযথা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করতে চায় না।

এবার এসো কাফেরদের মাধ্যমে পরিচালিত একটি যুদ্ধের পরিসংখানের দিকে দৃষ্টি দেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মোট নিহতের সংখ্যা হল ৫৪.৮ মিলিয়ন। কি অবাক লাগছে? তুমি এর চেয়েও বেশি অবাক হবে যদি তুমি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের সংখ্যা দেখো। হাঁ সেটি অবাক হওয়ারই বিষয়, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মোট সৈন্যের সংখ্যা ১৫.৬ মিলিয়ন। অর্থাৎ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যদের চেয়ে নিহতের সংখ্যা প্রায় ৪ গুণ বেশি। সুতরাং বুঝায় যায় যে, নিহতের বেশিরভাগ মানুষই হল নিরপরাধ সাধারণ জনগণ। সৈন্যরা বিভিন্ন এলাকায় প্রবেশ করে নির্বিচারে সেখানকার সাধারণ মানুষদেরকে হত্যা করেছে। সেখানকার নারী, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ সকলকেই হত্যা করেছে। তারা বিভিন্ন জনবসতিতে প্রবেশ করে সেখানে নির্বিচারে গুলি করে, বোম্বিং করে, পারমাণবিক বোমা ফেলে মানুষ হত্যা করেছে। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের আমিরদের কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন, তারা যেনো কোনো আহতকে হত্যা না করে। কোনো নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি এমন সাধারণ মানুষদের হত্যা না করে। এমনকি তিনি গির্জার পাদ্রিদেরও হত্যা করতে

নিষেধ করেছেন। আর একারণেই আমরা দেখতে পাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ঘটে যাওয়া যুদ্ধে শহিদ ও নিহতের সংখ্যা মোট যোদ্ধার ১% বা ২% অথবা এর চেয়েও কম।

বদরের বন্দিদের একত্র করা হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। তিনি সাহাবাদের বলে দেন যে, তারা যেনো যুদ্ধবন্দিদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, তাদের সামনে ভাল খাবার পরিবেশন করে। মুসআব ইবনে উমায়ের রা. বলেন, আমার এক ভাই বন্দি ছিলো। আমরা ছিলাম পাহারাদারির দায়িত্বে। বন্দিদের জন্যে রুটি আর পানি দেওয়া হলে, আমরা তাদেরকে খেজুর আর পানি দিয়ে আমরা নিজেরা শুকনো রুটি খেয়েছি। এই আচরণ দেখে কাফের বন্দিরা পর্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলেছে, তোমরাও খেজুর নাও। তখন আমরা বলেছি, না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তোমাদের প্রতি সদাচারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

'তাঁরা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতিম-অনাথ ও বন্দিকে আহার্য দান করে।'[১]

ইসলাম যদি শুধু মাত্র তরবারির মাধ্যমেই বিজয় অর্জন করতো তাহলে যখন তাঁদের উপর থেকে তরবারি উঠে যেতো তখন তাঁরা আবার তাঁদের কুফরিতে ফিরে যেতো। বর্তমান রাশিয়াতে কি এটাই ঘটেনি? রাশিয়াতে ৭৩ বছর সমাজতন্ত্রের শাসন চলেছে। সমাজতন্ত্রিরা মানুষকে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক কমিউনিস্ট বানিয়েছে। এরপর যখনই সমাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়েছে তখন মানুষ আবার তাদের আগের ধর্মে ফিরে গেছে, খৃস্টানরা খৃস্টধর্মে ফিরে গেছে আর মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মে ফিরে এসেছে। সুতরাং কোমলাতা ছাড়া শুধু অস্ত্র তোমার কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না।

---

১. সুরা ইনসান, আয়াত : ৮

কিন্তু একবার ইসলাম গ্রহণের পর মানুষ আর তাঁদের আগের কুফরি ধর্মে ফিরে যায়নি। বরং ইসলাম তাঁদের অন্তরে চিরদিনের জন্যে গেঁথে গেছে, সকল ঝড়ঝাপটা ও বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তাঁরা ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছে। আর একারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ

'আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও সদুপদেশ শুনিয়ে এবং (যদি কখনো বিতর্কের প্রয়োজন পড়ে তাহলে) তাদের সাথে বিতর্ক করুন উৎকৃষ্ট পন্থায়।'[১]

ইন্দোনেশিয়া, যেখানে বর্তমান মুসলমানের সংখ্যা ২৩০ মিলিয়ন। সেখানে ইসলাম প্রচারের জন্যে কোনো তরবারি ব্যবহার হয়নি। মুসলিম ব্যবসায়ীরা সেখানে গিয়েছেন স্থানীয় লোকেরা মুসলমানদের ব্যবাহার দেখে মুসলমান হয়েছেন। ব্যবসায়ীরা প্রথমে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন, অতঃপর মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন তাঁরা এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় আরো একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন, এভাবে পূরো ইন্দোনেশিয়াতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। এবং বর্তমানেও যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন তাঁদের কেউ তরবারির মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধ্য করছে না। বরং তাঁরা ইসলামের মূল সৌন্দর্য দেখে স্বেচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করছেন। উদাহরণস্বরূপ জার্মানির কথাই বলা যাক, সেখানকার সরকার বলছে, জার্মানিতে দিন দিন ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জার্মান সরকার বলছে, বর্তমানে জার্মানে প্রতি দুই ঘণ্টায় একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। এই পরিসংখ্যানটা হল ২০০৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত। এরা কি তরবারির ভয়ে মুসলমান হয়েছেন? এ-তো তোমার সামনে জার্মান সরকারের হিসেব। আমার যেসকল বন্ধু জার্মানে থাকে, আমি তাদের বিষয়টি সম্পর্কে জেজ্ঞেস করেছি, তাদের বলেছি সত্যিই কি এই সংখ্যক মানুষ মুসলমান হচ্ছে? তখন তারা

১. সুরা নাহল, আয়াত : ১২৫

আমাকে বলেছে, না এটা সঠিক সংখ্যা নয়; বরং সঠিক সংখ্যাটা আরো বেশি। এটা সরকারি হিসেব, সরকার সঠিক সংখ্যাটা প্রকাশ করতে চাচ্ছে না।

ইসলাম নম্রতা ও কোমলতার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। একথা বলা ভুল যে, ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রসারিত হয়নি। আবার একথা বলাও ভুল যে, ইসলাম শুধু মাত্র তরাবারির মাধ্যমেই প্রসারিত হয়েছে। বরং ইসলাম এই দুইটার সমন্বয়ে প্রসারিত হয়েছে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মাধ্যমে জবরদখলকারীদের জুলুম নির্যাতন দূর হয়েছে এবং মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পেয়েছে, ফলে তাঁরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে। অনুরূপভাবে উত্তম কথা ও কোমল ব্যবহারের মাধ্যমেও ইসলাম প্রসারিত হয়েছে। (সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ইসলাম প্রসারিত হয়েছে তরবারি বিশিষ্ট আখলাকের মাধ্যমে)

মহান আল্লাহ তাআলা নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে পরিপূর্ণ কল্যাণ দান করুন। আমি এবং আপনারা যে যেখানেই থাকি, তিনি আমাদের কল্যাণ ও বরকতের সাথে রাখুন এবং আমাদের সকলকে তার আনুগত্যে লেগে রাখুন। আমিন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গিয়েছেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে মদিনাকে একটি ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে সফরে বের হতেন। এমনই এক জিহাদের সফরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে রাতে চলছিলেন। রাতটি ছিলো খুবই অন্ধকার। অন্ধকারের কারণে উটগুলো তাঁদের নিয়ে ঠিক মত চলতে পারছিলো না। আর সাহাবায়ে কেরাম রা.ও সামনে ঠিক মত

দেখতে পারছিলেন না, তাঁরা উটগুলোকে ধরে ধরে সামনে হাঁটাচ্ছিলেন। অন্যদিকে তাঁদের সকলের আরোহণের মত পর্যাপ্ত পরিমাণে বাহনও ছিলো না। তাঁদের কয়েক জনের জন্যে একটি করে বাহন ছিল। তাই তাঁরা পালাক্রমে একের পর একজন করে উটের পিঠে উঠে সফর করছিলেন। যেমন একজন এক ঘণ্টা, তারপর আরেক জন. তারপর আরেক জন এভাবে। দীর্ঘরাত পর্যন্ত চলতে চলতে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁদের সকলেই এই কামনা করছিলো যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাঁদের নিয়ে রাস্তার পাশে কোথাও যাত্রা বিরতি করতেন!! এদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে এই কষ্টের বিষয়টি লক্ষ করলেন, তখন তিনি তাঁদেরকে রাস্তার পাশে এক স্থানে যাত্রা বিরতি করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাঁরা সকলে এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলো। যেহেতু তাঁরা সকলেই ছিলো ক্লান্ত তাই সকলেরই ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজন ছিলো তীব্র; কিন্তু সকলে ঘুমিয়ে গেলে ফজরের জন্যে তাঁদের জাগাবে কে, এ নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিল। অর্থাৎ কে সজাগ থেকে তাঁদেরক ফজরের জন্যে জাগ্রত করবে?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, কে আছো যে না ঘুমিয়ে আমাদের ফজরের সালাতের জন্যে অপেক্ষা করবে? বেলাল রা. বললেন, আমি হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাদের জন্যে না ঘুমিয়ে ফজরের অপেক্ষা করবো। একথা বলে বেলাল রা. সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। অন্য দিকে সকলেই বিছানা পেতে ঘুমিয়ে গেল। বেলাল রা. রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন, কুরআন তেলাওয়াত করতে লাগলেন এবং আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করছিলেন আর ফজরের অপেক্ষা করছিলেন। অতঃপর যখন ফজরের আর সামান্য সময় বাকি আছে তখন তিনি তাঁর বাহনের সাথে হেলান দিয়ে বসে ফজরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআজ্জিন, তিনি ভালভাবেই জানতেন কখন ফজর হয়, কখন দিন হয় আর কখন রাত হয়। ফজর হতে আর যখন সামান্য সময় বাকি ছিল,

তিনি তাঁর বাহনের সাথে হেলান দিয়ে ফজরের অপেক্ষা করছিলেন; কিন্তু সারা দিনের সফরের ক্লান্তির কারণে তাঁর দু'চোখে ঘুম নেমে এলো, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এভাবেই ফজরের সময় শেষ হয়ে সূর্য উঠে গেল; কিন্তু কেউই সজাগ হল না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমে, সাহাবায়ে কেরাম রা.ও ঘুমে!!

অতঃপর যখন সূর্যের আলো এসে মুখে পড়লো, ওমর রা. লাফ দিয়ে উঠে গেলেন এবং বলতে লাগলেন সূর্য উঠে গেছে, সূর্যের আলোই আমাদের জাগ্রত করেছে, সূর্যের আলো আমাদের জাগ্রত করেছে। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়ে বেলাল রা.-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে বললেন, বেলাল! কী ব্যাপার, কী হয়েছে বলো? বেলাল রা. বললেন, আপনাদেরকে যে আটকে রেখেছিল, জাগ্রত হতে দেয়নি; আমাকেও সে-ই আটকে রেখেছে, জাগ্রত হতে দেয়নি। আমি যা দেখেছি শুধু তাই বলতে পারবো। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. ক্রুদ্ধ হলেন যে, কীভাবে তিনি তাঁদেরকে ঘুমের মধ্যে রেখে ঘুমিয়ে গেলেন? এই ঘটনা থেকেই বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর সালাতের প্রতি কতটা গুরুত্ব ছিল। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এ জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলো, এখানে শয়তান এসেছে। তখন তাঁরা সেখান থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে সালাত আদায় করলেন; কিন্তু তাঁদের একজন সালাত আদায় না করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। সকলের সাথে সালাতে শরিক হলেন না। সালাতে শরিক না হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার কী হয়েছে, তুমি সালাত আদায় করলে না কেনো? সে বললো, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি অপবিত্র; কিন্তু পানি নেই। সামান্য যে পরিমাণ পানি রয়েছে তা দিয়ে কোনো রকম ওযু হবে; কিন্তু আমার তো গোসলের প্রয়োজন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার পবিত্র হওয়ার জন্যে পবিত্র মাটিই যথেষ্ট। দুই হাত মাটিতে মেরে মুখ মাসেহ করবে এবং দুই হাতের কনুইসহ মাসেহ করবে। অতঃপর যখন পানি উপস্থিত হবে তখন গোসল করে নিবে।

হাদিস শরিফে এসেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'পবিত্র মাটি মুমিনের জন্যে পবিত্রকারী, যদিও দশ বছর পানি না থাকে। অতঃপর যখন পানি পাওয়া যাবে তখন আল্লাহর উপর ভরসা করে তা দিয়ে নিজের চামড়া স্পর্শ করবে।' (অর্থাৎ পানি দিয়ে গোসল করবে)

এই হাদিসের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়াম্মুমের আদেশ করেছেন।

অতঃপর সেখান থেকে সামনের দিকে কাফেলা যাত্রা শুরু করল; কিন্তু কিছু দূর সামনে অগ্রসর হওয়ার পরই তাঁদের পানির প্রয়োজন দেখা দিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আলি রা.সহ আরো কয়েক জনকে পানির সন্ধানে পাঠালেন। তাঁরা পানির সন্ধানে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়লেন; কিন্তু কোথাও যখন পানির দেখা পাচ্ছিলেন না তখন দূরে উটের পিঠে একজন মহিলাকে দেখতে পেলেন। তখন তাঁরা মহিলাটির নিকটে আসলেন এবং সেখানে এসে দেখেন তার সাথে উটের পিঠে চামড়ার তৈরি বড় বড় দুইটি পাত্র ভর্তি পানি আছে। তখন তাঁরা তাকে পানির স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, আমি যেখন থেকে পানি এনেছি তা এখান থেকে একদিন ও একরাতের পথ। একথা শুনে তাঁরা তাকে বলল, তুমি আমাদের সাথে এসো। সে বললো, কোথায় যাব? তাঁরা বললো, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। সে বললো, তিনি কি সেই লোক যাকে লোকেরা আস-সাবি নাম দিয়েছে? (যারা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তাদেরকে সাবি বলা হতো) তাঁরা বললো, তুমি যাকে উদ্দেশ্য করেছো তিনি সেই।

তখন তাঁরা তাকে নিয়ে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সকলকে কোমল আচরণ করতে বললেন। অতঃপর সে তার পানি ভর্তি পাত্র দুটি নামাল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্রের মুখ খুলতে বললেন। তাঁরা পাত্রটির কাছে এসে তার মুখ খুললো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরকতের জন্যে দোয়া করলেন এবং তার মধ্যে ফুঁ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর তিনি অন্য পাত্রটির মুখ খুলতে বললেন এবং বরকতের জন্যে

দোয়া করে তাতে ফুঁ দিয়ে মুখ বন্ধ করলেন। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে পাত্র নিয়ে আসতে বললেন। মহিলাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিলো আর ভাবছিলো এটাও কি সম্ভব? এটা কি বিশ্বাস করা যায় যে, মাত্র দুই পাত্র পানি পুরো একটা বাহিনীর জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে!!

সাহাবায়ে কেরাম রা. একজন একজন করে আসছেন, মটকার নিচে নিজের পাত্র রাখছেন, অতঃপর ভরা পাত্র নিয়ে খুশিমনে নিজ স্থানে ফিরে যাচ্ছেন। এরপর আরেকজন আসছেন সেও তার পাত্র ভরে নিয়ে যাচ্ছেন; এরপর তৃতীয়জন, চতুর্থজন এভাবে কাফেলার সকলে এসে পানি নিয়ে গেল। মহিলাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছে। শেষে অপবিত্র লোকটিকে ডেকে বললেন, এখান থেকে পানি নিয়ে গোসল করে পবিত্র হও। লোকটি তখন সেখান থেকে পানি নিয়ে গোসল করলো। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র দুটোর মুখ বেঁধে উটের পিঠে বেঁধে দিতে বললেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাটির সাথে ভাল ও সুন্দর আচরণ করতে বললেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. মহিলার সাথে সুন্দর ব্যবহার করলেন। সে যাতে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান তার অন্তরে প্রবেশ করে, সেজন্যে তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, তোমার পাত্র যতটুকু পানি ছিলো এখনও ততটুকুই রয়েছে এবং তুমি তোমার জান ও মালের ব্যাপারেও কোনোধরনের আশঙ্কা করবে না, আমরা তোমার জান-মালের কোনো ক্ষতি করবো না। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে বললেন, তোমরা তাকে কিছু হাদিয়া দাও। সাহাবায়ে কেরাম রা. কেউ খেজুর, কেউ আটা, কেউ রুটি এভাবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কিছু একটি কাপড়ে বেঁধে রাখলেন। অতঃপর মহিলাটি যখন তার উটের পিঠে চড়ে বসল, তখন খাবার ভর্তি পাত্রটি তার কাছে দেওয়া হল। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তো জানো যে, আমরা তোমার পাত্র থেকে একটুও পানি কমাইনি আর তুমি এটা (হাদিয়া) গ্রহণ করো, এগুলো তোমার সন্তানদের জন্যে।

Contents

মহিলাটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের আচরণ ও পানির কাহিনী দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তার কওমের নিকট ফিরে গেল। এখন প্রশ্ন হল এই ঘটনা মহিলাটির উপর কীধরনের প্রভাব ফেলেছিলো? সে কী পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল?

মহিলাটি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উটের পিঠে চলছিলো আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলোএমন মানুষও কি জগতে আছে? এমন ঘটনাও ঘটা সম্ভব? এই ঘটনাতে সে খুবই বিস্ময়াভিভূত হল, কারণ সে জীবনের প্রথমবার সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছে এবং দেখেছে তাঁর এক মুজিজা, অথচ সে তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি ও মুসলমান হয়নি। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কী সুন্দর ব্যবহার করলেন, একজন অমুসলিম নারীর সাথে কি সুন্দর আচরণ করলেন!! আর এটাই তো এই আয়াতের সত্যায়ন, আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ۝

'আমি আপনাকে রহমতস্বরূপ পঠিয়েছি।'[১]

তিনি মুসলমানদের জন্যেও রহমত, অমুসলিমদের জন্যেও রহমত। তিনি বড়দের জন্যেও রহমত, ছোটদের জন্যেও রহমত। তিনি দাস-দাসীদের জন্যেও রহমত আবার স্বাধীন মানুষের জন্যেও রহমত অর্থাৎ তিনি ঘোটা পৃথিবীর জন্যে রহমত। তিনি রহমত ও কোমলতা নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَبِمَا رَحۡمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنۡتَ لَهُمۡ ۚ وَ لَوۡ كُنۡتَ فَظًّا غَلِيۡظَ الۡقَلۡبِ لَا نۡفَضُّوۡا مِنۡ حَوۡلِكَ ۠

'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্যে কোমল হৃদয় হয়েছেন, পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয়ের হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।'[১]

---

১. সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

এই মহিলাটা কাফের, পথভ্রষ্ট ও মূর্তিপূজারী হওয়া সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কোমল ও সর্বোত্তম ব্যবহার করলেন।

মহিলাটি এখন নির্জন শুষ্ক প্রান্তরে একাকী হেঁটে হেঁটে তার কওমের কাছে ফিরে গেল। তখন তারা তাকে বলল, হে অমুক! তোমার এতো দেরি হল কেনো? অর্থাৎ পূর্বের চেয়ে এবার পানি আনতে এত দেরিহল কেনো? তখন সে বললো, আমি আজ একজন জাদুকর দেখে এলাম, আমার বিশ্বাস সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাদুকর হবেন। সে কিন্তু একথা বলেনি যে, আমি একজন প্রেরিত রাসুলকে দেখে এলাম। বরং সে বলছে আমি সবচেয়ে বড় যাদুকরকে দেখে এলাম। সে পানির পাত্রের মুখ খুলে বাহিনীর সকলকে পানি ঢেলে দিলেন। আমি সবচেয়ে বড় যাদুকরকে দেখলাম, তবে হতে পারে সে প্রেরিত নবি হবেন। এরপর মহিলাটি তার কওমের কাছে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করতে লাগল।

এর কিছুদিন পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের ইসলাম প্রচারের জন্যে প্রেরণ করলেন, সাহাবায়ে কেরাম রা. বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে সেখানে ইসলাম প্রচার করলেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. যখন মহিলাটির কওমের কাছে আসলো তখন তাঁরা তাদের এড়িয়ে গেলেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন না। তাঁরা তার ডানের, বামের, সামনের, পিছনের গোত্রের সাথে যুদ্ধ করলেন কিন্তু মহিলাটির কওমকে এড়িয়ে গেলেন। তখন মহিলাটি তার কওমের লোকদের বললো, আমার মনে হয় এঁরা তোমাদের উপর আক্রমণ করছে না এর কারণ হল এঁরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদী। আমি তো তাঁদের এই মুজিজা দেখেছি, তাহলে তাঁকে সত্য বলে মেনে নিতে তোমাদের সমস্যা কি? মহিলাটির আহ্বানে তার কওমের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলো আর এভাবেই মহিলাটি সকলের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম হল। এই মহিলার অবস্থান এবং সে যা দেখেছে তা সাহাবায়ে কেরাম রা. অনেকবার দেখেছেন, বারবার দেখেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

---

১. সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ

'আমি আমার রাসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ কিতাব।'[১]

অর্থাৎ সুস্পষ্ট অনেক নিদর্শন দিয়ে নবি-রাসুলদের প্রেরণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে জানা ও পরিচিত হওয়া যাবে যে, তাঁরা হলেন আল্লাহর নবি। আর এ-কারণেই আল্লাহ তাআলা যখন যে নবিকে প্রেরণ করেছেন তখন তাঁর সাথে এমন কোনো নিদর্শন বা মুজিজা দিয়ে পাঠিয়েছেন যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তিনি হলেন আল্লাহর নবি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক মুজিজা দিয়েছেন, যা বিভিন্ন সময় তাঁর থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

আর একটি মুজেযার কথা এখানে উল্লেখ করছি। সেটি আরো বেশি আশ্চর্যজনক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিয়ে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে তাঁরা হুদাইবিয়া নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন। (হুদাইবিয়া তখন ছিলো মক্কার বাইরের একটি অঞ্চল তবে বর্তমানে তাকে মক্কার ভিতরের একটি অংশ মনে করা হয়।) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪০০ সাহাবিকে নিয়ে উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হন; কিন্তু হুদাইবিয়া নামক স্থানে কুরাইশরা তাদের বাধা প্রদান করে। ফলে সাহাবায়ে কেরমাকে নিয়ে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই অবস্থান করেন। জাবের রা. থেকে বর্ণিত যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ওযুর জন্যে একটি পাত্রে পানি দেওয়া হল, তখন সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে এসে জড়ো হলেন। এমন সময় তাঁদেরকে পাশে একত্রিত হতে দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কী ব্যাপার? তোমরা এসময় এখানে একত্রিত হলে যে? সাহাবিগণ তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের কাছে কোনো

---

১. সুরা হাদিদ, আয়াত : ২৫

পানি নেই যা দিয়ে আমরা ওযু করবো এবং যেখান থেকে পান করবো। পুরো কাফেলার মধ্যে শুধু এতটুকু পানিই রয়েছে যা দিয়ে আপনি ওযু করছেন। তিনি তো আল্লাহর রাসুল। আল্লাহর সত্য নবি। তিনি যখন দেখলেন কাফেলার সকলে পানির কষ্ট করছে। তাঁর সামনে যেটুকু পানি রয়েছে তা ব্যতীত কাফেলায় আর কোনো পানি নেই। তখন তিনি তাঁর হাত ঐ পানির মধ্যে রাখলেন এবং আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করলেন। জাবের রা. বলেন, আল্লাহর শপথ আমরা দেখলাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঙ্গুল দিয়ে পানি বের হচ্ছে এবং পাত্রটি ভরে গেল, অতঃপর আমরা আমাদের সকলের নিকট যত পাত্র ছিলো সবগুলো পাত্র ভরে নিলাম এবং আমরা পানি পান করলাম ও ওযু করলাম। জাবের রা. কে প্রশ্ন করা হল, তখন আপনাদের লোকসংখ্যা কত ছিলো? তিনি বলেন, আমরা এক হাজার চারশত (১৪০০) ছিলাম। আল্লাহর শপথ আমরা যদি এক লক্ষও থাকতাম তাহলেও তা আমাদের সকলের জন্যে যথেষ্ট হতো।

আপনারা কি নিশ্চিত? তিনি বলেন আমরা এক হাজার চারশত (১৪০০) ছিলাম। আল্লাহর শপথ আমরা যদি এক লক্ষও থাকতাম তাহলেও তা আমাদের সকলের জন্যে যথেষ্ট হতো। পূর্বের মহিলা অমুসলিম থাকা অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা দেখেছে, অতঃপর তিনি মুসলমান হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম রা.এর মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে মুজিজা দেখেছেন, আবার ইসলাম গ্রহণ করার পরও দেখেছেন।

ইসলাম গ্রহনের পূর্বে যাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা দেখে আশ্চর্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তখন অল্প বয়সের বালক ছেলে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আবু বকর রা.কে সঙ্গে নিয়ে মক্কার প্রান্তরে হাঁটছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বকরি চড়াচ্ছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক পিপাসার্ত হলেন এবং সামনে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর এক স্থানে অনেকগুলো বকরি দেখতে পেলেন। তিনি বকরি চড়াতে থাকা এই বালকের নিকট আসলেন এবং তাকে বললেন, হে অমুক! আমাদেরকে দুধ পান করাও। তখন সে বলল, আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত, আমাকে এগুলো দেখাশুনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি এগুলোর মালিক নয়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বালক! তোমার কাছে কি এমন বকরি আছে যা এখনো বাচ্চা দেয় নাই, অর্থাৎ যার ওলানে এখনো দুধ আসে নাই। সে বললো, হাঁ আছে, অতঃপর সে একটি ছোট বকরি নিয়ে আসলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওলানে হাত বুলালেন এবং দোয়া করলেন। তখন ছাগলটি তার দু'পা ছাড়িয়ে দিল এবং সাথে সাথে তার ওলান দুধে ভরে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এই দৃশ্য দেখছেন আর আশ্চর্য হচ্ছেন।

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ দোহন করলেন এবং তিনি তা থেকে পান করলেন, আবু বকর রা. পান করলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদরা.ও পান করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আপনি যা বলেছেন তা আমাকে শিক্ষা দিন। রাসুলুল্লাহ তাঁকে বললেন, তুমি বালক তোমাকে শিখানো হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সত্তরটি সুরা মুখস্থ করে নিলাম। এক্ষেত্রে আমার সাথে কেউ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়নি।

এগুলো হল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা বা নিদর্শন। তাঁর নিদর্শন এখনো জারি আছে আর তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলআল-কুরআনুল কারিম।

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি– তিনি আমাদের অন্তরে ইমানকে দৃঢ় করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি অন্তরসমূহ স্থিরকারী, আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার আনুগত্যের উপর স্থির করে দিন। আমিন।

Contents

অহংকার ও প্রবঞ্চনা মানবসত্তাকে কুফরির দিকে ঠেলে দেয়

বর্তমানে আমাদের মধ্যে অহংকার, প্রবঞ্চনা ও আত্মাভিমান কঠিনভাবে বাসা বেঁধেছে; কিন্তু আমরা জানি না যে, এই অহংকার ও প্রবঞ্চনা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। মানুষ যে সকল কারণে কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করে অহংকার তার মধ্যে অন্যতম। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

'যার অন্তরে অনু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'

অন্য হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

কিয়ামতের দিন অহংকারীদের ছোট পিঁপড়ার আকারে উত্থিত করা হবে। যারা মানুষের পায়ের নিচে পিষ্ট হবে।

এখানে ওমর রা.-এর খেলাফতকালে ঘটে যাওয়া অহংকার সম্পর্কে একটি অশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করছি।

আমরা এখন গাসসানের বাদশার ঘটনা অলোচনা করবো। গাসসান জাযিরাতুল আরবের দক্ষিণে অবস্থিত একটি খৃস্টান অধ্যুষিত এলাকা। ওমর রা.-এর খেলাফতের সময় গাসসানের এক শাসক মদিনায় আগমন করলো। লোকটি ঘোড়ার চড়ে ও অনেক লোক আর সৈন্যদের মধ্যে থেকে অহংকারের সাথে মদিনায় প্রবেশ করলো। সে মদিনায় এসেছে ওমর রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে। যখন সে ওমর রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করলো তখন তার মাথায় ছিলো স্বর্ণের মুকুট আর গায়ে ছিলো রেশমী পোশাক। ওমর রা. তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। লোকটির নাম ছিলো জাবালা ইবনুল আইহাম। তখন ইসলাম গ্রহণ করে সে মুসলমান হয়ে গেল। ইসলাম গ্রহণের পর ওমর রা. তাঁকে স্বর্ণের মুকুট আর রেশমী পোশাক খুলে ফেলতে বললেন এবং মুসলমানদের জন্যে বৈধ পোশাক পরিধান করতে বললেন। লোকটি সেগুলো খুলে ইসলামি পোশাক পরিধান করলো, অতঃপর সে ওমরা পালনের ইচ্ছা করলে ওমর রা. তাঁকে ওমরার নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিলেন এবং ইহরামের বিষয়টা

বুঝিয়ে দিলেন। তখন সে ইহরাম পরিধান করে তালবিয়া পড়ে মক্কায় প্রবেশ করলো; কিন্তু তার অন্তরে তখনও অহংকার ও আত্মাভিমানের কিছু অংশ বাকি ছিল।

সে মানুষের সাথে সাথে তালবিয়া .... لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيكপড়তে পড়তে মক্কায় আসলো এবং কাবার চতুর্পার্শ্বে তাওয়াফ শুরু করলো। কাবা তখন বর্তমানের মত এত বিশাল আয়তনের ছিলো না এবং তা বহু তলা বিশিষ্টও ছিলো না; পূর্বে কাবার ছিলো পুরানো একটি গৃহ এবং আয়তন ছিলো অনেক ছোট। তখন কাবার পাশে বিভিন্নজন বিভিন্ন কিছু বিক্রি করতো অর্থাৎ কাবার পাশেই ছিলো বাজার। জাবালা ইবনে আইহাম কাবার চতুর্পার্শ্বে তাওয়াফ করতে লাগলো। ওমর রা.ও তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। ভিড়ের মধ্যে তাওয়াফের সময় অসর্তকতাবশত এক বেদুইনের পা জাবালা ইবনে আইহামের চাদরের কোনায় লাগলো। এতে জাবালা ইবনে আইহাম অনেক রেগে গেল, সে চোখ বড় বড় করে বেদুইন লোকটির দিকে তাকাল এবং আমার চাদরে পারা দিলি কেনো একথা বলে তার চেহারার উপর জোড়ে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলো। যাতে বেদুইন লোকটির চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। বেদুইন লোকটি মনে মনে বলল, আমরা এখন আল্লাহর ঘরে আল্লাহর সামনে আছি। সুতরাং আমি কি হারামের ভিতর এই লোকটির গালে থাপ্পড় দিবো? বেদুইন লোকটি জনতো এখানে একজন বিচারক আছে, তাই সে তাকে কোনো আঘাত না করে বিষয়টি বিচারকের দরবারে উপস্থাপন করার জন্যে গেল।

বেদুইন লোকটি ওমর রা.-এর নিকট গিয়ে বলল, হে ওমর! জাবালা ইবনে আইহাম আমার চেহারায় এত জোরে থাপর দিয়েছে যে, আমার চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওমর রা. তখন জাবালা ইবনে আইহামকে ডাকলেন। অতঃপর বিচার মজলিস কায়েম হল। ইসলামে বিচারের ক্ষেত্রে সবাই সমান, বড়-ছোট, ধনী-গরিব সকলেই সমান, কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এবিষয়ে এখানে আরো একটি চমৎকার ঘটনা বলে নিচ্ছি। আলি ইবনে আবু তালেব রা. তখন আমিরুল মুমিনিন, খলিফাতুল মুসলিমিন। তিনি একদিন বাজারে গেলেন

এবং এক ইহুদিকে ঢাল বিক্রি করতে দেখলেন। ঢালটি দেখে আলি রা. চিনে ফেললেন যে, এটা তাঁরই ঢাল, কোনো এক যুদ্ধের সময় তাঁর হাত থেকে এটা পড়ে গিয়েছিল। পরে তিনি তা আর খোঁজে পান নি। আলি রা. তখন ইহুদি লোকটিকে বললেন, মনে হচ্ছে এটা আমার ঢাল। ইহুদি বললো, না এটা আপনার ঢাল নয়। আপনার কিনতে মনে চাইলে এটা কিনে নিতে পারেন। আলি রা. বললেন, আমি আমিরুল মুমিনিন, মিথ্যা বলা আমার জন্যে জায়েয নেই। বরং এটা আমারই ঢাল। ইহুদি বললো, না এটা আপনার ঢাল নয়। অতঃপর তারা দুজনে কাযির নিকট অভিযোগ নিয়ে গেল। হাঁ, ঘটনাটি যখন ঘটেছে তখন সময়টা ছিলো আলি রা.-এর খেলাফতের সময়!! তিনি তখন খলিফাতুল মুসলিমিন।

কাযির দরবারে আলি রা. গিয়ে বসে পড়লেন আর ইহুদি লোকটি তার ঢাল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাযি বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি আপনার প্রতিপক্ষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। আলি রা. তখন ইহুদির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাযি তাঁকে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন! বলেন আপনার অভিযোগ কী? আলি রা. বললেন, এই ঢালটি আমার ঢাল, অমুক যুদ্ধে আমার কাছ থেকে তা পড়ে গিয়েছিল। ইহুদি লোকটি বলল, না এটা আমার ঢাল, এটা আমি কিনেছি এবং আমি এখন এটা বিক্রি করতে চাই। কাযি বলল, হে আমিরুল মুমিনিন আপনার পক্ষে কোনো সাক্ষী আছে? আলি রা, বললেন, আমার ছেলে হাসান আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। কাযি বললেন, বাবার পক্ষে ছেলের সাক্ষ্য আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আপনার কি অন্য কোনো সাক্ষী আছে? তিনি বললেন, না। কাযি বললেন, তাহলে আমি ঢালটি ইহুদি লোকটিকে দেওয়ার ফায়সালা করছি। ইহুদি যখন এমন ফায়সালা দেখলো তখন সে একবার আলি রা.-এর দিকে তাকায়, একবার কাযির দিকে তাকায়। তখন সে বললো, এই ধর্মের বিচার এতটা ইনসাফপূর্ণ!! কাযি আমিরুল মুমিনিনের বিপক্ষে একজন ইহুদির পক্ষে ফায়সালা করছে!! যে কিনা বিশ্বাস করে উজাইর আল্লাহর পুত্র। আল্লাহ তাআলা দরিদ্র, আল্লাহরও ব্যর্থতা রয়েছে। সেই ইহুদির পক্ষে স্বয়ং আমিরুল মুমিনিনের বিপক্ষে ফায়সালা করছে!! ইহুদি এই দৃশ্য দেখে সাথে সাথে কালিমা পড়ে

Contents

মুসলমান হয়ে গেলেন, এবং বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন! নিন এটা আপনারই ঢাল, অমুক যুদ্ধে এটা আপনার হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, আপনি চলে যাওয়ার পর আমি তা নিয়ে নিয়েছিলাম। আলি রা. তখন বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো, সুতরাং আমি এটা তোমাকে হাদিয়া দিলাম, নাও এটা এখন থেকে তোমার, অতঃপর তিনি ঢালটি তাঁকে দিয়ে দিলেন।

ইসলামে বিচারের ক্ষেত্রে সকলে সমান। এখানে দূর্বলের উপর সবলের পক্ষে অন্যায়ভাবে ফায়সালা করা হয় না। এখানে সবাই সমান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণ হল, যখন তাদের সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো। আর যখন দুর্বল কেউ চুরি করতো তখন তারা তার উপর দণ্ডবিধি আরোপ করতো।'

বলছিলাম গ্রাম্য লোকটি জাবালা ইবনে আইহামের সাথে আমিরুল মুমিনিন ওমর রা.-এর সামনে দাঁড়ালো। ওমর রা. বললেন, হে জাবালা! তুমি কেনো তাকে থাপর দিয়েছো? জাবালা বললো, সে তার পা দিয়ে আমার চাদর মাড়িয়েছে। ওমর রা. তাকে বললেন, এক লোক ভুলে তোমার চাদর মাড়িয়েছে আর তুমি সকলের সামনে তাকে থাপ্পড় দিয়েছো? এখানে তো অন্য কোনোভাবেও তার সংশোধন করা যেতো। এভাবে সকলেই যদি আইন নিজের হাতে তুলে নেয় তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা বেঁধে যাবে এবং সমাজ আবার পূর্বের জাহিলিয়াতের দিকে ফিরে যাবে। পরস্পরের মাঝে রক্তারক্তি আর খুনাখুনি শুরু হয়ে যাবে। হে জাবালা! এখন ফয়সালা হল, এই লোকটিও ঠিক তোমাকে সেভাবেই থাপ্পড় দিবে তুমি যেভাবে তাকে থাপ্পড় দিয়েছো। সে আমাকে থাপ্পড় দিবে অথচ আমি একজন রাজা? ওমর রা. বললেন হাঁ, তুমি রাজা হলেও সে তোমাকে থাপ্পড় দিবে। তবে ভিন্ন আরেকটি ব্যবস্থা রয়েছে আর তা হল তুমি এই লোকটিকে সন্তুষ্ট করে তার কাছ থেকে ক্ষমা আদায় করে নিবে। তুমি তার হাত ধরো, তার কপালে চুমো খাও, অতঃপর তাকে বলো, ভাই আমাকে

Contents

ক্ষমা করে দিন। আর সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে তাহলে বিষয়টি এখানেই শেষ। আর সে যদি তোমাকে ক্ষমা না করে তাহলে কিসাসই নিতে হবে। জাবলা ইবনে আইহাম বললো, আমি আগামীকাল আসবো, তখন সে আমার থেকে কিসাস নিবে এবং আমাকে মারবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসাসের আদেশ দিতেন। এমনকি রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের থেকেও কিসাস নিতে বলতেন। বদরের যুদ্ধের দিন, তখনো যুদ্ধ শুরু হয়নি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের শৃঙ্খলার জন্যে মুসলমানদের কাতার সোজা করছেন। একে সামনে এগিয়ে দিচ্ছেন, ওকে পিছিয়ে দিচ্ছেন। সাওয়াদ ইবনে দাজিয়া রা. বদরের যুদ্ধে শাহাদাতের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত সাহাবিদের একজন।তিনি বারবার কাতারের সামনে এগিয়ে আসছিলেন। রাসুলুল্লাহ তাঁকে পিছিয়ে দিচ্ছেন আর তিনি সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি সেটা দিয়ে সাওয়াদ রা.-এর পেটে গুতা দিয়ে বললেন, সাওয়াদ পিছনে যাও। সাওয়াদ রা. তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন। হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, আমার থেকে কিসাস নাও। সে বললো, আপনার লাঠি দিন। তিনি তাঁকে লাঠি দিলেন। অতঃপর সে বললো, আপনার পেট থেকে কাপড় সরান, তাহলে আমি আপনাকে আঘাত করবো যেমন আমাকে আঘাত করার সময় আমার পেটের উপর কাপড় ছিলো না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পেটের উপর থেকে কাপড় সরালেন আর তখন সাওয়াদ ইবনে দাজিয়া রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জড়িয়ে ধরে তাঁর পেটের উপর চুমু খেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন সাওয়াদ! এমনটি করলে কেনো? সাওয়াদ রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন যে, যুদ্ধ তো শুরু হয়েই গেছে। তাই আমি চাইলাম সর্বশেষ আপনাকে স্পর্শ করি।

Contents

বলছিলাম জাবালা ইবনে আইহাম এটা মেনে নিতে পারছিলো না যে, তাকে একজন গ্রাম্য লোক থাপ্পড় দিবে। তাই সে বলল, আমি আগামীকাল আসবো। সে কি আগামীকাল এসেছিল? পরদিন ওমর রা. তাদের বিচারটা শেষ করার জন্যে জাবালার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন; কিন্তু জাবালা আসছে না, সে এর পূর্বেই বাহনে আরোহণ করে তার সাথীদের নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে শামের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে এবং আবার তার দেশে গিয়ে খৃস্টান ধর্মে ফিরে গেছে। এবং

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ؕ

'বলুন তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।'[১]

এটা বলার পরিবর্তে সে বলছে খোদা তিনজন। ইসা আ. আল্লাহর পুত্র। এভাবেই খৃস্টান অবস্থাতেই সে বৃদ্ধ হয়ে গেল। এবং বৃদ্ধ বয়সে এসে সে একটি কবিতা রচনা করল।

'একটি থাপ্পরের লজ্জায় সম্ভ্রান্ত লোকটি খৃস্টান হয়ে গেল। আমার কী ক্ষতি হতো যদি আমি ধৈর্য ধারণ করতাম?'

'আমার অহংকার ও আত্মাভিমান আমাকে শেষ করে দিল। এই অহংকারের কারণেই আমি সুস্থ চক্ষু বিক্রি করেছি অন্ধ চক্ষুর বিনিময়ে।'

'হায়! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিত। হায়! আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি ওমরের কথায় ফিরে যেতাম।'

'হায়! আমি যদি শামের সাধারণ কোনো নাগরিক হতাম। শ্রবণশক্তি আর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে বসে আছি।'

লোকটি এই কবিতা বারবার আবৃত্তি করতো এবং সে একথাও বলতো, হায়! আমি যদি খৃস্টান হওয়ার পরিবর্তে অসহায় মিসকিন হয়ে কোনো নির্জন প্রান্তরে মেষ বা উট চড়াতাম!! অতঃপর লোকটি এভাবে খৃস্টান

---

১. সুরা ইখলাস: ১-৩

অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করলো। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। এই লোকটির খৃস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করার কারণ কী? একমাত্র অহংকার ও আত্মপ্রবঞ্চনাই তাকে বেইমান করে মৃত্যুবরণ করালো। সে আল্লাহর হুকুমের সামনে নতিস্বীকার করেনি, অহংকার করে আল্লাহর হুকুম প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই মৃত্যুর সময় তার ইমান নসিব হয়নি।

অহংকার ও আত্মপ্রবঞ্চনার সমস্যা হল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা মানুষকে হক ও সত্য গ্রহণে বাধা প্রধান করে। কত মানুষ যে রয়েছে অহংকার ও আত্মপ্রবঞ্চনার কারণে হক গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে।আবার অনেক মানুষ শুধু বিনয় ও নম্রতার কারণেই হক গ্রহণ করতে পেরেছে। কত মানষকে হকের দিকে আহ্বান করা হয়েছে কিন্তু তারা হককে হক হিসেবে জানার পরও শুধুমাত্র অহংকার ও আত্মপ্রবঞ্চনার কারণে হক গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে।

উদাহরণস্বরূপ আবু জাহেলের কথাই বলি। আবু জাহেল ছিলো এই উম্মতের ফেরাউন। একবার এক সাহাবি আবু জাহেলের সাথে সাক্ষাৎ করলো। লোকটির উদ্দেশ্য ছিলো আবু জাহেলকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। সে বলল, হে আবুল হিকাম! তোমাকে একটি প্রশ্ন করি, তুমি কি জানো না যে, মুহাম্মাদ হকের উপরে আছে? আবু জাহেল বলল, না না সে বাতিলের উপর আছে, সে মিথ্যাবাদী সে প্রতারক। লোকটি আবার তাকে প্রশ্ন করলো, সত্যি করে বলো দেখি আমার সাথে মিথ্যে বলবে না। আবু জাহেল বলল, আমি জানি যে, সে সত্যের উপরই আছে আর আমরা যে মূর্তির পূজা করছি তা আমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। লোকটি তখন তাকে প্রশ্ন করলো, তাহলে তুমি সত্য দীন গ্রহণ করছো না কেনো? আবু জাহেল বলল, আমরা বনু মাখজুম গোত্র আর আবদে মানাফ গোত্র সর্বদা কুরাইশের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে প্রতিযোগিতা করেছি। তারা যদি মানুষকে খাবার খাওয়ায় তাহলে আমরাও খাবার খাওয়াতাম, তারা যদি মানুষকে পানি পান করায় তাহলে আমরাও পানি পান করাতাম। অর্থাৎ আমরা প্রতিযোগিতার ঘোড়ার মত একবার এটা আগে আকেবার ওটা। এখন আবদে মানাফ গোত্রে নবি

Contents

আসলে আমরা নবি কোথায় পাবো? এটা যদি খাবার খাওয়ানোর কোনো বিষয় হতো তাহলে আমরাও খাবার খাওয়াতাম, এটা যদি পানি পান করানোর মত কোনো বিষয় হত তাহলে আমরাও পানি পান করাতাম; কিন্তু এটাতো পানি পান করানো বা খাবার খাওয়ানোর মত কোনো বিষয় না। এটা হল নবুওয়াতের বিষয়; তারা যখন বলবে, আমাদের মাঝে নবি আছে তখন আমরা নবি পাবো কোত্থেকে?? সুতরাং এর থেকে বাঁচার উপায় একটাই, তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তাঁকে নবি হিসেবে না মানা।

হে ভাই! একটু লক্ষ করে দেখ, অহংকার ও আত্মপ্রবঞ্চনা আর বংশের গৌরব তাকে হক গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখলো, দীনে ইসলামে প্রবেশে বাধা দিল। এই অহংকার ও আত্মপ্রবঞ্চনা আর বংশের গৌরব যে কত মানুষকে হক গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে!! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

'আর তাকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার পাপ তাকে অহঙ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্যে দোযখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হল নিকৃষ্টতম ঠিকানা।'[১]

অনেক মানুষকে অন্যের হক আদায় করার উপদেশ দেওয়া হয়; কিন্তু অহংকারবশত সে এই নসিহত গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং বলে, আমাকে নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না, আমার বিষয় আমিই ভাল জানি। আমার পক্ষে কি কাউকে জুলুম করা সম্ভব? তোমরা আমাকে নসিহতের উপযুক্ত নও। এই অহংকারের কারণেই কত মানুষের সাথে তার ভাইয়ের সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে, তা আর কখনো ঠিক হয় নি।

এক লোক তার স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করার কারণে তার স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গেছে। আমরা যখন সেই লোককে বললাম যে, আপনি স্বীকার করেন আর না করেন এখানে দোষ আপনারই। ভুল

---

১. সুরা বাকারা, আয়াত : ২০৬

আপনিই করেছেন। সুতরাং আপনার স্ত্রীর নিকট যান এবং তার নিকট দুঃখ প্রকাশ করুন। তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। আপনার ছেলে-মেয়েরা ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত এতিমের মত জীবনযাপন করছে। আপনার স্ত্রী আপনার কাছে কোনো ধন-সম্পদ চায় না। আপনি শুধু একবার তার সামনে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করুন, দেখবেন সে চলে আসবে। আবার সবকিছু আগের মত ঠিক হয়ে যাবে; কিন্তু সে বলে আমি তার সামনে দুঃখ প্রকাশ করবো? তার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমি ছোট হবো? না এটা হতে পারে না। আমি তার সামনে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে পারবো না। ভাই! কোন জিনিসের কারণে সে এমনটি করলো? এটা কি শুধুমাত্র অহংকারের কারণে হয়নি? অবশ্যই অহংকারের কারণেই সে এটা থেকে বিরত থেকেছে।

অনেক মানুষ আছে যারা ইচ্ছা করে কোনো কারণ ছাড়াই বাম হাত দিয়ে খাবার খায়। আমরা যখন তাকে বলি, ভাই আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আপনি ডান হাত দিয়ে খাবার খান; কিন্তু সে আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। কোন জিনিস তাকে সঠিক বিষয়টা বুঝা থেকে ফিরিয়ে রাখলো? শুধু কি অহংকারের কারণেই এমনটি করেনি এবং সঠিক বিষয়টা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেনি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসা ছিলেন, সেখানে এক লোক বাম হাত দিয়ে খাবার খাচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমলভাবে অত্যন্ত স্নেহ-সহানুভূতির সাথে তাকে বললেন, তুমি ডান হাত দিয়ে খাবার খাও। সে বলল, এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি আর কখনো সক্ষম হবেও না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তার ডান হাত অবশ হয়ে গেছে, সে আর কখনো তা উঠাতে পারে নি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন অহংকারের কারণে সে এটা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলো।

ভাই! একটু লক্ষ করুন, শুধুমাত্র অহংকারের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বদ দোয়া দিলেন। এই অহংকারের কারণে মানুষ ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে থাকে। অহংকারের কারণে অনেক মানুষ

মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করে না। সে বলে আমি মসজিদে যাবো? সেখানে কত নিচু প্রকৃতির লোকও সালাত পড়ে!! হাজ্জাজ ইবনে আরতারাহ একজন হাদিসের রাবি। অনেকেই তাকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলেছেন, কারণ সে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতো না। তাঁরা বলেন, আমরা তাকে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায়ের ব্যাপারে নসিহত করতাম; কিন্তু সে বলতো আমি মসজিদে যাবো? অথচ সেখানে কুলি-মজুররাও থাকে, আমি তাদের সাথে একসাথে সালাত আদায় করবো। অর্থাৎ আমি আমার সুগন্ধিযুক্ত সুন্দর পোশাক নিয়ে তাদের সাথে দাঁড়িয়ে সালাত পড়বো? আর বর্তমানেও তো অহংকারের কারণে কত মানুষ মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করে না। যেমন কলেজের প্রিন্সিপাল, ভার্সিটির চ্যান্সেলর, এলাকার গভর্নর ইত্যাদি লোকেরা মসজিদে গিয়ে সালাত পড়ে না। তারা বাড়িতে ছেলে সন্তানদের নিয়ে অথবা খাদেম-খুদ্দাম ও আশপাশের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে।

আল্লাহ তোমাকে আহ্বান করছেন। তিনি তোমাকে বলছেন তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। অর্থাৎ তিনি বলছেন তোমরা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায়কারীদের সাথে সালাত আদায় করো। সুতরাং হে প্রিন্সিপাল! হে চ্যান্সেলর! হে গভর্নর! আপনারা মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করুন, কারণ মসজিদ বানানো হয়েছে সালাত আদায়ের জন্যে। এজন্যে নয় যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে সালাতের স্থান বানাবে এবং বলবে, আমি কৃষক-শ্রমিকদের সাথে সালাত আদায় করবো? আমি ছাত্রদের সাথে সালাত আদায় করবো? সে এটা কেনো করল? শুধুমাত্র অহংকারের কারণে কি সে এমনটি করেনি?

হে ভাই! কিয়ামতের দিন অহংকারীদের ছোট পিঁপড়ার আকারে উত্থিত করা হবে। যারা মানুষের পায়ের নিচে পিষ্ট হবে।

এবং যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহংকার থাকবে সে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

আল্লাহ তাআলার কাছে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাকে এবং আপনাদেরকে শুধুমাত্র তাঁর জন্যে বিনয় ও নম্র হওয়ার তাওফিক দান করেন। আমিন।

দৃষ্টি অবনত রাখা

كل الحوادث مبداها من النظر

و معظم النار من مستصغر الشرر

كم نظرة فتكت بقلب صاحبها

فتك السهام بلا قوس ولا وتر

يسر مقلته ما ضر مهجته

لا مرحبا بسرور عاد بالضرر

সকল ঘটনা-দুর্ঘটনার সূচনা দৃষ্টি থেকে।
বড় বড় অগ্নিকাণ্ডের সূচনাও হয় তুচ্ছ স্ফুলিঙ্গ থেকে।
কত দৃষ্টি যে দ্রষ্টাকে করেছে লণ্ডভণ্ড।
ধনুকহীন তীরের ন্যায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে করে ছিন্নভিন্ন।
অন্তর কষ্ট পায়. চক্ষু শীতল হয়।
এমন আনন্দের কোনো প্রয়োজন নেই যা কষ্ট বয়ে বেড়ায়।

দৃষ্টি ও দৃষ্টি নিবদ্ধের অনেক অবাক করা ও আশ্চর্যজনক ঘটনা রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম আ.কে সৃষ্টি করলেন। এবং জান্নাতে তাঁর প্রশান্তির জন্যে খানা-পিনা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, বিভিন্ন নহরসহ মনোরঞ্জনের সবকিছুই প্রস্তুত করে দিলেন।

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

'সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত যত সব আরযা তোমরা দাবি কর সেখানে তার সবকিছুই তোমাদের জন্যে থাকছে।'[১]

তা সত্ত্বেও আদম আ. এমন একজনের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন যে জান্নাতে তাঁকে সঙ্গ দিবে, তাঁর সাথে কথা বলবে। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম আ.কে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে তাঁর

১. সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৩১

সৃষ্টিজীবের মধ্য থেকে কোন জিনিসকে বেছে নিলেন? তিনি কি কোনো পাখিকে বেছে নিলেন, যে মিষ্টি স্বরে তাঁকে গান শুনাবে? না-কি কোনো আহ্লাদে বিড়ালকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করলেন, যার সাথে দুষ্টমি করে তিনি সময় কাটাবেন? না-কি কোনো ঘোড়া নির্ধারণ করলেন যার উপর সওয়ার হয়ে বিভিন্ন জায়াগায় ঘুরে বেড়াবেন। না-কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম আ.কে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে এর কোনোটাকেই নির্ধারণ করেননি, কারণ যেনো আল্লাহ তাআলার আদম আ.কে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন তিনি জানতেন যে, আদমের একজন নারী সঙ্গিনী প্রয়োজন। যার দিকে তাকিয়ে তাঁর চক্ষু শীতল হবে, মন প্রশান্ত হবে, এবং আত্মা স্থীর হবে।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা আদমের সঙ্গী হিসেবে হাওয়া আ.কে নারী হিসেবে সৃষ্টি করলেন।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

'সুতরাং তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র সত্তা থেকে আর তাঁর থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর জোড়া, যাতে করে সে তাঁর কাছে স্বস্তি পেতে পারে।'[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হওয়া আ.কে আদম আ.-এর পাঁজরের হাড় দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এবং একজনের সাথে অন্য জনের দিলকে আকৃষ্ট করে দিয়েছেন।

এখন আমরা কয়েকজন প্রেমিকের গল্প শুনবো। তারা কীভাবে প্রেমে পড়ে ছিল? এবং কেনো প্রেমে পড়ে ছিল?

বর্ণিত আছে আসমায়ি রহিমাহুল্লাহ একদিন এক শহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি সেখানে দুই/তিন দিন অবস্থান করলেন এবং শহরের আশপাশে ঘোরাঘুরি করলেন। ঘোরাফেরার সময় শহরের বাইরে একটি পাথরের উপর তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল, যার উপর লেখা ছিলো–|

---

১. সুরা আরাফ, আয়াত : ১৮৯

يا معشر العشاق بالله خبرواإذا حل عشق بالفتي كيف يصنع

হে প্রেমিকরা! আল্লাহর জন্যেবলো, কোনো যুবক প্রেমে পড়লে সে কি করবে?

তখন আসমায়ি রহিমাহুল্লাহ্ তার পাশে আর একটি পাথর নিয়ে তার উপর লিখলেন :

يداري هواه ثم يكتم همهويقنع بكل الأمور و يخنع

সে তার আসক্তিকে দমিয়ে রাখবে এবং তার দুঃখ লুকিয়ে রাখবে। প্রেমাস্পদের সকল বিষয়ে তৃপ্ত হবে।

و كيف يداري و الهوي يفجأ الحشي و في كل يوم قلبه يتوجع

সে কীভাবে তার আসক্তিকে দমিয়ে রাখবে অথচ প্রেমাসক্তি তার ভিতরকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে এবং দিনদিন তার হৃদয় কষ্টে ফেটে যাচ্ছে।

اذا لم يجد حلا لكتمان عشقهفليس له سوي الموت يقنع

সে যদি তার ইশক লুকিয়ে রাখার মধ্যে কোনো সমাধান না পায় তাহলে মৃত্যু ব্যতীত তার আর কোনো সমাধান নেই।

سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا سلامي لمن قد كان بالوصل يمنع

আমি শুনলাম ও মানলাম অতঃপর মরেই গেলাম। তাকে আমার সালাম পৌছে দিয়ো যে সাক্ষাতে অমত ছিল।

এটা পাথরের কাহিনী, জানি না এটা সত্য না-কি মিথ্যা। তবে মজার ও আশ্চর্যের বিষয় হল আমি দুই বছর পূর্বে একবার শামে গিয়েছিলাম। আমি তখন কয়েকজন সঙ্গীর সাথে একটি রেস্টুরেন্টে গেলাম। রেস্টুরেন্টটি ছিলো শহরের বাইরে একটি বিনোদন-কেন্দ্রে। রেস্টুরেন্টটির পাশে ছিলো একটি পাহাড়। তার উপর একটি বিশাল পাথরের গায়ে লেখা–

قلب حب ভালবাসার হৃদয়।

তখন আমি হোটেলের এক কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলাম। এই পাথরের উপর এটা লেখার কারণ কী? সে বলল, আমরা এই পাথরের নাম রেখেছি প্রেমিরের পাথর। আমি তাকে বললাম, তোমরা এর নাম কেনো প্রেমিকের পাথর রেখেছো? একথা বলে আমি পাহাড়ের উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম পাহাড়টা অনেক উঁচু। এই পাহাড়ে উঠে সেই পাথর পর্যন্ত পৌছা অনেক কষ্টকর ব্যাপার এবং পাথরের উপর সত্যিই খোদাই করে লেখা,

قلب حب ভালবাসার হৃদয়।

আমি তাকে বললাম, এর কারণ কী? সে বললো, এক লোক প্রেমে পড়েছিলো; কিন্তু সে তার প্রেমাস্পদকে পায়নি। তাই সে এই পাহাড়ের উপর এসে নিচে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ কারণে এর নাম হয়েছে ভালবাসার হৃদয়।

জানি না সত্যিই এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিলো কি-না? অথবা এটাও আর দশটা কাহিনীর মত বানানো কোনো কাহিনী; কিন্তু এই ঘটনা উল্লেখ করার মাধ্যমে আমার এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, ইশক ও মুহাব্বত মানুষের হৃদয় নিয়ে খেলা করে। আর এই ইশকের সূচনা হয় দৃষ্টি থেকেই। অর্থাৎ মানুষ প্রথমে কারো প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, অতঃপর তার প্রেমে পড়ে।

আর এ কারণেই আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগন্তুক নারীর দিক থেকে ফজল ইবনে আব্বাসের চেহারা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। একবার হজ্জের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাহনের চড়ে মানুষের হজ্জের বিষয় পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তাঁর পাশে একটি উটের উপর ফজল ইবনে আব্বাস রা. ছিলেন। এমন সময় খুস'মি গোত্রের এক নারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার বাবার উপর হজ্জ ফরজ হয়েছে; কিন্তু তিনি

অতিশয় বৃদ্ধ, বাহনের উপর স্থির থাকতে পারেন না। সুতরাং আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করলে কি তার জন্যে তা আদায় হবে? এই নারীটি ছিলো অত্যন্ত সুন্দরী ও পরিচ্ছন্ন। আর ফজল ইবনে আব্বাস রা. ছিলেন সুদর্শন যুবক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ফজল ইবনে আব্বাস রা.-এর চেহার এই নারীর দিক থেকে ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর পবিত্র হাত ফজল ইবনে আব্বাসের চেহারার উপর রেখে তার চেহারা ঘুরিয়ে দিলেন, যাতে সে এই নারীর দিকে দৃষ্টি দিতে না পারে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করার পর বললেন :

আমি এক যুবক ও যুবতীকে দেখলাম, অতঃপর আমি তাদের উপর শয়তানের ধোঁকার ব্যাপারে নিরাপদ ছিলাম না।

এই ঘটনাটি ছিলো হজ্জের সময়। এটা বর্তমান সময়ের কোনো বাজারে ছিলো না। অথবা ইন্টারনেটে কম্পিউটারের সামনে ছিলো না, যেখানে সে নারীকে যেভাবে খুশি সেভাবে দেখতে পারে। অথবা কোনো মোবাইলের সামনে ছিলো না, যার মাধ্যমে ভিডিও কলে সরাসরি চেহারা দেখে কথা বলা যায়। অথবা এটা কোনো টেলিভিসন চ্যানেলেও ছিলো না, যেখানে নারীর শরীরের আবৃত অংশের চেয়ে অনাবৃত অংশ থাকে বেশি। অথবা এটা কোনো ভার্সিটিও ছিলো না যেখানে নারীরা শরীরের সাথে লাগানো টাইট পোশাক পরে আসে এবং তাদের কেউ কেউ টাইট জামা পরে মাথার উপর স্কার্ফ রেখে ভাবে যে, সে পর্দা করছে!! অথচ তারা পর্দার ধারে কাছেও নেই। বরং তা ছিলো হজ্জের সময়, যখন মানুষ লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলছে তখন এক মহিলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফাতওয়া জানতে এসেছে। আর যুবকটিও ছিলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী। তা সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত মুবারক ফজল ইবনে আব্বাস রা.-এর গালের উপর রাখলেন এবং তাঁর চেহারা ঐ নারীর দিক থেকে ঘুরিয়ে দিলেন। যদিও ফজল ইবনে আব্বাস রা. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ পালনরত অবস্থায় ছিলেন;

Contents

কিন্তু শয়তান তো খুবই ধূর্ত, শয়তান সদা ব্যস্ত, শয়তান আল্লাহ তাআলাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে :

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

'সে বললো, আপনার ইযযতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব।'[১]

শয়তান মানুষকে বিপথগামী করার দায়িত্ব নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা শয়তান সম্পর্কে বলেন;

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝

'এরপর আমি আসবো তাদের সামনের দিক থেকে, পিছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে, এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।'[২]

এমন স্থানে হজ্জের সময় নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজল ইবনে আব্বাস রা.-এর চেহারা ঘুরিয়ে দিলেন, তাঁর মাঝে এবং হারাম দৃষ্টি নিক্ষেপের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়ালেন। এ কারণেই নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোনো নারীর সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের চোখকে অবনত রাখল, আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন ইমান দান করবেন যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে।

হে ভাই তুমি নারীর সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে তোমার চোখকে অবনত রাখ। হোক সেটা ইন্টারনেটে, কম্পিউটারে, মোবাইলে, টেলিভিসন চ্যানেলে অথবা বাজারে বা ভার্সিটিতে, এক কথায় সর্বাবস্থায়

---

১. সুরা ছাদ, আয়াত : ৮২

২. সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭

তুমি নারীর দিকে তাকানো থেকে তোমার দৃষ্টি অবনত রাখ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ○

হে নবি আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্যে সবচেয়ে বড় পবিত্রতা। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা আবহিত আছেন।[১]

হাঁ, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টি অবনত রাখলে, আল্লাহ তাআলা এমন ইমান দান করবেন, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে থাকবে।

সাহিত্যের বইয়ে দাসীর প্রতি এক বেদুইনের আকৃষ্ট হওয়ার একটি গল্প বর্ণিত হয়েছে। মরুভূমিতে তাবু গেড়ে এক বেদুইন থাকত। তার একটি দাসী ছিল, সে তাকে প্রচণ্ড রকমের ভালবাসতো, সর্বদা প্রেমে মত্ত থেকে তার ভালবাসায় ব্যকূল থাকত। বেদুইন লোকটি তার সাথে হাসি-ঠাট্টা করতো, সেও তার সাথে হাসি-ঠাট্টা করতো। একবার তারা হাসাহাসি করছিলো আর আঙ্গুর খাচ্ছিল, হঠাৎ একটি আঙ্গুর দাসীটির শ্বাসনালীতে আটকে গেল আর সে শ্বাস কষ্টে মারা গেল। তখন বেদুইন লোকটি প্রচণ্ড কাঁদতে লাগলো আর দাসীটিকে চুমু খেতে লাগল। তার শরীর ধরে তাকে নাড়াতে লাগলো। অথচ দাসীটি তখন মারা গিয়েছে। সে সাত দিন পর্যন্ত ঘর থেকে বের হয়নি এবং দাসীটির লাশও সেখান থেকে সরিয়ে দাফন করেনি। লাশটি তার সামনেই পড়েছিলো আর সে তাকে ধরে কাঁদছিল। অথচ এই কয়দিনে লাশটি পচে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। সাতদিন পর আশপাশের লোকেরা এসে তাকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, মহিলাটি মারা গিয়েছে, তার সামনে যা আছে এটা মহিলার লাশ, এবং তা এরই মধ্যে বিকৃত হয়ে গেছে; কিন্তু অতি ইশক ও মুহাব্বতের কারণে সে তা টেরই পায়নি। ইশক ও মুহাব্বত এমন বিষয় যখন কোনো মানুষের অন্তরে তা প্রবেশ করে এবং ইবলিস শয়তান এর উপর তাকে

১. সুরা নূর, আয়াত : ৩০

সাহায্য করতে থাকে তখন এটা তার বিবেক নষ্ট করে দেয় এবং তার দীন ও দুনিয়া উভয়টাই ধ্বংস করে দেয়।

অন্য আরেকটি ঘটনা, এক বেদুইন মরুভূমিতে দিনে পশু চড়াতো আর তাবুতে রাত কাটাতো। তার কাছে একটি দাসী ছিলো, যাকে সে প্রচণ্ড ভালবাসতো। সে সর্বদা তার চিন্তায় ব্যস্ত থাকত। একদিন সে দেখলো তার এক গোলাম দাসীটির দিকে তাকিয়ে আছে। ফলে বেদুইন লোকটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একটি বর্শা দিয়ে আঘাত করে দাসীটিকে হত্যা করে দিল। এরপর সে তার মাথার নিকটে বসে কাঁদতে লাগল।

ভাই লক্ষ করে দেখো, লোকটি কীভাবে ভালবাসার কারণে এক নারীকে হত্যা করে ফেলল। আর বর্তমানে অধিক ভালবাসা বা আগ্রহের কারণে একজন অপর জনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বর্তমানে শুধু যে, সুন্দরী নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়ার কারণে অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে তা নয়; বরং অনেকে শ্মশ্রুহীন সুশ্রী-সুদর্শন বালকের দিকে কুদৃষ্টি দেওয়ার কারণেও অনেক অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। আমি জেলের ভিতর নিজ চোখে দেখেছি, এইধরনের অবৈধ ইশকের কারণে বিভিন্ন জন জেলে শাস্তি ভোগ করছে। যেমন কারো এক বছরের, কারো দুই বছর কারো তিন বছর আবার কারো এর চেয়েও বেশি সময় জেলে বন্দি থাকার শাস্তি হয়েছে। আবার কারো কারো মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, কারণ সে তার মতই কোনো যুবকের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়েছে, কেউ আবার কোনো সুশ্রী বালককে অপহরণ করে তার সাথে অবৈধ-অনৈতিক কাজ করেছে, অতঃপর সে গ্রেফতার হয়েছে। (আল্লাহর পানাহ) আবার কেউ অপহরণ করার পর অনৈতিক কাজ করে তাকে হত্যাও পর্যন্ত করেছে, অতঃপর সে গ্রেফতার হয়েছে। সে এমন একটা জঘন্য কাজ কেনো করল? কারণ সে তার প্রতি কুদৃষ্টি দিয়েছে, অতঃপর তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। সে যদি আল্লাহকে ভয় করে তার প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকত এবং তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় গ্রহণ করতো তাহলে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই নিরাপদ থাকত; কিন্তু.....!!

আমি এমন যুবককেও দেখেছি যে কোনো এক যুবতীর সাথে অবৈধ প্রেমে জড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর তাকে ফুসলিয়ে বাইরে নিয়ে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে। এরপর মেয়েটির পেটে তার সন্তান ধারণ করেছে। অতঃপর উভয় জনকে গ্রেপ্তার করে জেলে বন্দি করা হয়েছে আর ঐ সন্তানকে জারজ সন্তান হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা অবৈধভাবে মিলিত হওয়ার কারণে তাদের এই সন্তান জন্ম নিয়েছে। এই যে, এতসব ঘটনা ঘটে, এর কারণ কী? এর মূল কারণ হল প্রথমে কুদৃষ্টি। তারপর অবৈধ সম্পর্ক তারপর........!!

পূর্বে প্রেমিক-প্রেমাস্পদের সম্পর্ক থাকত তাকানো, দেখা আর কথা বলার মাঝে সীমাবদ্ধ; কিন্তু বর্তমানে অবস্থাটা অনেক গুরুতর আকার ধারণ করেছে। বাহজাতুল মাজালিস নামক কিতাবে আন্দালুসি বলেন, পূর্বের প্রেমিক-প্রেমাস্পদের অবস্থা ছিলো দেখা করা আর কথা বলার মাঝে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ বলা যায় পূর্বের প্রেম ছিলো পবিত্র প্রেম। এমনকি আনতারা, আবলারাও মেয়েকে ঘর থেকে বের করে হোটেলে নিয়ে যায়নি। বরং তারা ছিলো প্রেমিক, যদিও তাদের প্রেম ছিলো শরিয়ত-বিরুদ্ধ কাজ; কিন্তু তা ছিলো পরিচ্ছন-নির্মল প্রেম। তারা যার নাম দিয়েছিলো নিষ্কাম প্রেম বা পবিত্র ভালবাসা। প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে আর প্রেমিকা প্রেমিককে নিয়ে কবিতা রচনা করতো। বাহজাতুল মাজালিস কিতাকে উল্লেখ আছে, পূর্বে প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেম ছিলো তাকানো আর কথা বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর বর্তমানের প্রেম হল স্পর্শ করা, চুম্বন করা আর তারপর.......!! তারপর.......!!অর্থাৎ বর্তমানের প্রেম হল অশ্লীলতা আর নোংরামি। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযতকরুন। বর্তমানে মোবাইলে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে, ফেসবুক টুইটারও অন্যান্য সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে তারা যোগাযোগ রক্ষাকরে, ছবি আদান-প্রদান করে প্রেমিক প্রেমিকারা তাদের সম্পর্ক বজায় রাখে।......

পূর্বেও শয়তান ছিলো এবং সে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করতো; কিন্তু তখন মানুষকে ধোঁকা দেওয়া, পথভ্রষ্ট করা অত সহজ ছিলনা। তখন ছেলে মেয়েদের বিপথে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। তারা চাইলেই কোনো ভ্রষ্টপথে যেতে পারতো না,

Contents

কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারতো না, কারণ তার পরিবার সর্বদা তাকে পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখতো। তার সকল গতিবিধি তারা লক্ষ করতো। তখন তাদের হাতে মোবাইল ছিলো না, ইন্টারনেট ছিলো না যে, যখন তখন বাড়ির বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ করবে, বাড়ির নির্জনতার সুযোগে বাইরের কাউকে বাড়িতে নিয়ে আসবে; কিন্তু বর্তমানে ছেলেদের হাতে, মেয়েদের হাতে মোবাইল রয়েছে, কারো কাছে দুইটা-তিনটা পর্যন্ত মোবাইল থাকে। এর মাধ্যমে খুব সহজেই তারা কারো সাথে খারাপ সম্পর্ক করতে পারে এবং তা স্থায়ীও রাখতে পারে। অতঃপর সামান্য সুযোগে দেখা-সক্ষাতও করতে পারে।

ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ ইউসুফ আ.-এর সাথে আযিযে মিসররের স্ত্রীর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, সুবহানাল্লাহ! যখন মহিলাটি তাঁকে কুপ্রস্তাব দিল তখন কীভাবে তিনি নিজেকে রক্ষা করলেন? মহিলাটি তাঁকে বলল, এসো আমরা খারাপ কাজে লিপ্ত হই; কিন্তু তিনি বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই। তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি আমাকে উত্তম আশ্রয়স্থল দান করবেন। অতঃপর তিনি তার সামনে থেকে পিছন দিকে দৌড় দিলেন আর মহিলাটি পেছন থেকে তাঁর জামা টেনে ছিড়ে ফেলল। তিনি পলায়ন করতে সক্ষম হলেন। অতঃপর নিজেকে অশ্লীল কাজ থেকে বাঁচাতে গিয়ে কয়েক বছর জেলে বন্দি রইলেন। ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ এই ঘটনা উল্লেখের পর বলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যের সর্বোচ্চ প্রকার প্রকাশ পেয়েছে। আনুগত্য শুধু দুই রাকাত সালাত আদায় করা, নফল সিয়াম পালন করার নাম নয়; বরং আল্লাহর ভয়ে তাঁর নাফরমানির কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করাও আল্লাহ তাআলার আনগত্যের বিশেষ অংশ। বরং নির্জন মুহূর্তে যেখানে গুনাহের সুযোগ ও উপকরণ উভয়টাই থাকে তখন আল্লাহর ভয়ে নিজেকে গুনাহ থেকে রক্ষা করা হল আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সর্বোচ্চ প্রকার। মানুষ যখন শক্তভাবে ইসলামকে আঁকড়ে ধরবে এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে ও নযরের হেফাযত করবে তখন তাঁর ইমান বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সে আল্লাহর ইচ্ছায় গুনাহের কাজে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ○

'হে নবি! আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্যে সবচেয়ে বড় পবিত্রতা। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা আবহিত আছেন।'[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন;

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: 'ইমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে।'[২]

দ্বিতীয় বিষয়টি হল প্রতিটি মানুষকেই ফিতনার স্থান এড়িয়ে চলতে হবে। যে বাজারে, যে মার্কেটে বেপর্দা নারীদের বেশি আনাগোনা, তুমি সে বাজার বা মার্কেটে না গিয়ে অন্য বাজার বা মার্কেটে যাও যেখানে নারীদের যাতায়াত কম। যে কলেজ বা ভার্সিটিতে মেয়ের সংখ্যা বেশি বা মেয়ের ফেতনা বেশি তুমি সেই কলেজ ভার্সিটি ত্যাগ করে অন্য কলেজে ভর্তি হও, যেখানে মেয়েদের ফেতনা কম। তোমার যে বন্ধু তোমাকে খারাপ কাজের দিকে নিতে চায় তাদের বন্ধুত্ব ত্যাগ করে ভাল ও ভদ্র ছেলেদের বন্ধুত্ব গ্রহণ করো। তোমার যে বান্ধবী তোমাকে খারাপ কাজের দিকে নিতে চায়, পর্দাহীনতার দিকে নিতে চায়, তাদের বন্ধুত্ব ত্যাগ করে ভাল ও পর্দাশীল মেয়েদের বান্ধবী হিসেবে গ্রহণ করো। যারা ধ্বংসের পথে গিয়েছে তাদের প্রতি লক্ষ না করে, তাদের পথে না গিয়ে বরং যারা ভাল তারা কীভাবে ভাল হল সেই দিকে লক্ষ করো এবং তাদের পথ অবলম্বন করো।

---

১. সুরা নূর, আয়াত : ৩০

২. সুরা নূর, আয়াত : ৩১

আল্লাহর তাআলার আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে পূর্ণ কল্যাণ দান করুন। এবং আমাদের প্রত্যেককে গোপন ও প্রকাশ্য সকল ফেতনা থেকে হেফযত করুন। আমিন।

গাধা-চালক থেকে খলিফা

পৃথিবীতে মানুষ বিচিত্র ধরনের স্বপ্ন দেখে। মানুষের স্বপ্ন যেমন হয় বিভিন্ন ধরনের এবং তা বাস্তবায়নের পন্থাও হয় একেক জনের একেক রকম। একেক জন তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে একেক ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিছু মানুষ আছে যারা স্বপ্ন দেখে কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে না নেয় কোনো উদ্যোগ কিংবা কোনো পরিকল্পনা। সুতরাং তারা শুধু স্বপ্নই দেখে, তাদের স্বপ্ন কখনো পূর্ণ হয় না; বাস্তবতার মুখ দেখে না। সুতরাং আমাদের এই লেখা তাদের জন্যে নয়। বরং আমাদের এই লেখা তাদের জন্যে যারা স্বপ্ন দেখে এবং তা বাস্তবায়নেরও ইচ্ছা রাখে।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَ لَاۤ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَ لَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا ۝

‘তোমাদের আশার উপর কোনো ভিত্তি নেই এবং নেই আহলে কিতাবেবর আশার উপর কোনো ভিত্তি। যে মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোনো সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবে না।’[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতে বলেন, কাফের-মুশরিকরা শুধু স্বপ্ন আর আশা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, কারণ জান্নাত স্বপ্ন আর আশা দিয়ে পাওয়া যায় না। জান্নাত পেতে হলে ইমান

---

১. সুরা নিসা, আয়াত : ১২৩

ও আমল উভয়টাই লাগবে। যারা খারাপ আমল করবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। একটি প্রবাদ আছে, শুধু স্বপ্ন ও আশা মানুষকে সম্মানিত করতে পারে না, শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না এবং শিকারী শিকার ধরতে পারে না। মানুষ উড়ন্ত পাখির দিকে তাকিয়ে যতই কল্পনা করুক না কেনো সেটা কখনই তার সামনে ভুনা হয়ে আসবে না। কেউ যদি একটা সুন্দর বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভাবে, সে এমন একটা বাড়িতে রাত কাটাবে, অতঃপর এর জন্যে কোনো পরিশ্রম না করে এবং কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ না করে তাহলে এমন বাড়ি সে শুধু কল্পনাতেই দেখতে পাবে; বাস্তবে কখনো এমন বাড়িতে থাকা হবে না।

সুতরাং যারা তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে কষ্ট পরিশ্রম করে এবং এর জন্যে ঝুঁকি নেয়, তারাই তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সফল হয় এবং তাদের স্বপ্নই বাস্তবতার মুখ দেখে। এখন এ বিষয়ে একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করবো।

এক গাধা-চালক গাধা চালিয়ে তার উপর মানুষ ও মানুষের পণ্য বহন করতো। নিজের ও পরিবারের জন্যে উপার্জন করতো; কিন্তু তার স্বপ্ন ছিলো অনেক বড়; তার স্বপ্ন ছিলো দেশের খলিফা হওয়া, দেশের শাসক হওয়া। লোকটি শুধুমাত্র স্বপ্ন দেখেই বসে থাকেনি বরং সে তার স্বপ্ন বাস্তবয়নের জন্যে সঠিক পরিকল্পন গ্রহণ করেছে, অতঃপর সে অনুযায়ী কঠোর পরিশ্রমও করেছে, ফলে সে একদিন তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছে। সে একদিন সাধারণ গাধা-চালক থেকে জনগণের চালক তথা শাসকের রূপান্তরিত।

অনেক দিন আগের কথা, যখন স্পেন শাসন করতো মুসলিম শাসকগণ। তখন স্পেনে মুহাম্মদ ইবনে আবু আমের নামের এক লোক ছিলো। সে ছিলো গাধা-চালক। গাধা চালিয়েই নিজের ও পরিবারের খরচ উপার্জন করতো।আবু আমেরের দুই জন বন্ধু ছিলো, তাদেরও একটি করে গাধা ছিলো এবং তারাও ছিলো গাধা-চালক। সারা দিন গাধা চালিয়ে, তাতে মানুষ ও মানুষের পণ্য বহন করে ক্লান্ত হয়ে তিন বন্ধু একত্রে একটি ঘরে ঘুমাতে আসতো। তারা একই বাড়িতে থাকত এবং একসাথে খাবার খেতো ও রাতে ঘুমাতো।

Contents

একদিন রাতে বাসায় ফিরে সকলে খাবার খেতে বসলো এবং গল্পগুজবে মেতে উঠলো, গল্পের এক ফাঁকে মুহাম্মদ ইবনে আবু আমের তার অপর দুই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী: তোমরা ভবিষ্যতে কী হতে চাও?। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমরা কী স্বপ্ন দেখো? তখন তাদের একজন বললো, আমি চাই আমার পাঁচটি গাধা হবে এবং আমি সবগুলো ভারা দিয়ে অরো অনেক বেশি ইনকাম করতে পারবো এবং এখনকার চেয়ে আরো অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে পারবো। অপর জন বললো, আমার গাধা চালাতে ভাল লাগে না, আমি চাই গাধা চালানো বাদ দিয়েএই বাজারে একটি দোকান নিয়ে দোকান চালাবো। অতঃপর সাথীরা আবু আমেরকে জিজ্ঞেস করলো তোমার স্বপ্ন কী, তুমি ভবিষ্যতে কী হতে চাও? মুহাম্মদ ইবনে আবু আমের তখন বললো, আমি ভবিষ্যতে খলিফা হতে চায়। একথা শুনে তার সাথীরা বললো, কী...'??একটি গাধা ব্যতীত তো তোমার কাছে আর কিছুই নেই। এই গাধাটিই তো তোমার দুনিয়া। আর তুমি কি-না খলিফা হতে চাও?? সে বললো, হাঁ আমি খলিফা হতে চাই। আমি ভবিষ্যতে খলিফা হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এরপর লোকটি তার বন্ধুদের বললো, আচ্ছা আমি যদি খলিফা হই তাহলে তোমরা আমার কাছে কী চাইবে? অর্থাৎ আমি কী দিলে তোমরা খুশি হবে? তখন তাদের একজন বললো, আমি চাই তুমি আমাকে থাকার জন্যে একটি প্রসাদ দিবে। লোকটি তাকে বললো, আর কী চাও? সে বললো, প্রাসাদের সাথে একটি বাগান। লোকটি বললো, আরো কিছু কী লাগবে? লোকটি বললো, আমার চারটা স্ত্রী থাকবে। এরপর আবু আমের অপর সাথীকে প্রশ্ন করলো, আমি খলিফা হলে তুমি আমার কাছে কী চাইবে? সে বললো, আমি চাই তুমি খলিফা হলে আমাকে একটি গাধার উপর উল্টো করে বসিয়ে বাজারে ঘুরাবে আর বলবে এই লোকটি বড় মিথ্যাবাদী এবং সবচেয়ে বড় দাজ্জাল। সে তাকে বললো, অন্য কিছু কি চাও? সে বললো, আমাকে গাধার পিঠে ঘুরানোর সময় আমার মুখে কালিও মেখে নিবে। এরপর তারা সকলে বিছানায় যার যার মত ঘুমিয়ে পড়লো।

মানুষ কোনো স্বপ্ন দেখলে তাকে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে পরিকল্পনা করতে হয় এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সামনে অগ্রসর হতে হয়,

কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। লোকটিও ভাবতে লাগলো তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে তাকে কী করতে হবে তা নিয়ে। সে কি এই গাধা নিয়েই বসে থাকবে? না-কি খলিফা হতে হলে তাকে অন্য কোনো পথে হাঁটতে হবে,যে পথে হাঁটলে সে খলিফা হতে পারবে? হোকনা তা আজ থেকে দশ বছর, বিশ বছর বা ত্রিশ বছর পরে, কারণ মানুষ তো প্রতিটি বড় কাজ ছোট থেকেই শুরু করে, হাজার মাইল দূরের গন্তব্যও তো এক পা দুই পা করেই সামনে এগুতে হয়। এই যে, আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর উপর ওহি নাযিল হয়েছে, তাও তো অল্প একটু তথা 'ইকরা'-এর মাধ্যমেই শুরু হয়েছে। সুতরাং তুমি কোনো কিছুকেই ছোট মনে করো না। তুমি তোমার গন্তব্যে পৌছার পদক্ষেপ শুরু করে দাও আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন। সুতরাং আবু আমের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, সে গাধাটা বিক্রি করে দিয়ে পুলিশে ভর্তি হবে এবং নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে খলিফার দেহরক্ষী বা কাছের কেউ হবে। সুতরাং আপাতত লক্ষ্যে পৌছার জন্যে তার প্রথম পদক্ষেপ এটাই হবে।

পরদিন সকালে সে তার গাধাটা বিক্রি করে দিল। তখন তার সাথীরা তাকে বললো, আরে তুমি গাধাটা বিক্রি করে দিলে? এখন খাবে কি? কীভাবে দিন কাটাবে? তুমি তো ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যাবে!! তখন সে বললো, আমার টার্গেট অনেক বড়, আমাকে এখানে গাধা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌছতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমাকে সঠিক পদক্ষেপে সামনে এগুতে হবে। সুতরাং সে চাইলো পুলিশে ভর্তি হবে। তাই বাজারে গিয়ে পুলিশের পোশাক এবং অস্ত্র ক্রয় করলো এবং পুলিশে ভর্তি হয়ে গেল। এরপর মেধা-দক্ষতা ও কাজের প্রতি নিষ্ঠার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পুলিশে তার পদোন্নতি হতে থাকলো এবং উপরে উঠতে উঠতে একসময় সে খলিফার বিশেষ লোকে পরিণত হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পর খলিফার ইন্তেকাল হল। খলিফার ইন্তেকালের পর তার দশ বছরের ছেলে খেলাফতের দায়িত্ব পেল। তখন তার মা তথা পূর্বের খলিফার স্ত্রী তার পরামর্শক হিসেবে মুহাম্মাদ ইবনে আবু আমেরসহ

আরো দুই জনকে নিযুক্ত করল। অপর দুই জন হচ্ছে, ইবনে আবু গালেব এবং ইবনে তুমাইহি। খলিফার মা তাদের তিন জনকে বললো, তোমরা তিনজন আমার ছেলেকে পরামর্শ দিয়ে খেলাফত পরিচালনার কাজে সাহায্য করবে। এরপর আবু আমের, ইবনে তুমাইহির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলো এবং এক পর্যায়ে খলিফার মা ইবনে তুমাইহিকে এই বলে সরিয়ে দিলো যে, তুমি আমার ছেলেকে পরামর্শ দেওয়ার যোগ্য নও। এখন তার লক্ষ্যে পৌছার রাস্তা আরো পরিস্কার হল; কিন্তু এখনো মূল লক্ষ্যে পৌছার অনেক পথ বাকি। এখনো আবু গালিব তার পথের বাধা, তাই সে আবু গালিবের মেয়ের সাথে নিজ ছেলেকে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিল। আবু গালিবের মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ের পর আবু গালিবকেও সে তার কথামতো চালাতে শুরু করলো। অন্য দিকে খলিফার বয়স মাত্র দশ বছর সুতরাং খেলাফতের ক্ষেত্রে এখন ইবনে আমেরর কথাই একক ভাবে কার্যকর হতে শুরু করলো।

বর্ণিত আছে বালক ছেলেটি তার কামরা থেকে খুব একটা বের হতো না এবং সে তার খেলাফতের সিংহাসনে বসতো না। আর ইবনে আমেরের অনুমতি ব্যতীত কেউ তার সাথে দেখাও করতে পারতো না। সুতরাং উজির-নাজির ও মন্ত্রীরা শুধু মাত্র আবু আমেরের সাথেই পরামর্শ করার সুযোগ পেত এবং তারা তার আদেশে চলতো। সুতরাং উজির-নাজির ও মন্ত্রীরা, অন্যান্য লোকেরা আবু আমেরের সন্তুষ্টি অর্জন করে চলতে শুরু করলো। আবু আমেরের এই পর্যন্ত পৌছাটা একদিনে বা একরাতে হয়ে যায়নি বরং তার এই পর্যন্ত পৌছতে দীর্ঘ বিশ বছর লেগেছে। এভাবে আরো কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একটা সময় সে নিজেই প্রকৃত খলিফা হয়ে গেল। একারণেই স্পেনের খলিফাদের নামের পরিবর্তে তার নামের দিকে নিসবত করে তার শাসন কালকে ‘আদ্দাওলাতুল আমেরিয়্যা’ নাম করণ করা হয়।

শুরুর সেই অবস্থান থেকে তিরিশ বছর পর সে যখন এই অবস্থানে পৌছে তখন তার সেই গাধা-চালক দুই বন্ধুর কথা মনে পড়ে যায়। সুতরাং সে এক লোককে ডেকে বলে, যাও অমুক বাজারে গিয়ে এই এই নামের দুইলোককে খোঁজ করে আমার কাছে নিয়ে এসো।

অতঃপর লোকটি উক্ত বাজারে গেল এবং খলিফার বলে দেওয়া লোক দুটিকে খুঁজে বের করলো। তারা তখনও তাদের আগের অবস্থাতেই ছিলো অর্থাৎ তারা তখনও সেই গাধা-চালকই ছিল, তাদের অবস্থার কোনোই উন্নতি হয়নি। সে তাদেরকে বাদশার নিকট নিয়ে এলো। তারা যখন বাদশাহর সামনে দাঁড়াল, বাদশাহ তাদের জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি আমাকে চিনতে পেরেছো? তারা বললো, হাঁ আমরা আপনাকে চিনতে পেরেছি এবং আমরা আপনার ব্যাপারে আগেই শুনতে পেরেছিলাম; কিন্তু আমরা সাধারণ গাধা-চালক হয়ে আপনার সাথে দেখা করি কীভাবে? বাদশাহ তখন তাদেরকে বললো, তোমাদের কি মনে আছে সেই রাতের কথা যে রাতে আমরা আমাদের স্বপ্নের কথা বলেছিলাম এবং আমি খলিফা হলে তোমরা আমার কাছে কী চাইবে? তারা বললো, হাঁ আমাদের মনে আছে। তখন সে তাদের একজনকে উদ্দেশ্য করে বললো, তুমি তখন কি কামনা করেছিলে? সে বললো, বাগানসহ একটি বাড়ি এবং চারজন নারী বিয়ে করার বিষয়। বাদশাহ তাকে বললো, এই নাও তোমার বাড়ি, এই যে বাগান এবং এই নাও তোমর চারজন মেয়েকে বিয়ের মহরের টাকা। এরপর সে বললো, তুমি যদি এর চেয়েও বেশি কিছু চাইতে তাহলে আমি তোমাকে তা দিতাম। অতঃপর সে অপর জনের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার আশা যেনো কি ছিল? তখন সে বলল, হে খলিফা আমাকে ক্ষমা করে দিন। বাদশাহ বললো, তোমার চাহিদাটা ছিলো কী সেটা আগে বল। সে বলল, আপনি খলিফা হলে আমাকে উল্টো করে গাধার পিছনে চড়িয়ে চেহারায় কালি মাখিয়ে পুরো শহর ঘুরাবেন আর বলবেন এ হল সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী এবং সবচেয়ে বড় দাজ্জাল। তখন একজনকে আদেশ দিয়ে তার আশা বাস্তবায়ন করানো হল।

প্রিয় পাঠক! এই ঘটনাটা সত্য হোক বা মিথ্যে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না, তবে এটা সত্য হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি, কারণ এই ঘটনাটি ইতিহাসের কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে; কিন্তু এখানে আমাদের এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, মানুষের হিম্মত ও কঠোর পরিশ্রম তাকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছে দেয়, লক্ষ্যটা যত বড়ই হোকনা কেনো। সঠিক পন্থায় পরিশ্রম ও দৃঢ় সঙ্কল্প থাকলে সে একদিন তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে

পৌঁছবেই। বান্দা আল্লাহ তাআলার সাথে যেমন ধারণা করে আল্লাহ তাআলাও তাকে সে অনুযায়ী ফলাফল দিয়ে থাকেন। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ বলেন :

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আমার সাথে বান্দা যে ধারণা করে, আমি তাকে সে অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে থাকি।'

অর্থাৎ, বান্দা আমার সাথে যে ধারণা করে, আমি তাকে সে অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে থাকি। সুতরাং বান্দার উচিত তার রবের কাছে ভাল ধারণা করবে এবং ভাল জিনিস চাইবে, তার কাছে মাগফিরাত চাইবে, পরীক্ষার সফলতা চাইবে, ঋণ মুক্তি চাইবে। তোমার রাবের কাছে কখনো খারাপ ধারণা করো না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا

'তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমারা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়।'[১]

সুতরাং মানুষ কীভাবে আল্লাহ তাআলার সাথে ভাল ধারণা করবে? এবং সে কীভাবে তার ধারণাকে বাস্তবায়ন করবে? এবং কীভাবে সে তার স্বপ্নের চূড়ায় পৌঁছবে? বিষয়টি নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করবো।

যে ব্যক্তি তার স্বপ্নের চূড়ায় পৌঁছতে চায় অবশ্যই এর জন্যে তাকে সর্বপ্রথম সুন্দর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তার স্বপ্ন-বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে। সাথে সাথে তাকে আরেকটি কাজ করতে হবে, তাহল তাকে এমন মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে যারা তাকে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করবে। যে বলে আরে তোমার দ্বারা এমন কাজ করা সম্ভব না, তুমি এটা ছেড়ে বরং অন্য কাজ শুরু কর ইত্যাদি ইত্যাদি... বিভিন্ন নিরুৎসাহিতকরণমূলক কথা। বরং তোমাকে এমন বন্ধু গ্রহণ করতে হবে যারা তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তোমাকে উৎসাহিত করবে, কখনো তোমাকেহীনবল হতে দিবে না। এ বিষয়ে এখানে আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

---

১. সুরা আল আরাফ, আয়াত : ১২

Contents

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ইন্তেকাল হল তখন তিনি ছিলেন বালক। রাসুলের ইন্তেকালের পর তিনি অপর এক আনসারি বালককে বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো ইন্তেকাল হয়ে গেছে, এখন তো আর আমরা তাঁর কাছে থেকে ইলম শিখতে পারবো না। সুতরাং এসো আমরা তাঁর যেসকল সাহাবি এখনও জীবিত আছেন তাঁদের থেকে ইলম অর্জন করি। ছেলেটি তখন তাঁকে বললো, আমরা ইলম শিখবো ভাল কথা। ধরো তুমি ইলম শিখলে, আলেম হলে এখন কি তুমি রাসুলের বড় বড় সাহাবি যাঁরা এখনো জীবিত তাঁদের কাতারে যেতে পারবে? মানুষ কি আবু বকর, উমর রা.-এর মত বড় বড় অলেমদের রেখে তোমার কাছে এসে ইলমের জন্যে ভিড় করবে? এর চেয়ে ভাল পছন্দ মত কোনো একটা কাজ শিখে সেই কাজে লেগে যাও। লক্ষ করুন মানুষের চিন্তার ফারাক কতটুকু!! অনেক মানুষ তো এমন আছে যাদের চিন্তা-চেতনা এর চেয়েও নিম্নমানের।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ছেলেটি যখন এমন কথা বললো, তখন আমি তার থেকে দূরে সরে আসি এবং ইলম অর্জন শুরু করি। অন্য দিকে ছেলেটিও তার কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, সে কামারের কাজ শিখে এবং ধীরে ধীরে সে কাজে দক্ষ হতে থাকে, সে কামারের হাফরের পাশে বসে তার আগুনের তাপ নিতে থাকে এবং তার দুর্গন্ধকে সুঘ্রাণ মনে করতে থাকে। অন্যদিকে ইবনে আব্বাস রা. ইলম অর্জনের জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শুনার জন্যে তার এক সাহাবির বাড়িতে আসলাম, তখন তার দরজা বন্ধ ছিলো আমি দরজায় টোকা দিয়ে দেখলাম তিনি ঘুমাচ্ছেন, আমি আর দরজায় টোকা দিলাম না, কারণ এতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে এবং তাঁর মেজায নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাহলে তিনি এমন আবস্থায় হাদিস বর্ণনা করবেন যখন তার মন ভাল থাকবে না। অন্যদিকে আমি যদি এখান থেকে চলে যাই তাহলে হয়তো তিনি ঘুম থেকে উঠে অন্য কোথাও চলে যাবেন। তখন আমি তাঁর কাছ থেকে

ইলম শিখতে পারবো না। তাই আমি তাঁর দরজার সামনেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আর বাতাসে বালু এসে আমার চেহারা ও কাপড় ভরে দিল। তিনি যখন ঘুম থেকে উঠে দরজা খোললেন তখন তিনি দেখেন আমার চেহারা ও কাপড়ের উপর ধূলো-বালি পড়ে আছে। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আল্লাহ রাসুলের চাচাত ভাই! আমাকে কেনো ঘুম থেকে জাগ্রত করলে না? আমি তখন তাঁকে বললাম, কারণ আমি চাচ্ছিলাম যে, আপনি ফুরফুরে মেজাজের থাকুন আর আমি আপনার কাছ থেকে ইলম অর্জন করি। এরপর তিনি আমাকে হাদিস বর্ণনা করে শুনান।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন আমি একবার যায়েদ ইবনে সাবেত রা.-এর সাথে ছিলাম।(আর যায়েদ ইবনে সাবেত রা. ছিলেন ইলমুল মিরাস (উত্তরাধিকার জ্ঞান) সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আলেম সাহাবি।) ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি তাঁর উটের লাগাম ধরে তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেন, এটা ছেড়ে দাও। আমি তখন বললাম, এভাবেই উলামায়ে কেরামের সম্মানের ব্যাপারে আমাদের আদেশ করা হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার হাতটা আমার কাছে একটু দাও। (ইবনে আব্বাস রা. তখন ছিলেন ছোট বালক) তিনি বলেন, তখন তিনি আমার হাত ধরেন এবং তাতে চুমু খান এবং বলেন নবি-পরিবারের লোকদের সাথে এভাবে আচরণ করার জন্যে আমাদের আদেশ করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ!!

হে ভাই! এর ফলাফল কীহল? ইবনে আব্বাস রা. তাঁর স্বাপ্নের কোন চূড়ায় পৌছলেন? আজকের এই বার্তা শুধুমাত্র তাদের জন্যে যারা তাদের জীবনে সফল হতে চায়, যারা তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে চায় এবং যারা তাদের আকাঙ্ক্ষার চূড়ায় আরোহণ করতে চায়। হোক সেটা ইলমের চূড়ায় আরোহণ অথবা কুরআনে কারিম হিফযের ক্ষেত্রে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অথবা লেখালেখি ও বয়ান-বক্তৃতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহনের আকাঙ্ক্ষা। ভাই! যদি এমন করতাম তাহলে এমন হতে পারতাম!! এমন পরিতাপ কোনো কাজে আসাবে না। যৌবন চলে যাওয়ার পর এমন

আফসোস কি কোনো কাজে আসবে যে, হায় যদি যৌবন বিক্রি হতো তাহলে ক্রয় করতাম!!! না ভাই 'যদি' কোনো কাজে আসবে না বরং চূরান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে লাগবে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কঠিন পরিশ্রম-সাধনা এবং আল্লাহ তাআলার সাহায্য।

হে ভাই! ইবনে আব্বাস রা. যে চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন সে বিষয়ে বলছি। মনোযোগ দিয়ে শুনো। ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'সিরারু আ'লামিন নুবালা' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, ইবনে আব্বাস রা.-এর এক শিষ্য আবু সালেহ, তিনি বর্ণনা করেন, একবার হজ্জের সময় আমি ইবনে আব্বাস রা.-এর এমন এক দৃশ্য দেখলাম, সেই দৃশ্য যদি কোনো ইহুদি খৃস্টান ও বর্বর জাতি দেখতো তাহলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিতো। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হল আপনি কী দৃশ্য দেখেছেন? তিনি বলেন, একবার হজ্জের সময় মানুষ তাওয়াফ করছিলো এবং তালবিয়া পড়ছিলো, এমন সময় ইবনে আব্বাস রা. দাঁড়িয়ে খুৎবা দিলেন এবং তিনি তাঁর খুৎবায় সুরা বাকারার তাফসির করলেন, তিনি একের পর এক আয়াত পড়ছিলেন এবং তাঁর তাফসির করছিলেন আর মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর বয়ান শুনছিল। আমি আসলে ভেবে পাচ্ছিলাম না যে, আমি কোন বিষয়টি নিয়ে আশ্চর্য হচ্ছি, আমি কি তাঁর এত সুন্দর কুরআন মুখস্তের বিষয়টি নিয়ে আশ্চর্য হচ্ছি? না-কি তাঁর তাফসিরের জ্ঞান দেখে আশ্চর্য হচ্ছি? তিনি তাফসির করছিলেন আর মানুষ তাঁর তাফসির শুনছিলো, তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁর বয়ান পুরোটা শুনলো আর কেউ কিছুক্ষণ শুনে চলে যাচ্ছিল।

তার ব্যাপারে তার এক সাথী বলেন, আমি একবার ইবনে আব্বাস রা.-এর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম; কিন্তু পথে এসে দেখলাম মানুষের ভিড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে, সামনে এগুনো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। আমি কোনো মতে ভিড় ঠেলে তাঁর বাড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। আমি যখন ভিড় ঠেলছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল যেনো পুরো মদিনা মানুষের ভিরে ভরে আছে। আমি মানুষের ভিড় ঠেলে তার বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেখি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ, আমি দরজায় আঘাত করলাম এবং ভিতর থেকে দরজা খোলা হলে আর আমি ভিতর

গেলাম এবং তাঁকে বললাম, ইবনে আব্বাস! এরা কারা! তোমার বাড়ির সামনে এত মানুষ ভিড় করেছে কেনো? তখন তিনি বললেন এরা সকলে তালেবুল ইলম। এরা দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে এখানে ইলম শিখার জন্যে একত্র হয়েছে। এদের কেউ ইরাক, কেউ শাম, কেউ মিসর থেকে এসেছে। এরা আমার কাছে ইলম জিজ্ঞেস করার জন্যে এসেছে। তখন লোকটি বলল, সুবহানাল্লাহ! তাঁদের কাছে যাও, রোদে তো তাঁরা পুড়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, হাঁ আমি এখনই বের হবো।

এরপর ইবনে আব্বাস রা. ওযু করলেন এবং ঘর থেকে বের হয়ে বাড়ির উঠানে বসে খাদেমকে বললেন, যাও বাইরে গিয়ে বল, যারা কুরআন ও তাফসির সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চায় তাঁরা যেনো ভিতরে প্রবেশ করে। অতঃপর তিনি তাফসির করতে লাগলেন এবং বিভিন্ন জনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন, একজন তাঁকে সুরা বাকারা থেকে প্রশ্ন করছে, অপরজন সুরা আলে ইমরান, অপরজন সুরা মাইদা থেকে, কেউ কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করছে, কেউ আবার শানে নুযুল, কেউ আবার কোনো আয়াতের অর্থ এভাবে সকলের উত্তর দেওয়ার পর তিনি বললেন তোমরা তোমাদের অন্য ভাইদের আসার সুযোগ দাও, তোমরা এখন চলে যাও। এরপর খাদেম বাহিরে গিয়ে হাদিসের ছাত্রদের ডাকলেন, তাঁরা আসলো এবং ইলম অর্জন করে চলে গেল। তারপর ফিকহ ও আহকামুল ইসলামের ছাত্রদের ডাকলেন তাঁরা আসলো, এভাবে সকল বিষয়ের ছাত্র একের পর এক আসলো এবং তাঁকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, আল্লাহর কসম করে বলছি যে, তাঁকে এমন কোনো প্রশ্ন করা হয় নি যার উত্তরে তিনি বলেছেন যে, আমি জানি না। তাফসির, হাদিস, ফিকহ , ইতিহাস, কবিতা সব বিষয়েই তিনি উত্তর দিচ্ছিলেন। কুরাইশরা যদি তাঁর এই একটা মসলিস নিয়ে গর্ভ করতে চায় তাহলে তারা সারা জীবন গর্ভ করতে পারবে।

এদিকে ইবনে আব্বাস রা.-এর প্রথম সাথী অর্থাৎ যাকে নিয়ে সে ইলম অর্জনের সফরে বের হতে চেয়েছিলেন, সে এরই মধ্যে অনেক বড় কামার হয়েছে। একদিন পথের মধ্যে দুইজনের দেখা হয়ে যায়, তখন সেই ছেলেটি ইবনে আব্বাস রা.-এর মাথায় চুমু খায় এবং

তাঁকে একটা ফাতওয়া জিজ্ঞেস করে বলে ইবনে আব্বাস আল্লাহর শপথ করে বলছি তুমি আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান ছিলে।

হে ভাই ও বোনরা! এটাকেই বলে উঁচু মনবল। তুমি কি দেখো নি দুই জন ছেলে একসাথে পড়া-লেখা শুরু করে, এরপর একজন হয় অনেক বড় আলেম অর অন্যজন সাধারণই থেকে যায়। একজন হয় হাফেযে কুরআন, মসজিদের ইমাম-খতিব আর অন্যজন সাধারণ মানুষই থেকে যায়। এক মহিলা আল্লাহর পথের দায়ি' হয় আর অন্যজন সাধারণ নারীই থেকে যায়। সবাই বড় কিছু হওয়ার স্বপ্ন দেখে; কিন্তু পার্থক্য হল কর্ম-পদ্ধতি, সুন্দর পরিকল্পনা, কঠোর সাধনা আর আল্লাহর রহমত। সুতরাং যারা পৃথিবীতে কিছু হতে চায়, তারা যেনো মনোবল উঁচু রাখে এবং তার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করে যায়। ইন-শা-আল্লাহ সে একদিন সফল হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমিন।

আত্মবিশ্বাস

আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়মনোবলের ক্ষেত্রে মানুষ কত-না বিচিত্র প্রকৃতিরই হয়ে থাকে। কারো সাথে কারো ইচ্ছে-বিশ্বাসের কোনো তুলনাই হয় না, যেমন কেউ আপন লক্ষ্য-কল্পের অর্ধেকটা পেলেই বেজায় খুশি; আবার কেউ কাঙ্ক্ষিত বস্তুর কিঞ্চিৎ পেলেই কত-না বেশি; কিন্তু কিছু মানুষ–যাঁরা আপন লক্ষ্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছেইস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, যেমনটি বলা হয় যায়েদ ইবনু মুলাহহাবের ব্যাপারে (কথিত আছে, যায়েদ ইবনু মুলাহহাবের লক্ষ্য ছিলো দেশের মন্ত্রী-গভর্নর হওয়ার; তাই সে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো ঘরবাড়ি নির্মাণ করেনি, সে থাকত কিছুদিন এ-বাড়িতে, কিছুদিন ও-বাড়িতে।) লোকেরা যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, তুমি কখন নিজের জন্যে একটা বাড়ি নির্মাণ করবে? উত্তরে সে বলতো, আমার বাড়ি তো হল দারুল ইমারাত (প্রিন্সিপ্যালিটি হাউজ), নতুবা কারাগারের আবাধ্য ঘর বা অন্ধকার কবর; এর বাইরে আমার কোনো ঘরবাড়ি নেই।

Contents

আসুন! এ বিষয়ে আমরা কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করি। যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো যে, উঁচু মনোবল ও আত্মবিশ্বাস কাকে বলে? মনোবলের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে কীধরনের পার্থক্য হয়ে থাকে? এবং কীভাবে উঁচু মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে স্মরণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে?

বর্ণিত আছে, এক ব্যবসায়ী তার ছেলেকে ব্যবসা শিখাতে চাইলো, যাতে করে ছোট বয়স থেকেই সে কর্মঠ-পরিশ্রমী ও বিচক্ষণ হয়ে উঠেতে পারে, সাথে সাথে সে যেনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখে এবং অলস-অকর্মণ্য হয়ে পরনির্ভরশীল না হয়ে যায়। বরং একজন পরিশ্রমী, খেটে খাওয়া মানুষে পরিণত হয়। সুতরাং একদিন ছেলেকে ডেকে বলল, প্রিয় ছেলে আমার! এই নাও এক হাজার দেরহাম, যাও অমুক দেশে গিয়ে পণ্য কিনে নিয়ে এসো। আমি চাই তুমি এখন থেকেই ব্যবসা শিখো, এবং কীভাবে পণ্য বেচা-কিনা করতে হয়, কীভাবে পণ্য বহন করতে হয় এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে কীভাবে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করতে হয় সেই কৌশল তুমি এখন থেকেই ভালভাবে আয়ত্ত করা শিখো। সাথে সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠো দীর্ঘ সফর ও সফরের ক্লান্তির সাথে। অর্থাৎ তুমি এখন থেকেই একজন সফল ব্যবসায়ীতে পরিণত হও।

পিতার কথায় ছেলেটি টাকাগুলো নিয়ে সফর শুরু করলো। কিছু দূর যাওয়ার পর ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম করতে বসলো। সে যখন গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করছিলো তখন দেখলো, একটি শিয়াল অলস ভঙ্গিতে তার সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে পাশের একটা গাছের নিচে বসলো, যেনো তার কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। এরপরই হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা হরিণ খুব জোরে দৌড়াচ্ছে আর তাকে ধরার জন্যে তার পিছে পিছে একটা সিংহ দৌড়াচ্ছে। হরিণটি প্রাণপনে ছুটছে আর পিছনের পা দিয়ে বালু ও পাথর ছুড়ে মারছে সিংহের মুখে; কিন্তু সিংহ নাছোড় হয়ে তাকে ধরার জন্যে তার পিছনে ছুটছে। এক পর্যায়ে সিংহ যখন হরিণটির একেবারে কাছে চলে আসলো তখন হরিণটি তার পিছনের পা দিয়ে সিংহের নাকে মুখে লাথি মারতে লাগলো, সিংহটির চেহারায় ব্যথা ও ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠলো তবুও সে তার পিছু

ছাড়লো না। এভাবে এক পর্যায়ে সিংহটি হরিণকে ধরে ফেলল এবং তাকে মেরে কিছু অংশ খেয়ে বাকিটা ফেলে চলে গেল। এরপরশিয়ালটি ধিরে-সুস্থে উঠে হেলেদুলে গিয়ে তার আহার সম্পন্ন করলো। অলস শিয়ালটির আহার করতে না কোনো কষ্ট করতে হল না কোনো ধাবমান হরিণের খুরের আঘাত সহ্য করতে হল বরং সে একটি গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করল আর খাবার প্রস্তুত হয়ে তার সামনে চলে আসল। আর সে প্রস্তুতকৃত খাবার খেয়ে আবার এসে গাছের নিচে আরাম করা শুরু করলো।

এই কাহিনী দেখে ছেলেটি মনে মনে বলল, এই সিংহটি কত কষ্ট করে ক্লান্ত হয়ে হরিণটিকে শিকার করলো অথচ তার ভাগ্যে সামন্যই জুটলো, সে অল্প খেয়ে বাকিটা ফেলে চলে গেল। অন্যদিকে শিয়ালটি কোনো কষ্টই করলো না, তবুও সে কত আরামে খাবার খেতে পারলো। তাহলে আমি কেনো এত কষ্ট করে নিজেকে ক্লান্ত করে অর্থ উপার্জন করবো? কেউতো আর না খেয়ে ক্ষুধা-অভুক্ত ও পিপাসার্ত হয়ে মারা যায় না। অতঃপর সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর না হয়ে পিছনে দেশে ফিরে এলো। এমন অসময়ে তাকে দেশে দেখে পিতা তো একেবারে অবাক। তাকে জিজ্ঞেস করলো, প্রিয় ছেলে! তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে!? ব্যবসা করতে যাওনি? ছেলেটি তখন বাবাকে পথে দেখা শিয়াল, সিংহ আর হরিণের কাহিনী শুনিয়ে বললো, বাবা! কেউতো আর না খেয়ে মারা যায় না, সুতরাং আমিও না খেয়ে মরবো না। তাহলে কেনো এত পরিশ্রম করে নিজেকে কষ্ট দিবো?

বিচক্ষণ বাবা তখন এই নির্বোধ ছেলেকে বলল, প্রিয় ছেলে আমার! আমি চাই তুমি শিয়াল নয়; সিংহ হয়ে বেঁচে থাকো। পরিচালিত নয়; পরিচালক হও, আমি চাই তুমি গাড়িওয়ালা হও; চেকপোষ্টে বাইরে থেকে গাড়ির মালিককে চেক করার কাজ না করো, আমি চাই তুমি প্রকৌশলী হও; ভাড়াটিয়ে নয়। প্রিয় পাঠক! এটাই হল দুই জনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইচ্ছা-সংকল্পের মধ্যে পার্থক্য। আর এই পার্থক্যের কারণেই দুইজন ছাত্র একই সাথে একই ক্লাসে পড়ার পরও দুইজনের অবস্থান দুইধরনের হয় এবং দুই জনের মধ্যে থাকে অনেক বড় ব্যবধান।

এখন এখানে আমি আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করছি। আজ থেকে প্রায় ২০/২২ বছর আগের কথা। আমি যখন মাধ্যমিক স্তর শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। আর আপনারা তো জনেনই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর ছাত্রদের মধ্যে কতটা পরিবর্তন ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর বেশিরভাগ ছাত্রের বাবাই ছেলেকে একটা গাড়ি কিনে দেয়। আর যার গাড়ি না থাকে সেও কোনো না কোনোভাবে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে নেয়। ছাত্ররা তখন মনে করতে থাকে তার পড়া-লেখার সময় শেষ হয়ে গেছে, কারণ এরপরে তো আর কোনো পড়া-লেখা নেই, এরপরই হল কর্মজীবনে প্রবেশের সময়। অনেকেই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই বিয়ের বিষয়টা চিন্তা করতে থাকে, আবার কেউ কেউ অন্যের সাথে সম্পর্কে জড়ানোর চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। অর্থাৎ প্রায় সকলেই মনে করে তার পড়া-লেখার সময় সে পার করে এসেছে, এখন আর তাকে পড়া-লেখা করতে হবে না।

যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রথম সপ্তাহেই আমাদেরকে বই-পত্র দেওয়া হল। আমাদেরকে দেওয়া হলশায়খ শাওকানি রহ.-এর লেখা "আল ফাতহুল কাদির ফিত তাফসির" নামক কিতাবটি। কিতাবটি বেশ বড়, ছয় খন্ডের। ইতঃপূর্বে আমরা এত বড় কিতাবের সাথে পরিচিত ছিলাম না, কারণ আমরা মাধ্যমিকে যে কিতাবগুলো পড়েছি তা ছিলো ছোট ছোট, কোনো কোনোটা তো ৮০ পৃষ্ঠার চেয়েও কম। এত বড় কিতাব হাতে পেয়ে অনেকেই কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখতে লাগলো, কেউ কেউ ভিতরে নিজের নাম লিখলো। আমি কিতাব খুলে ভিতরে আমার নাম লিখলাম, আমি আমার নাম লিখলাম 'ড. মুহাম্মাদ আল-আরিফি'। আমার পাশে যে ছেলেটি বসা ছিলো সে মাধ্যমিকে আমার সাথে পড়েছে। সে আমার নাম 'ড. মুহাম্মাদ আল-আরিফি' লিখতে দেখে আমার দিকে তাকালো এবং আমাকে বললো, তুমি কি ডক্টর লিখেছো? অর্থাৎ তুমি ডক্টর হতে চাও? আমি বললাম, ইন-শা-আল্লাহ, আল্লাহর ইচ্ছায় আমি এখানে ভর্তি হয়েছি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করার জন্যেই। তখন সে বললো, আগে হয়ে নাও!! দাল (.১)দেখলেই সেটাকে

Contents

ডক্টর মনে করো না, দাল দিয়ে (دجاجة) দাজাজাহও (মুরগিও) হয়। সে 'দাল' দিয়ে আরো কয়েকটি শব্দ বললো, যা এখন আমার মনে নেই। আমি তখন হাসলাম এবং বললাম, অপেক্ষা করো যখন কয়েক বছর পর ডক্টর হবো তখন দেখতে পাবে।

আল্লাহর ইচ্ছায় এরপর থেকে আমি লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম এবং তা বাস্তবায়নের জন্যে দৃঢ় সংকল্প করলাম, পড়া-লেখায় অনেক মেহনত-মুজাহাদা শুরু করলাম এবং একসময় ডক্টরেট সনদ অর্জন করলাম। এ ঘটনা বলার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল একথা বুঝানো যে, আত্মবিশ্বাস দৃঢ় মনোবল ও চিন্তা-চেতনার মধ্যে মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ তুমি যদি শুরু থেকে নিজের জন্যে একটা পরিকল্পনা সাজাও এবং তা বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্প করো এবং লক্ষ্যে পৌছা পর্যন্ত অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট না হয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে লক্ষপানে ছুটে চলো, তাহলে তুমি একসময় তোমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছবেই, ইন-শা-আল্লাহ।

আমাদের নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মেধাবী, পরিকল্পনাকারী ও সৃজনশীল আবিষ্কারকদের পছন্দ করতেন এবং তাদেরকে উৎসাহ দিতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক শুক্রবার মসজিদে খেজুরের ডালের সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক নারী সামনে এগিয়ে এসে তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার ছেলে মিস্ত্রী, আপনার অনুমতি হলে আমি তাকে দিয়ে একটি মিম্বার বানাবো যার উপর দাঁড়িয়ে আপনি খুতবা দিবেন। (মহিলাটি ছিলো বুদ্ধিমতী ও সৃজনশীল চিন্তার অধিকারণী) তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কী বললেন? তিনি কি তাঁকে বললেন, না মিম্বর বানানোর দরকার নেই, এখানে উদ্দেশ্য তো হল আমার আওয়ায সকলের কানে পৌছা, এখন তো আমার আওয়ায সকলের কানে পৌছায়, সুতরাং মিম্বার বানানোর কোনো দরকার নেই, তার চেয়ে ভাল তুমি এ টাকাগুলো গরিব মানুষকে দান করে দাও। না তিনি একথা বলেন নি;

বরং তিনি একজন বুদ্ধিমতী মহিলার সৃজনশীল চিন্তার মূল্যায়ন করলেন। তিনি তাঁকে বললেন ঠিক আছে তোমার ছেলেকে বলো, মিম্বার বানাতে।

এরপর সপ্তাহের মাঝামাঝিতে ছেলেটি এসে তিনস্তর বিশিষ্ট মিম্বর তৈরি করলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরপর তার উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। এই মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিলে আগের চেয়ে আওয়ায আরো স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে এবং ভিড়ের সময় আগে যেখানে সামনের দিক থেকে চার পাঁচ কাতারের বেশি মানুষের চেহারা দেখা যেতো না এখন সেখানে অনেক মানুষের চেহারা দেখা যায়।

এরকম অন্য আরেকটি ঘটনা, খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহবায়ে কেরামকে নিয়ে আশুযুদ্ধের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করছিলেন তখন সালমান ফারসি রা. পরামর্শ দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের দেশে (পারস্যে) যখন শত্রুরা আক্রমণ করতে আসতো তখন আমরা পরিখা খনন করতাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সালমান ফারসি রা.-এর এই অভিনব পরামর্শ গ্রহণ করলেন। যদিও এই পদ্ধতির সাথে আরবদের পরিচয় ছিলো না, তথাপিও এই পরামর্শকে যুক্তিযুক্ত হওয়ার কারণে তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং সাহাবিদের পরিখা খননের নির্দেশ দিলেন। পরিখা খননের জন্যে সাহাবিদের দশজন দশজন করে গ্রুপ করে দিলেন এবং প্রত্যেক গ্রুপকে দশগজ করে খননের দায়িত্ব দিলেন। তিনি নিজেও খনন কাজে শরিক হলেন। পরিখা খননের সময় সামনে পাথর পড়লে তা কীভাবে ভাঙ্গতে হবে একটি পাথর ভেঙ্গে সাহাবিদের তাও শিখিয়ে দিলেন।

হে ভাই! আমরা মুসলমান, আমাদের ধর্ম ইসলাম। আমাদের ধর্ম হল সবচেয়ে সুন্দর ধর্ম ও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এখানে সৃজনশীল ও পরিশ্রমীদের মূল্যায়ন করা হয়।

কিন্তু যে ব্যক্তি তার লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কোনো পরিকল্পনা করবে না এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে ধারাবাহিকভাবে এর জন্যে পরিশ্রম করবে না,

Contents

সে কখনো তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না, এবং জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছুই হতে পারবে না। সুতরাং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে চাইলে আত্মবিশ্বাসের সাথে ধারাবাহিকভাবে পরিশ্রম করতে হবে।

বৃদ্ধ বয়সে জীবনের শেষ দিকে এসে আবু হুরাইরা রা. অধিক পরিমাণে হাদিস বর্ণনা করতেন। তখন কেউ কেউ বলতো 'আবু হুরাইরা বেশি হাদিস বর্ণনা করে'। এ ব্যাপারে আবু হুরাইরা রা. বলেন, মানুষ বলে আবু হুরাইরা বেশি হাদিস বর্ণনা করে, যেনো তারা এর মাধ্যমে আমার উপর এই অপবাদ আরোপ করতে চায় যে, আমি হাদিস বানিয়ে বর্ণনা করি!! এরপর তিনি বলেন, আমার আনসার ভাইয়েরা ক্ষেত-খামার ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সবসময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য গ্রহণ করতে পারতো না এবং তাঁর থেকে হাদিস মুখস্থ করতে পারতো না এবং আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজের ব্যস্ততার কারণে সবসময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য গ্রহণ করতে পারতো না এবং তাঁর থেকে হাদিস মুখস্থ করতে পারতো না; কিন্তু আমি ছিলাম দরিদ্র লোক, কোনো মতে পেট ভরে কিছু খেতে পারলেই আমার চলতো, আমি সর্বদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথে থাকতাম এবং একদিন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার স্মরণ শক্তি কম, আমার কিছুই মনে থাকে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, তোমার চাদর বিছাও, আমি তখন আমার গায়ের চাদর বিছালাম। আমি ছিলাম খুব দরিদ্র, আমার চাদরের উপর দিয়ে তখন উকুন হাঁটছিল। চাদর বিছানোর পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া পড়ে তাতে ফুঁ দিলেন এবং আমাকে বললেনএবার এটা গায়ে জাড়িয়ে নাও। আমি তখন তা আমার বুকের সাথে জাড়িয়ে নিলাম। আল্লাহর শপথ করে বলছি, এরপর থেকে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু শুনতাম তা আর ভুলতাম না।

হে ভাই! সুযোগ সব সময় আসে না। হঠাৎ করে আসে আবার হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। সুতরাং তোমাকে সর্বদা সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। যখন যা আসে সাথে সাথে তা লুফে নিতে হবে এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। যেমন কবি বলেছেন,

وما نيل المطالب بالتمنيولكن بؤخذ الدنيا غلابا

'শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে উদ্দিষ্ট বস্তু অর্জন করা যায় না। বরং দুনিয়াকে ধরতে হলে তাকে পরাজিত করে নিতে হয়।'

সুতরাং একবার লক্ষ করে দেখো, আবু হুরাইরা রা. তার লক্ষ্যে স্থির থাকার কারণে আজ কোথায় পৌঁছে গেছেন, আজ চৌদ্দশত বছর পরেও ছোট-বড় সকলেই আবু হুরাইরা রা.কে চিনে। তুমি প্রথম ক্লাসের ছোট ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি আবু হুরাইরা রা.কে চিনো? উত্তরে সে বলবে, হ্যাঁ আবু হুরাইরা রা. কে চিনি, তিনি তো আমাদের প্রিয় নবিজির প্রিয় সাহাবি ছিলেন। অথচ এই আবু হুরাইরা রা. ইসলাম গ্রহণ করেছেন সপ্তম হিজরিতে অর্থাৎ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মাত্র তিন/চার বছর হায়াতে পেয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি ইসলামের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে রয়েছেন।

একই কথা বলা যায় খালেদ ইবনে ওয়ালিদ, আবু বকর ইবনে কুহাফা, ওমর ইবনে খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান, আলি ইবনে আবু তালেব রা.দের সম্পর্কে। তাঁরা সকলেই ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য গ্রহনে দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন। তাঁদের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবত-সান্নিধ্যই ছিলো সবচেয়ে প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়। তাঁরা সর্বদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ গ্রহণ করতেন। এই যে, বেলাল রা. এত উঁচুস্তরে কীভাবে আরোহণ করলেন, কীভাবে তিনি এই কঠিন নির্যাতন সহ্য করে ইসলামের উপর অটল-অবিচল রইলেন? তাতো কেবল দৃঢ় সংকল্প ওউঁচু মনোবল এবং নিজের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

আর একটি ঘটনাবলে আজকের আলোচনা শেষ করছি, রাবিয়া ইবনে কা'ব রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতেন,

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযুর পানি এনে দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাঁর খেদমতে সন্তুষ্ট। অথচ তখন তাঁর বসয় তের বছরও অতিক্রম করে নি। এই বালক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে ওযুর পানি ব্যবস্থা করেন। কখনো কখনো তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার সামনেই ঘুমিয়ে যেতেন, সেখানেই রাত কাটিয়ে দিতেন, কারণ হয়তো রাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হবেন আর তাঁর ওযুর পানির প্রয়োজন হবে; কিন্তু তখন তিনি পানি পাবেন না। তাই তিনি তার দরজার সামনেই ঘুমিয়ে যেতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাঁর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট। একদিন রাবিয়া ইবনে কা'ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ওযুর পানি ঢেলে দিচ্ছেন এমন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, রাবিয়া! তুমি আমার কাছে কিছু চাও। রাবিয়া ইবনে কাব রা. ছিলেন তখন ছোট, তিনি অনেক কিছুই চাইতে পারতেন, যেমন কাপড় চাইতে পারতেন, চাদর চাইতে পারতেন, লুঙ্গি চাইতে পারতেন, মজাদার কোনো খাবার চাইতে পারতেন অথবা অন্য কিছু; কিন্তু না তিনি এর কিছুই চাননি। তিনি বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি কি আপনার কাছে কিছু চাইবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ চাও। আমি বললাম, আমাকে একটু সুযোগ দিন, আমি একটু ভেবে বলি আমি কী চাইবো? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ভাবার সুযোগ দিলেন, অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জান্নাতে আপনার সাথী হতে চাই। তখন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এছাড়া অন্য কিছু কি চাও? তিনি বলেন, আমি তখন লজ্জা পেলাম এবং বললাম এটাই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বললেন, জান্নাতে আমার সঙ্গী হতে চাইলে বেশি বেশি সালাত আদায় করবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দৃঢ় সঙ্কল্প ও উঁচু মনোবল সম্পন্ন আত্মবিশ্বাসী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আত্মবিশ্বাস ঘন মেঘমালাকেও সরিয়ে দেয়

আল্লাহর দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস ও কঠিন পরিশ্রম– বাধার সকল প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তুমি অধিক সম্পদের উপর ভরসা করতে পারো না এবং ভরসা করতে পারো না শরীরিক শক্তির উপর, তীক্ষ্ণ মেধার উপর, এবং কোনো জাতি-গোষ্ঠী বা দলের উপর; কিন্তু তুমি ভরসা করতে পারবে আত্মবিশ্বাসী একটি মনকে যা সত্য চিনে এবং ইসলামি চিন্তা-চেতনা লালন করে।

আমি আজ থেকে পনের বছর পূর্বে সুইডেন গিয়েছিলাম এবং সেখানের 'মালমু' শহরের একটি মসজিদে পনের বছরের এক প্রতিবন্ধী বালকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। ছেলেটি মূলত সুমালিয়ো বংশদ্ভূত সুইডেনের নাগরিক। ছেলেটি প্রতিবন্ধী, হাত পা অচল, কথা বলতে পারে না। অথচ তার হাতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমি নিজের চোখে তাকে দেখেছি, বালকটি মারাত্মক প্রতিবন্ধী; কিন্তু সে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। এখন প্রশ্ন হল ছেলেটি কীধরনের প্রতিবন্ধী? কীভাবে এমন একজন প্রতিবন্ধীর হাতে এত মানুষ মুসলমান হল? এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। এ বিষয় নিয়েই আমাদের সামনের আলোচনা।

সুইডেনে থাকাকালে একদিন সুইডিস এক বন্ধু জানালো যে, আজ আমরা 'মালমু' শহরের এক মসজিদ-পরিদর্শনে যাবো। মালমুতে তখন মুসজিদ ছিলো মাত্র একটি। অবশ্য এটা ছাড়াও অনেক জায়গায় সালাত আদায় করা হত। যেমন অফিসের হলরুম, বেডরুম এরকম বিভিন্ন জায়গায় সালাত আদায় হতো; কিন্তু মেহরাব, মিম্বার ও মিনারসহ যে মসজিদ বুঝায় তা ছিলো মাত্র একটি। অর্থাৎ আজ থেকে পনের বছর আগে মালমুতে মাত্র একটি মসজিদ ছিল। পরে মসজিদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপের মসজিদগুলো অন্যান্য জায়গার চেয়ে একটু ভিন্নধরনের হয়ে থাকে। মালমুর মসজিদটির চারপাশে ছিলো সবুজ-শ্যামল বাগান। আমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন সালাতের সময় ছিলো না। সময়টা ছিলো পূর্বাহ্ন। মসজিদে প্রবেশ করে দেখি সেখানে চেয়ারের উপর একজন যুবক ছেলে বসা। ছেলেটি সুমালিয়ো বংশদ্ভূত সুইডেন-নাগরিক। ছেলেটি প্রতিবন্ধী, হাত, পা নাড়াতে পারে

না। চেয়ারের দুই হাতলের সাথে তার দুই হাত বাঁধা, কারণ তার হাত সর্বদা কাঁপতে থাকে, হাতের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অনুরূপভাবে তার পা দুটোও চেয়ারের পায়ার সাথে বাঁধা, কারণ তার পা-ও অচল; সর্বদা কাঁপতে থাকে। সাথে সাথে সে বাকপ্রতিবন্ধীও; কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল ছেলেটি একজন দায়ি, সে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। যদিও সে কথা বলতে পারে না; কিন্তু সে ইংরেজি, সুইডিস ও সুমালিয়ো ভাষা বুঝে।

আমি ছেলেটির কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলাম এবং তার কপালে চুমু খেলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেমন আছো? ছেলেটি আরবি বুঝে না, তাই আমি ইংরেজিতে বললাম, তুমি কেমন আছো?। এরপর তাকে অসুস্থতায় ধৈর্যধারণের ফযিলত শুনালাম এবং শান্তনা দিলাম। আমি এক বন্ধুকে কাছে ডেকে আমার কথার তরজমা করতে বললাম। বন্ধুটি আমার কাছে আসলো, তখন আমি ছেলেটিকে একটি হাদিস বললাম,

قال النبي(রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে)বন্ধুটি এটুকুর তরজমা করলো। আমি বললাম, ما يصيب المؤمن (মুমিন যেসব মুসিবতে আক্রান্ত হয়।) বন্ধুটি এর তরজমা করলো। এরপর আমি বললাম, من نصب ولا وصبবন্ধুটি বললো, আবার বলেন। আমি আবার বললাম, এবার সে বললো, শায়খ! আমি এই আরবিটা বুঝতে পারছি না। তখন আমি এর ব্যাখ্যা করে দিলাম। বন্ধুটি ছিলো ইরাকি বংশদ্ভূত সুইডিস নাগরিক। অতঃপর সে চলে গেল, আমি হেসে দিলাম। আমি তাকে ডেকে বললাম, আপনি আসেন, আমি আপনাকে আরবিতে এর ব্যাখ্যা করে দিবো কিন্তু সে আর সামনে আসলো না। অন্য একজন সামনে আসলো এবং ছেলেটিকে আমার কথা তরজমা করে শুনাল।

এ বিষয় শেষ করে আমি তাকে বললাম, শুনেছি তোমার হাতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে? এটা কীভাবে হয়েছে? আমাকে একটু ব্যাখ্যা বরে বলো। তখন ছেলেটি তার এক সাথীর দিকে তাকাল। সুইডিস সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই ছেলের জন্যে সকালে

দুইজন এবং বিকেলে দুইজন করে লোক ঠিক করে দেওয়া আছে। যারা তাকে সঙ্গ দেয় এবং তার খেদমত করে ও বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করে দেয়। ছেলেটি তার মাথা দিয়ে এদের একজনের দিকে ইশারা করলো আর লোকটি পালকি সাদৃশ একটা বাক্স নিয়ে এলো। তাতে লাঠির মধ্যে পেঁচানো অনেকগুলো বেনার দেখতে পেলাম এবং প্রতিটি বেনারের মধ্যে অনেকগুলো ঘর আঁকা ছিলো ও প্রতিটি ঘরের মধ্যে বিভিন্ন বাক্য লেখা, যেমন কোনোটিতে লেখা আমি পানি চাচ্ছি, কোনোটিতে লেখা আমি টয়লেটে যাব, আমার মার সাথে সাক্ষাৎ করবো, আমার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করবো ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা লেখা আছে। তার যখন যেটার প্রয়োজন হয় সে তার সাথীদের মাথা দিয়ে সেটার দিকে ইশারা করে আর তারা সেটা পূরণ করে দেয়।

ছেলেটি আমাকে ইশারায় বলল, শায়খ! আমি কুরআন হিফয করতে চাই তাই আপনি আমাকে পূর্ণ কুরআনের অডিও কেসেটের ব্যবস্থা করে দিন।

সে কথা বলতে পারে না; কিন্তু বুঝতে পারে, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি এটা এটা চাচ্ছ? ছেলেটি মাথা দিয়ে ইশারায় তার ইচ্ছার বিষয়টা সম্মতি জানাচ্ছিল।

হে ভাই! তুমি একবার ছেলেটার সাহস ও উঁচু মনোবলের দিকে লক্ষ করো। এরপর ছেলেটি আমাকে বলল, শায়খ আমি সৌদিআরবে ইলম শিক্ষা করার জন্যে সফর করতে চাই। সুবহানাল্লাহ! ছেলেটির হিম্মত কত? হাঁটতে পারে না, চলতে পারে না, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না, কথা বলতে পারে না, সে ইলম শিক্ষার জন্যে ভিনদেশে সফর করতে চায়!!?

এরপর আমার বন্ধুরা আমাকে বলল, শায়খ! এই ছেলেটির মাধ্যমে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমি বললাম এটা কীভাবে সম্ভব? যে ছেলে কথা বলতে পারে না, কারো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, কারো কথা খণ্ডন করে না, কারো বিরুদ্ধে দলিল পেশ করতে পারে না তার মাধ্যমে কীভাবে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে? তার কাছে তো কথা

বলার মতো, মনের ভাব প্রকাশ করার মত এই কয়েকটা লেখা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম নেই!! সে কি তার এই ফেস্টুনের দিকে ইশারা করে মানুষদের ইসলামের দিকে আহ্বান করে? এটা কীভাবে সম্ভব?? তারা আমাকে বললো, শায়খ! সকালে যখন তার কাছে দুইজন লোক আসে তখন সে তাদের একজনকে ইশার করে বলে, আমি এখন আমার অমুক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করবো, তখন তাদের একজন গিয়ে তার বন্ধুকে ডেকে নিয়ে আসে, তখন সে অপর লোকটিকে বলে তুমি আমার এই বন্ধুর কাছে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করে বল যে, ইসলাম কী? অতঃপর তা আমাকে ব্যাখ্য করে শুনাও। তখন দায়িত্বে থাকা লোকটি তার বন্ধুকে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করে আর সে তার সামনে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরে। এরপর ছেলেটি লোকটির মাধ্যমে বন্ধুকে প্রশ্ন করে এবার তুমি আমাকে ইসলাম ধর্ম ও খৃস্টান ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করে দেখাও। তখন সে ইসলাম ও খৃস্টান ধর্মের পার্থক্যগুলো তার সামনে ব্যাখ্যা করে।কী ভাই বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি এই ঘটনা সচক্ষে দেখেছি। তাদের আলোচনা শেষ হলে ছেলেটি তার বোর্ডের দিকে ইশারা করে সেলফে থাকা ইসলাম সম্পর্কে একটি বই তাকে হাদিয়া দিতে বলে, এভাবেই এই প্রতিবন্ধী বালকটির কাছে আসা তার দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।

সত্যিই দৃঢ় সঙ্কল্প ও আত্মবিশ্বাস আকাশের ঘন মেঘমালাকেও সরিয়ে দেয়। যে ছেলেটি প্রতিবন্ধী হাত পা নাড়াতে পারে না, কথা বলতে পারে না সে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে, মানুষকে সত্য দীনের দিকে আহ্বান করছে। ছেলেটি কিন্তু এই বলে বসে থাকে নি যে, আমি প্রতিবন্ধী, হাত-পা নাড়াতে পারি না, কথা বলতে পারি না, সুতরাং আমার কোনো দায়িত্ব নেই। আমি কীভাবে দাওয়াত দিবো? আমি তো লিখতেও পরি না, বলতেও পারি না। সে এভাবে বসে না থেকে তার সামর্থ্যের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করেছে এবং তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একবার চিন্তা করে দেখুন, কিয়ামতের দিন এই প্রতিবন্ধী বালকটির অবস্থান কোথায় থাকবে, সে আম্বিয়া আ.দের সাথে জান্নাতে যাবে, কারণ আম্বিয়া আ.ও মানুষদের দীনের দাওয়াত দিতেন,

অমুসলিমরা তাঁদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করতো আর সেও মানুষদের দীনের দাওয়াত দিচ্ছে এবং তাঁর হাতেও মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে।

আমি আমার নিজেকে ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেন,'ঘটনা'হল আল্লাহর তাআলার সৈনিকদের অর্ন্তভূক্ত। অর্থাৎ অনেক মানুষ কোনো একটি ঘটনা শুনার কারণে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

রিয়াদে প্রতিবন্ধীদের জন্যে একটা হাসপাতাল রয়েছে। যে সকল লোক কঠিন পঙ্গুত্বের শিকার তাদেরকে সেখানে নেওয়া হয়। যেমন একজনের পিঠ ভেঙ্গে গেছে, মাজা ভেঙ্গে গেছে, সে মাথা ব্যতীত অন্য কিছুই নাড়াতে পারে না। এমন কঠিন রুগীদের সেখানে ভর্তি করা হয়। ঐ হাসপাতালে রুগীদের দেখতে, তাদের সামান্য শান্তনা দিতে আমরা মাঝে-মধ্যে সেখানে যাই। রুগীদের দেখতে যাওয়া, তাদেরকে দুইটা শান্তনাবাণী শুনানো ইবাদতের কাজ; এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। তাহলে তুমি কেনো তাদেরকে দেখতে যাবে না? যারা সেখানে দীর্ঘদিন ধরে অসহায় অবস্থায় আছে। তাদের কেউ কেউ এক বছর, দুই বছর আবার কেউ আরো অনেক বেশি সময় ধরে সেখানে আছে। আমি এমন এক হাসপাতাল পরিদর্শনের জন্যে গেলাম। হাসপাতালটি অনেক পুরনো। সেখানে গেলে তোমার মানে হবে যে, তুমি কোনো একটা নির্জন বনে প্রবেশ করেছো, কারণ সেখানে যাতায়াতকারী মানুষের সংখ্যা অনেক কম। সাথে সাথে হাসপাতালটি খুবই অযত্নে ও অবহেলায় পড়ে আছে। যেনো দেখাশুনার জন্যে কেউ নেই। কেউ তার সংস্কার-কাজ করে না। আমি আমার এক সাথীর সাথে সেই হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। আমরা সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা অবস্থান করেছি। সেখানে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত সতের বছরের এক যুবকের কামরায় প্রবেশ করি। তার অবস্থা এতটাই নাযুক ছিলো যে, সে তার মাথা ব্যতীত অন্য কিছুই নাড়াতে পারতো না। আমি তার কামরায় প্রবেশ করে তার সামনে একটি আশ্চর্যজনক জিনিস ঝুলানো দেখলাম। যা ছেলেটির এমন উঁচু মনোবল আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ বহণ করে, যা অনেক সুস্থ মানুষের মধ্যেও নেই। ছেলেটি তার সামনে কী ঝুলিয়ে রেখেছিল?

ছেলেটি তার সামনে টেলিভিসনের কোনো মনিটর ঝুলিয়ে রাখেনি যে, শুয়েশুয়ে বিভিন্ন চিত্র দেখবে। অথবা সে তার সামনে ল্যাপটপ বা কম্পিউটারও রাখেনি যে, যখন যা মন চাইবে মাউচে টিপ দেওয়ার মাধ্যমে তা চলে আসবে। বরং ছেলেটি তার পরিবারের কাছে দাবি করেছে যে, তারা যেনো বড় কাগজে বড় বড় অক্ষরে কুরআন লিখে তার সামনে বিভিন্ন অংশ ঝুলিয়ে রাখে, যাতে সে দূর থেকে দেখে পড়তে পারে এবং তা মুখস্থ করতে পারে, কারণ ছেলেটির মাথা ব্যতীত সমস্ত শরীর অবশ। হাত পা কিছুই নাড়াতে পারে না। কুরআন হাতে নিয়ে পড়বে তো দূরের কথা, সে তো হাতই নাড়াতে পারে না। তাই সে তার পরিবারের কাছে দাবি করেছে যে, তারা যেনো কুরআনুল কারিম বড় বড় অক্ষরে লিখে এক পৃষ্ঠা এক পৃষ্ঠা করে তার সামনের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে এবং সে তা দেখে দেখে মুখস্থ করতে পারে। এক পৃষ্ঠা মুখস্থ হলে সে মাথা দিয়ে ইশারা করে আর তারা এর পরের পৃষ্ঠা ঝুলিয়ে দেয়। আমি যখন তার কামরায় প্রবেশ করলাম তখন ছেলেটি সুরা মুজাদালাহ মুখস্থ করছে। আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, সে এপর্যন্ত কত পৃষ্ঠা মুখস্থ করেছে? বে বললো, দশ পাড়ার চেয়ে বেশি। আমি ছেলেটির পাশে একটি বাক্স দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এতে কী? আমাকে বলা হল, এর মধ্যে কুরআন লিখা পৃষ্ঠাগুলো রয়েছে। আর এতে প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার মত আছে।

সুবহানাল্লাহ! ছেলেটির শরীর অচল হওয়া সত্ত্বেও কুরআন মুখস্থ করার সংকল্প করেছে এবং পনের পাড়ার মত কুরআন মুখস্থ করে ফেলেছে। ছেলেটি কিন্তু একথা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকে নি যে, আমি এতগুলো রোগে আক্রান্ত। আমি হাত পা নাড়াতে পারি না, কথা বলতে পারি না। আমি পূর্বে একটি কথা বলতে ভুলে গেছি যে, ছেলেটি কথাও বলতে পারে না। আমার সাথে যে লোকটি ছিলো সে আমাকে বলেছে, ছেলেটি তার সামনে ঝুলানো কাগজ থেকে কুরআন মুখস্থ করে। এক পৃষ্ঠা মুখস্থ হয়ে গেলে সে তার পরিবারকে মাথা দ্বারা ইশারা করে, আর তারা তার পরবর্তী পৃষ্ঠা ঝুলিয়ে দেয়। আমি এরও অনেক দিন পরে ছেলেটিকে দেখতে আবারও সেই হাসপাতালে গেলাম। তখন সে একটু

একটু তার হাত নাড়াতে পারে। অর্থাৎ একশত ভাগের পনের ভাগ। আমি ছেলেটির হাতে একটি কলম ধরিয়ে দিলাম আর ছেলেটি কলম ধরল এবং তার সেই অবশ হাত দিয়েই লিখতে চেষ্টা করল। সে তার ইচ্ছেমত সামান্য কিছু লিখল,কারণ সে লিখতে পারে না। সুবহানাল্লাহ!! কী দৃঢ় মনোবল!!

আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আফসোস করে বলে, হায় আমি যদি কুরআন হিফজ করতে পারতাম! অথবা তারা যখন কোনো কুরআনের মজলিস, হিফজুল কুরআনের মজলিস দেখে অথবা কোনো দশ বছরের ছোট্ট হাফেজে কুরআনকে দেখে তখন বলে, এতটুকু বাচ্চা কুরআন মুখস্থ করেছে!!? হায় আমি যদি তার মত হতে পারতাম! হায়! আমি যদি কুরআন মুখস্থ করতে পারতাম! কিন্তু আমার হয় না, আমি পারি না। আরে ভাই! তুমি পারো এবং পারবে। বরং তোমার মনোবল দুর্বল, তোমার দুর্বল হিম্মত তোমাকে বসিয়ে রেখেছে।তুমিও তার মত কাজ করতে পারবে। তুমিও মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে পারবে এবং মানুষকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে পারবে। তুমিও পারবে কুরআন মুখস্থ করতে; কিন্তু সমস্যা হল মানুষের হিম্মত মানুষকে বসিয়ে রাখে। তোমার হিম্মত তোমাকে বসিয়ে রেখেছে। তুমি যদি হিম্মত করে সামনে বাড়তে তাহলে অবশ্যই তা অর্জন করতে পারতে।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে আবদ রা. অন্ধ ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তার টার্গেট ও লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। এক রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর ও ওমর রা.-এর সাথে বাইরে বের হলেন। আবু বকর ও ওমর রা. ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী এবং তার উজির। তখন ছিলো অন্ধকার রাত, সকল মানুষ নিজ নিজ ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই সাথীকে নিয়ে মসজিদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মসজিদের ভেতর থেকে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়ায শুনতে পেলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অন্ধকার রাতে মসজিদ থেকে কুরআনের আওয়ায শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর পড়া শুনলেন। ভিতর থেকে অন্ধ

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে আবদ রা. কুরআন পাঠ করছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে কেউ যদি সেভাবে তিলাওয়াত করতে চায়, তাহলে সে যেনো আবদুল্লাহর মতো তিলাওয়াত করে। এরপর আবদুল্লাহ রা. কুরআন তেলাওয়াত শেষ করে দোয়া শুরু করলেন। তিনি জানেন না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তেলাওয়াত শুনেছেন এবং এখন তাঁর দোয়াও শুনছেন। তিনি দোয়া করতে লাগলেন আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি চাও তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি চাও তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি চাও তোমাকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তুমি আরো বেশি করে চাও, আল্লাহ তাআলা তোমাকে দিবেন। তো্মার দোয়া কবুল করবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে আবদ রা. বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর এক যুদ্ধের সময় আবদুল্লাহ রা. বললেন, আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধে যেতে চাই। লোকেরা বললো, তুমি উজরগ্রস্ত; আল্লাহ তাআলা তোমার সমস্যা গ্রহণ করবেন। ইরশাদ হয়েছে :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ

'অন্ধের জন্যে, খঞ্জের জন্যে এবং অসুস্থ ব্যক্তির জন্যে কোনো অপরাধ নাই।'[১]

কিন্তু তিনি বললেন, আমি যুদ্ধে যেতে চাই। সুতরাং তোমরা আমাকে যুদ্ধের একটি পতাকা দাও। আমি পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, আমি অন্ধ মানুষ; পালাতে চাইলেও পালাতে পারবো না। ময়দানে মুসলমানদের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। মানুষ যুদ্ধ করবে এবং পতাকা দেখে একতাবদ্ধ হয়ে লাড়াই করবে। আমাকে যুদ্ধের পতাকা দিলে অন্য একজন দৃষ্টিসম্পন্ন মুজাহিদ স্বাচ্ছন্দ্যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে। অতঃপর তিনি তাঁদের সাথে জিহাদে বের হলেন এবং জিহাদের পতাকা নিয়ে সুদৃঢ় পর্বতের ন্যায় ময়দানে অটল রইলেন। মুজাহিদগণ যখন যুদ্ধ করতে করতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো, তখন তাঁকে দেখে আবার একত্র হতো। তিনি পতাকা হতে একটা তীর বা তরবারির

---

১. সুরা নূর, আয়াত : ৬১

Contents

আঘাতের অপেক্ষা করছিলেন। এভাবে একসময় তিনি শহাদাত বরণ করলেন। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও জিহাদের পতাকা বহন করে তিনি শহিদ হলেন। সুবহানাল্লাহ!!

দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, শ্রবণশক্তিসম্পন্ন, হাঁটা-চলা ও নড়া-চড়া করার শক্তিসম্পন্ন লোকদের কোনো উজর নেই।অবহেলাকরীদের জন্যে কোনো উজর নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের যাকে যে শক্তি দিয়েছেন, প্রত্যেককে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। বাকশক্তিসম্পন্ন লোককে প্রশ্ন করবেন, কেনো তুমি মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকো নি? কেনো তুমি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করো নি? হাঁটা ও চলা-ফেরা করার শক্তিসম্পন্ন লোককে প্রশ্ন করবেন, কেনো তুমি মসজিদে যাওনি এবং আল্লাহর আনুগত্যের কাজে তোমার পা-কে ব্যবহার করো নি? অর্থাৎ প্রতিটি সক্ষম লোককেই তার সক্ষমতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাকে যে শক্তি দান করেছিলাম তুমি তাকে কোন কাজে ব্যয় করেছ? এই সকল প্রতিবন্ধী লোক, যারা জীবনের অনেক চাহিদাই পূরণ করতে পারে না। তা সত্ত্বেও তাদের জীবনে একটা প্রভাব বা ফল রয়ে যাচ্ছে। তাহলে যাদের শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে তাদের জীবনের কী পরিমাণ প্রভাব ও ফল থাকা দরকার? বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে, শিক্ষক-ছাত্র, ইমাম-মুওয়াজ্জিন, শ্রমিক-চাকুরিজীবী সকলেরই তাদের জীবনের একটা প্রভাব রেখে যাওয়ার কামনা করা উচিত। যার যে শক্তি ও সক্ষমতা আছে তা-ই দীনের সাহায্যে, নিজের ও উম্মাহর উপকারে ব্যয় করা উচিত।

আমি আল্লাহ তাআলার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি যেনো আমাকে এবং আপনাদের সকলকে তার আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করেন। প্রতিটি কল্যাণকর কাজ করার তাওফিক দান করেন। আমরা যেখানেই থাকি না কেনো তিনি যেনো আমাদেরকে তাঁর রহমত ও বরকতের মধ্যে রাখেন এবং আমাদের জীবনের একটা ছাপ বা ফল বাকি রাখেন। বান্দার জীবনের ছাপ ও ফল তাঁদের রবের নিকট বাকি থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

'আমিই মৃতদের জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছে।'[১]

মানুষের মধ্যে এমন মানুষ রয়েছে যারা মৃত্যুবরণ করে আর তাঁদের নেক আমল বাকি থাকে এবং বদ আমলগুলো তাঁদের সাথে মৃত্যুবরণ করে। আবার এমন মানুষও রয়েছে, তারা যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাদের সাথে সাথে তাদের নেক আমল গুলোও মৃত্যুবরণ করে। আবার করো কারো বদ আমলগুলো বাকি থাকে অর্থাৎ যারা খারাপ কিছু রেখে যায়। যার কারণে অন্য মানুষ আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে। এটা এমন একটি মাসআলা যার ব্যাপারে আমাদের সকলেরই সতর্ক থাকা উচিত। মানুষের নেক আমল বাকি থাকার কারণে তাঁরা যেমনিভাবে প্রতিদান পাবে, অনুরূপভাবে বদ আমল বকি থাকার কারণেও তারা তার প্রতিদান পাবে। সুতরাং আমাদেরকে খারাপ কাজের চাবিকাঠি হওয়ার পরিবর্তে নেক-কাজের মাধ্যম হতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমিন।

আল-আসমায়ি রহিমাহুল্লাহঃ এক মহাসাফল্যের গল্প

মানুষের বিভিন্ন স্বপ্ন থাকে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে তাকে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখিনও হতে হয়। তাবে তাদের মধ্যে যারা সেই সকল বাধা পেড়িয়ে সামনে এগুতে থাকে সে-ই সফল হয় এবং সে-ই তাঁর স্বপ্নের চূড়ায় পৌছতে পারে। সুতরাং মানুষের মধ্যে কেউ তার স্বপ্ন পূরণের জন্যে সকলধরনের কষ্ট-মাশাক্কাত সহ্য করে, আবার কেউ কষ্ট দেখে গর্তে লুকাতে চায়।

---

১ সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ১২

আর সফলতা তো বলা হবে তখনই যখন তা সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌছানো হবে। স্বপ্ন-পাহাড়ের চূড়ায় পৌছানোর ক্ষেত্রে মানুষের হিম্মত ও মনোবল বিভিন্নধরনের হয়ে থাকে। তাদের কেউ পাহাড়ের কিছুটা উঠে নেমে যায়, কেউ চার ভাগের একভাগ, কেউ চার ভাগের তিনভাগ উঠে নেমে যায়; কিন্তু কিছু কিছু মানুষ থাকে যাঁরা তাঁদের লক্ষ্যের চূড়ায় পৌছানোর আগ পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। যখন সে চূড়ায় পৌছে কেবল তখনই অনুভব করে যে, সে কিছুটা সফল।

প্রতি বিষয়েরই একটা চূড়া রয়েছে, যেমন পড়ালেখার চূড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যের চূড়া, আবিষ্কারের চূড়া, হিফযুল কুরআনের চূড়া, বয়ান বক্তৃতার চূড়া, সন্তান লালন-পালনের চূড়া, পরিবারের সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরার আদব-আখলাকের চূড়া, এক কথায় প্রতিটি বিষয়েরই একটা সর্বোচ্চ চূড়া রয়েছে; কিন্তু মানুষ তার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিন্নভিন্ন হয়ে থাকে।

এখন আমরা এবিষয়ে অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছার ক্ষেত্রে আবদুল মালেক ইবনে কুরাইব আল আসমায়ি রহ.-এর আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনবো। যদিও ইলমের প্রতিটি শাখায় আসমায়ির বিচরণ ছিলো; কিন্তু তার প্রসিদ্ধি ছিলো ভাষাবিধ হিসেবে।

আবদুল মালেক ইবনে কুরাইব আল আসমায়ির যদিও ইলমের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে অনেক দক্ষতা ছিলো; কিন্তু তিনি একজন ভাষাবিদ হিসেবেই বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমি এখন আপনাদের সামনে যে ঘটনা উল্লেখ করবো তা শায়খ তানুখি তাঁর 'আল ফারায বা'দাশ শিদ্দাত' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আবদুল মালেক ইবনে কুরাইব আল আসমায়ি বসরায় বসবাস করতেন, তিনি ছিলেন ইলম-পিপাসু। তিনি প্রতিদিনই কোনো না কোনো ইলমের শায়খের নিকট ইলম শিখার জন্যে যেতেন। আজ তাফসিরের শায়খের কাছে, কাল হাদিসের শায়খের কাছে, এর পরের দিন সাহিত্যের শায়খের কাছে, এভাবে একেক দিন একেক শায়খের নিকট গিয়ে ইলম শিক্ষা করতেন। ইলমের দিকে অধিক মনোযোগী হওয়ার কারণে তিনি রুজি-রুজগারের প্রতি মন দিতে

Contents

পারতেন না। তাঁর বাড়ির পাশেই ছিলো এক সব্জি-বিক্রেতার দোকান। আসমায়ির বাড়িটি ছিলো এলাকার একেবারে শেষ মাথায়, বাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদ অথবা শায়খদের নিকট যাওয়ার পথে সব্জি-বিক্রেতার দোকান পড়তো এবং সব্জি-বিক্রেতার সাথে তার দেখা হতো। শায়খ আসমায়ির বয়স তখন বিশ বছরের কম। প্রতিদিন যাওয়া আসার পথে সব্জি-বিক্রেতা তাঁকে জিজ্ঞেস করতো আসমায়ি! তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? আসমায়ি বলতেন, আমি এখন আমার তাফসিরের শায়খের নিকট তাফসির শিখার জন্যে যাচ্ছি। এরপর বিকেলে ফিরে আসার সময় তাঁকে আবার প্রশ্ন করতো, আসমায়ি তুমি এখন কোথা থেকে এলে? তিনি বলতেন, আমি এখন আমার সাহিত্যের শায়খের নিকট থেকে আসলাম। পরদিন সকালে আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, তুমি এখন কোথায় যাও? তিনি বলতেন, আমি আমার হাদিসের শায়খের নিকট হাদিস লিখতে যাচ্ছি। এভাবে প্রতিদিন তাঁর যাওয়া-আসার সময় সব্জি-বিক্রেতা তাঁকে প্রশ্ন করতো, কোথায় যাচ্ছ? কোথা থেকে এলে? আর তিনিও তাকে উত্তর দিতেন, অমুক শায়েকের নিকট যাচ্ছি, অথবা অমুক শায়েখের কাছে থেকে এলাম।

শায়খ আসমায়ি এভাবেই ইলম অর্জনের পিছনে তাঁর দিন-রাত মেহনত করছেন। এমন সময় একদিন সেই সব্জি বিক্রেতা তাঁকে বলল, আসমায়ি তুমি কি এভাবে এঁদের পিছনে ঘুরে ঘুরে তোমার সময় নষ্ট করো না? ফলে তুমি এঁদের থেকে কিছুই পাবে না। আসমায়ি বললো, আমি ইলম অর্জন করছি, কুরআন মুখস্থ করছি, ভাষা শিখছি, কবিতা শিখছি। লোকটি তাঁকে আবারও বললো, তুমি তোমার সময় নষ্ট করো না। আসমায়ি বললো, না; এতে আমার সময় নষ্ট হয় না বরং আমার উপকার হয়। এবার সব্জি-বিক্রেতা তাঁকে বললো, আসমায়ি আমার একটা মতামত শুনবে? (ভাই! তুমি একবার লক্ষ কর, উঁচু মনোবল আর নিচু মনোবল কাকে বলে?) এই যে, তুমি সকাল-বিকাল কষ্ট করে যে কিতাবগুলো বহন করো, (তখনকার কিতাব এখনকার মত এতো ছোটছোট ও সুন্দর সুন্দর ছিলো না। তখনকার কিতাব ছিলো অনেক বড় বড় পৃষ্ঠায় দোয়াতের কালি দিয়ে বড় বড় করে লেখা। উস্তাদ দরসে হাদিস বলতেন আর ছাত্র দোয়াতে

কলম ভিজেয়ে মোটা মোটা কাগজে লিখতো। এখনকার মত পকেট থেকে ছোট ও সুন্দর কলম বের করে নোট বুকের মধ্যে লেখা যেতো না। তাই তাঁদের একদিনের দরসের লেখা হয়ে যেতো অনেক, কখনো কখনো তা মাথায় করে বহন করতে হতো। আর আসমায়ি রহ. সকাল-বিকালে তাঁর লেখা বইগুলো নিয়ে শায়খের দরসে আসা-যাওয়া করতেন।) সব্জি-বিক্রেতা তাঁকে বলল, আমার একটা মতামত শুনবে? এই যে তোমার কিতাবগুলো তুমি সকাল-বিকেল যা কষ্ট করে বহন করে নিয়ে যাও সেগুলো আমাকে দিয়ে দাও, বনিময়ে আমি তোমাকে কিছু সজি দিব। আসমায়ি বললেন, আমি তোমাকে তা দিব না আর আমার কাছে এর সমতুল্য কিছুই নেই। তখন লোকটি তাকে ঠাট্টা করে বলল, আসমায়ি শুনো! আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তিনি বললেন সেটা কী? তুমি তোমার সকল কিতাবগুলো নিয়ে এসো এবং সেগুলোকে বড় একটা বালতির মধ্যে পানি দিয়ে ভিজাও, অতঃপর আমি তোমার সাথে একত্র হয়ে দেখবো সেখান থেকে কীধরনের রং বের হয়? তার রং কি লাল, নীল না কালো?

আসমায়ি বলেন, আমি তখন ছিলাম ছোট বালক, তাই আমি চুপ করে বাসায় ফিরে গেলাম। এরপর থেকে আমি ফজরের পূর্বেই বাড়ি থেকে বের হতাম, যাতে করে বের হওয়ার সময় সব্জি-বিক্রেতার সাথে আমার দেখা না হয় এবং তার সাথে আমার কথা বলতে না হয়। এবং রাতে ইশার পর যখন সব্জি-বিক্রেতা তার দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যেতো তখন আমি বাড়িতে ফিরতাম, যাতে করে সে আমাকে দেখতেই না পায়। আসমায়ি রহ. বলেন, এরপর কঠিন দরিদ্রতা আমাকে ঘিরে ফেলে, যার ফলে আমি আমার বাড়ির আসবাবপত্র, বিছানা-পাটি সবকিছুই বিক্রি করে দিলাম, এমনকি আমি আমার পরনের একটিমাত্র জামা রেখে বাকি সবগুলো বিক্রি করে দিলাম। এরপর আমার অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হতে লাগলো; আমার মাথার চুল লম্বা হয়ে গেল, গোসল না করতে করতে শরীরে ও কাপড়ে ময়লা জমে গেল, কারণ চুল কাটার মত ও গোসল করার মত কোনো টাকা আমার ছিলো না। অর্থাৎ আমি খুবই কঠিনভাবে জীবন কাটতে লাগলাম।

আমার যখন এই অবস্থা তখন একদিন বসরায় নিজ গ্রামে হাঁটছি, তখন হঠাৎ একলোকের চিৎকার শুনতে পেলাম; সে বলছে, কে আসমায়িকে চিনে এবং আমাকে আসমায়ির নিকট নিয়ে যাবে? কে আসমায়িকে চিনে এবং আমাকে আসমায়ির নিকট নিয়ে যাবে? তখন মানুষ আমার দিকে ইশারা করে তাকে দেখিয়ে দিল। অতঃপর সে আমার নিকট এলো এবং আমাকে দেখে বলল, তুমিই কি কবি সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ আসমায়ি? আমি বললাম, হাঁ আমিই আসমায়ি।তখন সে বললো, আমি বসরার আমির মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল-হাশিমির নিকট থেকে এসেছি, তিনিই আমাকে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন। তিনি তোমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেছেন; কিন্তু তুমি তো এই অবস্থা ও এই চেহারায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। তোমার অবস্থা খুবই নোংরা, চেহারায় ময়লা, কাপড়গুলো ময়লা ও নোংরা, চুলগুলো বড়বড় ও এলোমেলো; অনেক দিন থেকে কাটা হয় না। অর্থাৎ তুমি এই অবস্থায় আমিরের সাথে দেখা করতে যেতে পারো না। আমি তাঁকে বললাম আল্লাহর শপথ, গোসলখানায় গিয়ে গোসল কার মত সামর্থ্য আমার নেই। আগের যুগে বিভিন্ন জায়গায় বড়বড় গোসলখানা থাকত, মানুষ সেখানে গিয়ে টাকা দিয়ে গোসল করতে হতো। সেখানে ঠান্ডা পানি, গরম পানি উভয়টার ব্যবস্থা থাকত। থাকত সাবান-শ্যাম্পুর ব্যবস্থাও, টাকার বিনিময় মানুষ সুবিধা ক্রয় করে নিত। অর্থাৎ আমার কোনো টাকা নেই যে, আমি তা দিয়ে গোসলখানায় গিয়ে গোসল করবো এবং আমার এমন সামর্থ্যও নেই যে, আমি সেলুনে গিয়ে চুল কাটাবো। তখন লোকটি বললো, ঠিক আছে তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি আসছি। অতঃপর সে আমিরের নিকট ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পর এসে বলল, এই নাও এক হাজার দিরহাম; এটা আমির পাঠিয়েছেন, এটা দিয়ে তুমি তোমার অবস্থার পরিবর্তন করো, তারপর আমার সাথে এসো। তখন আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! এটা বরকতের শুরু মাত্র। সে কিন্তু তখনও জানে না যে, আমির তাঁর কাছ থেকে কী চায়? সে বলে, অতঃপর আমি তাঁর থেকে টাকাগুলো নিয়ে ভাল কাপড় কিনলাম, সেলুনে গিয়ে চুল কাটালাম, গোসলখানায় গিয়ে গোসল করলাম, অতঃপর আমিরের নিকট গেলাম। সে আমাকে দেখে বলে তুমি কি কবি ও সাহিত্যিক আসমায়ি? আমি

বললাম, হাঁ। সে বলল, খলিফা হারুনুর রশিদ নিজ ছেলের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে একজন কবি, সাহিত্যিক ও আলেমের জন্যে আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। আমি মানুষের কাছে জানতে পেরেছি যে, তুমি কবি সাহিত্যিক, পড়তেও পারো লিখতেও পারো। সুতরাং তুমি চাইলে খলিফার ছেলের ব্যক্তিগত শিক্ষক হতে পার। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি রাজি। তখন সে আমাকে বললো, এই নাও তোমার পথের খরচ; তুমি বাগদাদে চলে যাও। সে বলে অতঃপর আমি আমার বাড়িতে ফিরে এলাম এবং সেখানে থাকা আমার সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে নিলাম এবং একজনকে আমার বাড়ি দেখাশুনার দায়িত্বে দিয়ে বাগদাদে চলে গেলাম। অতঃপর আমি বাগদাদে গিয়ে খলিফার সাথে দেখা করলাম। খলিফা আমার আদব-আখলাক, কবিতা ও কবিতার ভাষা-অলঙ্কার দেখে খুবই আশ্চর্য এবং খুশি হলেন।

এই লোকটি দুনিয়ার সবকিছু থেকে নিজেকে পৃথক করে সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ইলমের মজলিসে হাঁটু গেড়ে বসেছিলো এবং নিজ মেহনতে নিজের কথা বলার স্টাইল, কবিতা ও ভাষার প্রচলিত রীতির মধ্যে পরিবর্তন এনেছেন এবং নতুন এক সাহিত্য-রীতি চালু করেছেন। যারা জীবনে পরিবর্তন আনতে চায়, ভাষায় পরিবর্তন আনতে চায় আমি তাদেরকে তাঁর কিতাব পড়তে বলি, তাঁর কাছ থেকে শিখতে বলি।

সে যখন খলিফার সামনে গেলেন, খলিফা তার আদব-আখলাক কবিতা ও কবিতার ভাষালঙ্কার দেখে খুবই বিস্মিত ও খুশি হলেন। এবং তাঁকে বললেন, আমি চাই তুমি আমার ছেলের শিক্ষক হবে এবং তার শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব নিবে। সে বলে, অতঃপর রাজ-প্রাসাদে আমার থাকার জন্যে একটা কামরা ঠিক করা হল এবং আমি শাহজাদাকে পড়ানো শুরু করলাম।

আসমায়ি খলিফার নিকট কয়েক বছর থেকে তাঁর ছেলেকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিল, সে তাকে ভাষা শিখায়, কুরআনুল কারিম হিফয করায়, কবিতা শিখায়। আসমায়ি বলেন, খলিফা আমার জন্যে একটা বেতন নির্ধারণ করেন; কিন্তু বেতনটা ছিলো আমার প্রয়োজনতিরিক্ত, কারণ আমার থাকা-খাওয়াসহ সকল খরচ খলিফার প্রাসাদ থেকেই ব্যবস্থা করা হত। তাই আমি আমার বেতনের টাকা জমা করে বসরায় আমার গ্রামে

পাঠিয়ে দিতাম। এবং সেখানে আমার ছোট বাড়িটির পরিবর্তে বড় একটা বাড়ি ক্রয় করলাম। অতঃপর মানুষজন এসে খলিফার নিকট প্রেরণ করার জন্যে আমার কাছ থেকে বিভিন্ন চিঠি-পত্র এবং আবেদন-দরখাস্ত লিখিয়ে নিত, কারণ আমার ভাষা ছিলো অনেক উচ্চাঙ্গের ও আবেদনপূর্ণ, যার মাধ্যমে তারা খলিফার কাছ থেকে তাদের উদ্দিষ্ট বস্তু হাসিল করতে পারতো আর এজন্যে তারা আমাকে নির্দিষ্ট পরিমাণে কিছু একটা দিত। আমি খলিফার ছেলের গৃহ-শিক্ষক হওয়ার কারণে খলিফার নিকট যেকোন সময় যেতে পারতাম, তাই বিভিন্নজন আমার মাধ্যমে খলিফার কাছে তাদের প্রয়োজনের কথা জানাতো এবং তারা অনেক সময় খুশি হয়ে আমাকে অনেক কিছু দিত। এভাবে আমার অনেক সম্পদ হয়ে গেল আমি তা দিয়ে আমার গ্রামে একটি ফসলের ক্ষেত ও অনেকগুলো বাগান ক্রয় করলাম।

তিনি বলেন, একদিন খলিফা আমাকে বললেন, আমি চাই আমার ছেলে জুমআর খুৎবা দিবে, এটা কি সম্ভব? আমি বললাম, হাঁ অবশ্যই সম্ভব। তখন তাঁর ছেলের বয়স ছিলো সতের-আঠার বছর। আর এটা আসমায়ি তাকে সাত বছর পড়ানোর পরের ঘটনা। সে বলে, আমি শাহজাদাকে একটা খুৎবা মুখস্থ করালাম এবং তাকে বারবার তা অনুশীলন করালাম। অতঃপর এক জুমআর দিন সে মিম্বারে আরোহণ করলো এবং খুৎবা দিল, মানুষ তার খুৎবা শুনে খুবই আশ্চর্য হল। তার খুৎবার প্রতিটি দিকই ছিলো খুবই উঁচু মানের ভাষা বক্তব্য ও বিষয়বস্তু; সবকিছুই চমৎকার সুন্দর। এরপর চার দিক থেকে আমার নিকট সম্পদ আসা শুরু করলো, কারণ মানুষ তখন জেনে ফেলেছে যে, আমি তাকে এতো সুন্দর করে শিক্ষা দিয়েছি।

এরপর একদিন খলিফা আমাকে বলল, হে আবদুল মালেক আল-আসমায়ি! আল্লাহ তাআলা তোমার হায়াতে বরকত দান করুন। আমার ছেলে কুরআন হিফয করেছে, কবিতা ও অলঙ্কার-শাস্ত্র শিক্ষা করেছে, হাদিস শিখেছে এবং এখন সে আমার সভাসদদের একজন। আমি মনে করি তার সাথে আর তোমাকে থাকতে হবে না। এখন তুমি কি আমাদের নিকট থেকে যাবে? তাহলে তোমাকে অভিনন্দন। আর বসরায় ফিরে

যেতে চাইলে যেতো পার। আমি বললাম, আমি বসরায় ফিরে যাব। তখন সে বলল, আমার কাছে তুমি যা ইচ্ছে তাই চাইতে পরো, আমি তোমাকে তা দিব। আমি বললাম, আল্লাহ আপনার হায়াতে বরকত দান করুন, বসরার আমার বাড়ি আছে, বাগান আছে, আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। তখন তিনি বললেন, না বরং আমি তোমাকে এই উট ও গবাদি পশুগুলো দিচ্ছি। অতঃপর সে আমার সাথে অনেকগুলো উট ও গবাদি পশু দেওয়ার আদেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন তোমার কোনো ইচ্ছে থাকলে আমাকে বল। আমি বললাম, ঠিক আছে আমার একটা আকাঙ্ক্ষা হল, আপনি বসরার আমির মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল-হাশেমিকে একটা চিঠি লিখে পাঠাবেন যে, সে যখন আমার আগমনের কথা শুনবে তখন নিজ লোকজন নিয়ে আমাকে অভিনন্দনের জন্যে এগিয়ে আসবেন এবং বসরার সকল লোক তাঁর প্রাসাদে তিন দিন আমাকে সালাম করবে ও অভিনন্দন জানাতে আসবে। অর্থাৎ তিনি নিজের জন্যে কিছুটা সম্মান কামনা করলেন। খলিফা বসরার আমিরের নিকট চিঠি পাঠাল। অতঃপর বসরার আমির মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল-হাশেমি লোকজন নিয়ে আসমায়ির আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলো। এরপর যখন তারা আসমায়ির আগমনের কথা শুনতে পেল, তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে শহরের বাইরে এলো এবং তাঁকে যথাযথ সম্মান করে অভিনন্দন জানাল। মানুষজন তাঁর অপেক্ষায় ছিল। আমিরের কাছ থেকে তিনি তাঁর প্রাসাদে চলে এলেন, সেখানে প্রথম দিন বসরার বড়বড় ব্যবসায়ী এবং সম্মানিত লোকজন তাঁকে অভিনন্দন ও সালাম জানাতে আসলো। এর পরের দিন তাদের চেয়ে যারা নিম্ন পর্যায়ের তারা তাঁকে অভিনন্দন ও সালাম জানাতে আসলো। আর তৃতীয় দিন সাধারণ মানুষ তাঁকে অভিনন্দন এবং সালাম জানাতে আসল।

আসমায়ি বলেন, মানুষ যখন আমাকে সালাম করছে এবং অভিনন্দন জানাচ্ছে, তখন আমি তাদের মধ্যে এক লোককে দেখলাম খুবই জীর্ণশীর্ণ পোশাকে, মুজা ব্যতীত শুধু চটি জুতা পরে আমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে, যার চেহারা থেকেই দরিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট। সে যখন আমার কাছে আসলো এবং আমাকে সালাম করে বলল, হে আবদুল মালেক! অর্থাৎ সে আমাকে কোনো ধরনের উপাধি ছাড়াই আমার নাম ধরে

ডাকল। আমি একথা শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম, কারণ খলিফা ব্যতীত কেউ আমাকে কোনো খেতাব ছাড়া শুধু আমার নাম ধরে ডাকে না। সুতরাং তার ডাক শুনে আমার খলিফার কথা মনে পড়ে গেল, কারণ খলিফা আমাকে শুধুমাত্র আবদুল মালেক বলে ডাকতেন। শাহজাদার শিক্ষক ফযিলাতুশ শায়খ এধরনের কোনো লকব ব্যতীত শুধু আবদুল মালেক বলেই ডাকতেন।

সুতরাং তখন আমি তার দিকে তাকিয়ে তাকে চিনতে পারলাম এবং তাকে আমি বললাম, তুমি কি সেই সব্জি-বক্রেতা নও?সে বললো, হাঁ। আমি বললাম, তোমকে করা আমার সেই নসিহত কি তোমার মনে আছে যে, আমি তোমাকে বলেছিলাম, 'তোমার সকল কিতাব একত্র করে একটি বড় বালতির মধ্যে রেখে তার উপর পানি ঢালো এবং আমরা দেখবো তার থেকে কোন রং বের হয়? তার রং কি লাল, নীল না কালো? তোমার কি সেই নসিহত মনে আছে? সে বললো, হাঁ আমার মনে আছে। আমি বললাম, হাঁ আমিও তোমার কথামতো আমল করেছি, আমি আমার সকল কিতাব নিয়েছি, সেগুলো পড়েছি এবং বারবার পড়ে আয়ত্ত করেছি, অতঃপর তা মুখস্থ করে আমার অন্তরের মধ্যে রেখে দিয়েছি, অতঃপর তার উপর আমার আগ্রহ ঢেলে, আমার সময়কে হেফাযত করে তা বারবার পড়েছি এবং যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি। অতঃপর সেখান থেকে যা বের হয়েছে তা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছো। আল্লাহ তাআলা আমাকে এর বিনিময়ে দুনিয়াতে এই মর্যাদা দান করেছেন আর আখেরাতের মর্যাদা তো আছেই।

হাঁ, ইলম মানুষকে আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই একবার সম্মান দান করে। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাঁদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন।'[১]

অনেক উলামায়ে কেরাম বলেন এখানে (دَرَجَاتٍ) মর্যাদা দ্বারা উদ্দেশ্য হল আখেরাতের মর্যাদা এবং সাথে সাথে দুনিয়ার মর্যাদাও উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা তাঁদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি কর দেন, কারণ তাঁরাই হল দেশের প্রধান সম্পদ। আসমায়ি যদি কবিতা, ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করা; ভাষা ও সাহিত্যে তার সমসাময়িক অন্য সকলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর এতো মর্যাদা হয়ে থাকে, তাহলে তোমার কি মনে হয় যাঁরা কুরআন, হাদিস ও ফিকহ আয়ত্ত করবে এবং মানুষের মাঝে ফাতওয়া দিবে, পরস্পরের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের মীমাংসা করবে তাঁদের মর্যাদা কতটা উপরে হবে? নিঃসন্দেহে সেটা তো আরো উত্তম; আরো মর্যাদাবান, কারণ একজন ইমাম, একজন ফকিহ– কবি ও সাহিত্যিকের চেয়ে অনেক অনেক উত্তম।

লোকটি আসমায়ির সামনে এসে দাঁড়াল, আর তখন তিনি তাকে বললেন, হাঁ আমি তোমার কথামতো আমল করেছি, আমি আমার সকল কিতাব নিয়েছি, সেগুলো পড়েছি এবং বারবার পড়ে আয়ত্ত করেছি। অতঃপর তা মুখস্থকরে আমার অন্তরে স্থান দিয়েছি এবং এর উপর আমার সমস্ত ইচ্ছা-আগ্রহ ঢেলে,আমার সময়কে হেফাযত করে বারবার তা পড়েছি এবং কঠোর পরিশ্রম করেছি।

অতঃপর সেখান থেকে যে রত্ন বের হয়েছে তা তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ। আল্লাহ তাআলা আমাকে এর বিনিময়ে দুনিয়াতে এই মর্যাদা দান করেছেন আর আখেরাতের মর্যাদা তো আছেই। তখন সব্জি-বিক্রেতা তাঁকে বলল, আমি তোমার কাছে একটি কাজ চাচ্ছি, আশা করি তুমি আমাকে একটা কাজ দেবে। তোমার সকল কিতাব একত্র করে আমাকে দাও, আমি তার বিনিময়ে তোমাকে কিছু সব্জি দেব; একথা বলার পরিবর্তে লোকটি তাঁকে বলছে, তোমার কাছে আমাকে একটা কাজ

---

১. সুরা মুজাদালাহ, আয়াত : ১১

দাও। আসমায়ি বলেন, আমি তখন তাকে আমার একটা বাগানের প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করলাম।

হে ভাই! আপনাদের সকলের প্রতি আমার একটা বার্তা হল।

لاتحسبن المجد تمرا أنت آكلهلن تبلغ المجد حتي تلعق الصبرا

'তুমি খেজুর চিবিয়ে খেতে পারাকে মর্যাদার মনে করো না। তুমি যতক্ষণ তোমার ধৈর্যকে চেটে খেতে না পারবে, ততক্ষণ মর্যাদার আসনে পৌঁছতে পারবে না।'

সুতরাং যে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়, তাকে অবশ্যই কোনো একটা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এবং সে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে তার সামর্থ্যের পুরোটা দিয়ে ধৈর্যের সাথে মেহনত করতে হবে। হোক তার লক্ষ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে চূড়ায় পৌঁছবে অথবা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বা ইলমের ক্ষেত্রে। তার লক্ষ্য যেটাই হোক তাকে চূড়ান্তভাবে মেহনত করে সে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে; তাহলেই সে ঐ বিষয়ের চূড়ায় পৌঁছতে পারবে।

হে ভাই, তুমি আজ যে হাফেযে কুরআনকে দেখো, মানুষ যার তেলাওয়াত শুনার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে; যে দায়িকে দেখো, মানুষ ভালবেসে তাঁদের দাওয়াত দেয়; তাঁদের সম্মান করে। যে বক্তাকে দেখো, মানুষ তাঁদের বয়ান শুনার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে এসে ভিড় জমায়, তারা কিন্তু এমনি এমনি এই স্তরে এসে পৌঁছাই নি; বরং এই স্তরে পৌঁছার জন্যে তাঁদের অনেক কষ্ট ও মেহনত-মুজাহাদা করতে হয়েছে, তারপরেই তাঁরা এই স্তরে এসে পৌঁছেছে। আসমায়ি নিজ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে। সে এর জন্যে অনেক মেহনত করেছে, অনেক সকালে ঘুম থেকে উঠেছে এবং রাত্রে দেরিতে ঘুমাতে গিয়েছে, তার বেশিরভাগ সময়ই ইলম অর্জনের পিছনে ব্যয় করেছে এবং পড়ালেখার কাজে প্রায় পুরো সময়টাই ব্যয় করেছে। এর জন্যে ধৈর্যের সাথে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে। নিজেকে অনেক প্রিয় চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত থেকেছে। মানুষের ঠাট্টা-উপহাস সহ্য করে ইলমের পিছনে লেগে থেকেছে। তারপরেই তো সে নিজ লক্ষ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে

Contents

পেরেছে। আর আমরা এতো বছর পরও এই আসমায়িকে চিনি। তাঁর কথা আলোচনা হলে আমাদের অনেকেই তাঁকে চিনতে পারি।

সুতরাং, আমরা যদি তাঁর মত কোনো বিষয়ের চূড়ায় পৌছতে চাই তাহলে আমাদেরও তাঁর মত মেহনত-মুজাহাদা করতে হবে, এবং দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে। কেউ যদি শিক্ষা অর্জন করতে চায়, আলেম হতে চায়, ফকিহ্ হতে চায় বা অন্য কিছু হতে চায় তাহলে তাকেও তাঁর মত কোনো দিকে না তাকিয়ে লক্ষ্যপানে ছুটে যেতে হবে। সফল লোকদের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে হবে এবং এমন লোকদের সাথে চলতে ও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে যাঁরা তাকে তার লক্ষ্যে পৌছতে উৎসাহ দিবে; তার মনোবলকে কখনই ভেঙ্গে দিবে না।

আল্লাহ তাআলার নিকট এই কামনা করি যে, তিনি আমাদেরকে কল্যাণ দান করবেন। এবং এসকল ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফিক দান করবেন! নিশ্চয় ঘটনা সমূহের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা।

ভয় ও আশার মধ্যে থাকতে হবে

'সে কি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবে?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের এই প্রশ্ন করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. হাওয়াজিনের যুদ্ধের মধ্যে রয়েছেন। হাওয়াজিন গোত্রের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়। এই মাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এদিক ওদিক যুদ্ধে নিহত মানুষের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে আছে। হাওয়াজিন গোত্রের নারী ও শিশুদের বন্দি করা হয়েছে। বন্দিদের সাথে কীধরনের আচরণ করা হবে সে বিষয়টা এখানো সিদ্ধান্ত হয়নি। বন্দি নারী ও শিশুদের মাঝে একটি মহিলা পাগলের মত দৌড়াচ্ছে এবং প্রতিটি শিশুর চেহারার দিকে তাকাচ্ছে।

যেখান থেকেই কোনো শিশুর কান্নার আওয়ায আসছে, সেদিকেই সে দৌড়ে যাচ্ছে, কোনো মহিলার কোলে কোনো শিশুকে দেখলে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে তার চেহারা দেখে নিচ্ছে। একবার এক মহিলার কোলে একটি শিশুকে দেখে দৌড়ে তার কাছে যায় এবং তার কাছ

থেকে শিশুটিকে নিয়ে ভাল করে দেখে আবার তার কাছে ফিরিয়ে দেয়। যে কেউ মহিলাটির এই অবস্থা দেখলে বুঝতে পারবে যে, মহিলা কোলের শিশুকে খুঁজে পাচ্ছে না, সে তাকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে অস্থির। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাটির এই অবস্থা দেখছিলেন।

অনেক খোঁজা-খুঁজির পর মহিলাটি বাচ্চাটিকে পেল, সে তাকে কাছে পেয়েই দুই হাত দিয়ে বিছুক্ষণ বুকের সাথে জাড়িয়ে ধরে রাখলো, অতঃপর তাকে খুব আগ্রহ নিয়ে বুকের দুধ পান করালো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের প্রতি মায়ের এই দয়া, দরদ ও মমতা দেখে সাহাবায়ে কেরাম রা. কে প্রশ্ন করে বললেন, এই মহিলাটি কি তার এই সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে? সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে তাকে কখনই আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে না। সে তাকে কীভাবে আগুনে নিক্ষেপ করবে? সে তাকে কোলে নিয়েছে, বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে তাকে দুধ পান করিয়েছে। সে তাকে অনেক ভালবাসে, সবকিছুর চেয়ে বেশি মুহাব্বত করে। সুতরাং সে তাকে কিছুতেই আগুনে নিক্ষেপ করতে পরবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বললেন :

‘ঐ সত্তার কসম করে বলছি, নিশ্চয় এই ছেলের প্রতি এই মায়ের যতটা দয়া ও ভালবাসা রয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে তার চেয়েও বেশি ভালবাসেন ও দয়া করেন।’

নিশ্চয় বন্দার প্রতি আল্লাহ তাআলা এই ছেলের প্রতি মায়ের চেয়েও বেশি দয়ালু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের এ ধরনের বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার উদাহরণ দিয়ে বিভিন্ন বিষয় বুঝাতেন। কখনো কখনো বাস্তব উদাহরণ দিয়ে তাঁদেরকে সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন, আবার কখনো কোনো নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। সুতরাং এখানে তিনি সাহাবিদেরকে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে একথা বুঝাচ্ছেন যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি এই মায়ের চেয়েও বেশি দয়ালু, তাই তোমরা কখনো তাঁর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না। তিনি বলেন :

Contents

'ঐ সত্তার কসম করে বলছি, নিশ্চয় এই ছেলের প্রতি এই মায়ের যতটা দয়া ও ভালবাসা রয়েছে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে তার চেয়েও বেশি ভালবাসেন ও দয়া করেন।'

আর এ কারণেই সালাফদের মধ্য থেকে কেউ একজন বলেছেন, আমাকে যদি আল্লাহ তাআলা এই সুযোগ দেন যে, তুমি আল্লাহ অথবা তোমার মা এই দুই জনের যাকে দিয়ে খুশি তোমার (পরকালের) হিসাব নেওয়াতে পারো, তাহলে আমি আল্লাহ তাআলাকেই আমার হিসেবের জন্যে বেছে নিব, কারণ তিনি আমার মায়ের চেয়েও আমার প্রতি বেশি অনুগ্রহশীল।

এ বিষয়ে অন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি, আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আমরা একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে িলাম, এমন সময় অতিশয় বৃদ্ধ এক লোক আসলো, বয়সের ভারে যার রীরের হাড্ডিগুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, পিঠ বাঁকা হয়ে গিয়েছিল, এবং তার মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গিয়েছিল, এই লোকটি তিন পায়ের উপর ভর করে আসলো, অর্থাৎ তার দুই পা ও এক লাঠির উপর ভর করে হাঁটছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এমন এক বৃদ্ধ এসে দাঁড়ালো, বয়সের ভারে যার চোখের ভ্রূগুলো ঝুলে পড়েছে। লোকটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলল, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি এমন লোকের ব্যাপারে কী বলেন, যে সব ধরনের গুনাহ করেছে; কোনো গুনাহই ছাড়ে নাই? তার মন যা চেয়েছে সে তাই করেছে। তার অপরাধ ও গুনাহগুলো যদি পৃথিবীর সকল মানুষকে ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলেও তাদের সকলকে তা ঢেকে নিবে। এই লোকটির কি তাওবার কোনো সুযোগ আছে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং বললেন, আপনি কি ইসলাম গ্রহণ করেছেন? লোকটি বলল, হাঁ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আপনার সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। সে বলল, আমার প্রতারণা ও আমার পাপ কাজগুলো সবই কি ক্ষমা করা হয়েছে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ আপনার প্রতারণা ও পাপ কাজগুলোর সবই ক্ষমা করা হয়েছে। এরপর লোকটি তার লাঠির

উপর ভর করে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলতে বলতে চলে গেল। লোকটি অনেক দূর যাওয়া পর্যন্ত আমরা তাঁর তাকবিরের আওয়ায শুনছিলাম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সুসংবাদদাতা; তিনি নিরাশকারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন নমনীয়; তিনি কঠোর বা অনমনীয় ছিলেন না। তিনি মানুষকে আল্লাহর রহমতের আশা দেখাতেন। তিনি মানুষের পথ থেকে দয়া ও আশার দরজা বন্ধ করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

'নিশ্চয় তোমরা সহজকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছো; কঠোরতা আরাপকারী হিসেবে নও।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়ায ইবনে জাবাল ও আবু মুসা আশআরি রা. কে ইয়ামানে পাঠান, তখন তিনি তাদেরকে বলেন;

'তোমরা মানুষকে সুসংবাদ দিবে, আশা দেখাবে; কখনো উপেক্ষা করে নিরাশ করবে না।,

অর্থাৎ তোমরা মানুষকে সুসংবাদ দাও, তাদেরকে আল্লাহর দয়া, রহমত ও মুমিন বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালবাসার কথা বলবে। তাদেরকে নিরাশ করবে না দূরে ঠেলে দিবে না। তাদের সাথে নরম ও সহজ ব্যবহার করবে; কখনো কঠোর ও শক্ত ব্যবহার করবে না। তাদের সাথে নরম ও দয়ার সাথে কথা বলবে; কখনো মতানৈক্যে যাবে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মানুষ নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী রয়েছে। অর্থাৎ এমন মানুষ রয়েছে যারা মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, তাদেরকে ভয় দেখিয়ে দীন থেকে ফিরিয়ে রাখে।

কিন্তু হাদিসে উল্লিখিত আতঙ্ক সৃষ্টিকারী বলে কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? তোমরা প্রথমে শুনে রাখো যে, এখানে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী বলে কাকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, অতঃপর নিজেদের উপর তা যাচাই করে দেখো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী রয়েছে, সুতরাং তোমাদের যারা জনগণের দায়িত্বরত থাকবে তারা যেনো তাদের সাথে সহজ ব্যবহার করে।'

অনেক মানুষ আছে যারা লম্বা-চূড়া সালাত আদায় করে; কিন্তু লম্বা-চূড়া সালাত আদায় করেও মানুষ দীনের ব্যাপারে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী হতে পারে, দীন থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে পারে!! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার কী মনে হয়, যে ঠিকমত শ্রমিকের হক আদায় করে না? সে কি আতঙ্ক সৃষ্টিকারী নয়? সে কি মানুষকে দীন থেকে ফিরিয়ে রাখছে না? যে ব্যক্তি অমুসলিমদের সামনে ভ্রূকুটি করে থাকে, তাদের সাথে গোম্বা মুখে কথা বলে, সে কি আতঙ্ক সৃষ্টিকারী নয়? সে কি মানুষকে দীন থেকে ফিরিয়ে রাখছে না? যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করে না, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, হোক সে প্রতিবেশী মুসলিম বা অমুসলিম, সে কি আতঙ্ক সৃষ্টিকারী নয়? সে কি মানুষকে দীন থেকে ফিরিয়ে রাখছে না? যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তাকে তার হক ঠিকমত আদায় করে না, সে কি আতঙ্ক সৃষ্টিকারী নয়? সে কি মানুষকে দীন থেকে ফিরিয়ে রাখছে না? হে ভাই! এর মাধ্যমে ইসলাম নিয়ে কথা বলার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বিরোধী শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। মানুষ দীনকে যত বেশি আঁকড়ে ধরবে, সে ততো বেশি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করবে। আল্লাহর রহমত সুপ্রশস্ত। তবে তোমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা যেমন দয়ালু, ঠিক তেমনিভাবে তিনি কঠোরও।

মুসা আ.-এর সময় বনি ইসরাইলের এক লোকছিলো, যে মুসা আ.কে অনেক কষ্ট দিতো। ফলে মুসা আ. আল্লাহ তাআলার কাছে অভিযোগ করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! এই লোকটা আমাকে অনেক কষ্ট দেয়, আমার দাওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, সব জায়গায় সে আমাকে নিয়ে চিল্লাচিল্লি করে, আমাকে অপমান করে। হে আমার প্রতিপালক! সে আমাকে অনেক কষ্ট দেয়, সুতরাং আপনি তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মুসা! আমি তাকে শাস্তির

ক্ষমতা তোমার হাতে দিয়ে দিলাম; তুমি যখন চাইবে আকাশকে আদেশ করবে, আকাশ তার উপর প্রস্তর-বৃষ্টি বর্ষণ করে তাকে ধ্বংস করে দিবে। অথবা যমিনকে আদেশ করবে, যমিন তাকে গিলে ফেলবে। এরপর কয়েক দিন পর রাস্তায় মুসা আ.-এর সাথে লোকটির দেখা হল আর লোকটি তাঁকে দেখেই গালাগালি শুরু করে দিল। মুসা আ. তখন রাগান্বিত হয়ে যমিনকে বললেন, হে যমিন! তুমি তাকে পাকড়াও করো। তখন যমিন লোকটির টাখনু পর্যন্ত ভিতরে নিয়ে নিলো। তখন লোকটি বলতে লাগলো, হে মুসা! আমি তাওবা করছি, আমাকে রক্ষা করো, আমাকে উদ্ধার করো। মুসা আ. বললেন, যমিন! তাকে পাকড়াও করো। এবার যমিন আরেকটু ফাঁকা হল এবং তার হাঁটু পর্যন্ত ভিতরে নিয়ে নিলো। লোকটি আবার বলল, হে মুসা! আমি তাওবা করেছি আমাকে রক্ষা করো, আমাকে উদ্ধার করো। মুসা আ. বললেন, যমিন! তাকে পাকড়াও করো।

এবার যমিন আরেকটু ফাঁকা হল এবং তার কোমর পর্যন্ত ভিতরে নিয়ে নিল। এরপর বুক পর্যন্ত, আর লোকটি চিৎকার করতেই ছিল, এরপর সম্পূর্ণভাবে তাকে মাটির নিচে নিয়ে গেল আর লোকটি মারা গেল। তখন আল্লাহ তাআলা মুসা আ.-এর নিকট ওহি প্রেরণ করে তাঁকে বললেন, হে মুসা! তোমার হৃদয় এতটা পাষাণ! আমার ইযযতের কসম করে বলছি, সে যদি আমার কাছে সাহায্য চাইতো আমি তাকে সাহায্য করতাম।

আমাদের রব আল্লাহ তাআলা অনেক দয়ালু; কিন্তু তিনি শাদিদুল ইকাব তথা শাস্তি দানে কঠোরও বটে। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুহ আ.-এর সময় তুফানে ডুবে যাওয়া এক নারী ও তার সন্তানের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা মহাপ্রতাপশালী, তিনি যখন অসন্তুষ্ট হন, ক্রোধান্বিত হন।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুহ আ.-এর সময় তুফানে ডুবে যাওয়া এক নারী ও তার সন্তানের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। নুহ আ. আপন প্রতিপালকের নিকট দোয়া করলেন; যেমনিভাবে কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে :

فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝ فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝ وَّ فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُیُوْنًا فَالْتَقَی الْمَآءُ عَلٰۤی اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝ وَ حَمَلْنٰهُ عَلٰی ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّ دُسُرٍ ۝ تَجْرِیْ بِاَعْیُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ۝

'অতঃপর সে তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললো, আমি অক্ষম, অতএব তুমি প্রতিবিধান করো। তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। আমি নুহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে। যা চলতো আমার দৃষ্টির সামনে। যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো এটা ছিলো তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ।'[১]

এভাবেই কুরআনে কারিমে নুহ আ.-এর কওমের ডুবে যাওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অন্য আরেক আয়াতে তুফানটির ভয়াবহতা এভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ

'যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিলো, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম।'[২]

জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে আপনারা সকলেই তো জানেন। যখন জলোচ্ছ্বাস হয় তখন তা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, গাছপালা উপড়ে ফেলে, বাড়িঘর চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়, পথের গাড়ি-ঘোড়াগুলোকে ভাসি নিয়ে যায়, চারপাশের সবকিছুকে শিশুদের খেলানার মত লণ্ডভণ্ড করে দেয়। মানুষজন কাঁদতে থাকে, চিৎকার করতে থাকে, সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে, কেউ গাছের ডালে ঝুলে থাকে, কেউ কারেন্টের খাম্বা ধরে থাকে, কেউ পাহাড়ে উঠে আর পানি তাদের সকলকেই ভাসিয়ে নিয়ে

---

১. সুরা কামার, আয়াত : ১০-১৪

২. সুরা হাক্কাহ, আয়াত : ১১

যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই তুফানকেই 'তাগাল মা' (طَغَى الْمَاءُ। জলোচ্ছ্বাস হয়েছে) দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ

'যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিলো, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম।'[১]

অর্থাৎ যখন জলোচ্ছ্বাস হল তখন আমি তোমাদেরকে নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম, তখন ঢেউ তাকে নিয়ে ডানে বামে কাত করছিলো আর তোমাদের রবই তখন সেটাকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ

যাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় এবং কর্ণ এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী হিসেবে গ্রহণ করে।[২]

অবশ্যই এটা একটা উপদেশবাণী। এখানে অনেক উপদেশ রয়েছে, আমি এখন আপনাদের সামনে সেই ঘটনাটি বর্ণনা করবো।

আমাদের নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নিকট নুহ আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করেন, অতঃপর তিনি এক নারীর ঘটনা বলেন, যে নুহ আ.-এর সম্প্রদায় থেকে বের হয়ে গিয়েছিলো আর তুফান তখন ক্রমশ বাড়ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ[৩]

---

১. সুরা হাক্কাহ, আয়াত : ১১

২. সুরা হাক্কাহ, আয়াত : ১২

Contents

'তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে।,'[১]

অর্থাৎ আসমান বিরামহীনভাবে মুষল ধারে বৃষ্টি বর্ষণ করতে ছিলো, মরুভূমি পাহাড়-পর্বত সব জায়গায় বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিলো। এবং ভূমি ফেটে ঝর্ণার মাধ্যমে পানি বেরুচ্ছিলো। فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে।

যখন তুফান শুরু হল, এক মহিলা নিজ সন্তানকে নিয়ে দৌড়াচ্ছিল আর এদিক সেদিক একটি আশ্রয়স্থলখুঁজছিলো, অতঃপর সে একটি পাহাড় দেখতে পেয়ে সন্তানকে নিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করল। এদিকে পানি বাড়তে বাড়তে একসময় পর্বতচূড়ায় মহিলা পর্যন্ত পৌছে যায়, তারপর শিশুটির মাথা পর্যন্ত পানি চলে আসে, তখন মহিলাটি বাচ্চাকে কোলে নেয়। অতঃপর পানি যখন মহিলাটির বুক পর্যন্ত পোঁছে তখন সে ছেলেকে মাথার উপরে নেয়, অতঃপর পানি যখন মাথা পর্যন্ত পৌছে তখন সে বাচ্চাকে দুই হাতের উপর রেখে উঁচা করে ধরে রাখে এবং পানি বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে মহিলা ও ছেলেকে ডুবিয়ে দেয়। এরপর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা যদি নুহ আ.-এর সম্প্রদায়ের কারো উপর দয়া করতেন, কাউকে রক্ষা করতেন, তাহলে তিনি এই মহিলা ও তার সন্তানকে রক্ষা করতেন; কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন :

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ

'তারা আমার সকল নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিলো। সুতরাং আমি পরাভূতকারী, পরাক্রমশালীর মতো তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম।'[২]

হে ভাই! আমরা জানি আল্লাহ তাআলা দয়ালু, তিনি আমাদের মা-বাবার চেয়েও আমাদের প্রতি দয়াশীল; কিন্তু এই বুঝ যেনো

---

১. সুরা কামার, আয়াত : ১১-১২

২. সুরা কামার, আয়াত : ৪২

আমাদেরকে তাঁর নাফরমানির দিকে নিয়ে না যায়। একজন সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকবে আর বলবে, আল্লাহ তাআলা দয়ালু, তিনি আমাদের মা-বাবার চেয়েও আমার প্রতি দয়াশীল!! একজন ঘুষ খাবে আর বলবে, আল্লাহ তাআলা দয়ালু, তিনি আমাদের মা-বাবার চেয়েও আমার প্রতি দয়াশীল!! একজন অন্যায়ভাবে মানুষের হক মেরে খাবে, তাঁর মাল চুরি করবে, তাঁর মাল জোর করে নিয়ে খেয়ে ফেলবে, তাঁর কাছ থেকে ধার নিবে, পরে আর তা ফেরত দিবে না আর বলবে, আল্লাহ তাআলা দয়ালু, তিনি মা-বাবার চেয়েও আমার প্রতি দয়াশীল!! অসম্ভব। হাঁ, আল্লাহ তাআলা দয়াশীল ও ক্ষমাশীল; কিন্তু তোমার জন্যে আবশ্যক হল তুমি তাঁর নাফরমানির মাধ্যমে তাঁর এই দয়া ও ক্ষমাশীলতাকে প্রতিহত করবে না। আর এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেন, বান্দার জন্যে আবশ্যক হল যে, সে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের আশা করবে এবং সদাসর্বদা এই ভয়ে থাকবে যে, তার মাধ্যমে যেনো আল্লাহ তাআলার কোনো নাফরমানি না হয়ে যায়। আর এ কারণেই নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় গুনাহের পূর্বে ছোট গুনাহ থেকে সতর্ক করেছেন।

খায়বারের যুদ্ধ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিগণ ফিরে আসছেন, পথে এক উপত্যকায় যাত্রা-বিরতি করলেন। এক বালক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতেন ও তাঁর খেদমত করতেন, অতঃপর যাত্রা-বিরতি শেষে তাঁরা যখন সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন বালকটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের পিঠে জিন (আসন) বাঁধতে ছিলো, এমন সময় দূরে কোথাও লুকিয়ে থাকা কাফেরদের অজ্ঞাত একটি তীর এসে বালটির শরীরে বিদ্ধ হল আর তখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। তখন সাহাবায়ে কেরাম তাকবির দিয়ে উঠলেন এবং বললেন, আল্লাহু আকবার! জান্নাতে তাঁকে স্বাগতম! শহিদ হিসেবে তাঁকে স্বাগতম! একজন বালক ছেলে বাড়ি-ঘর, পিতা-মাতা ত্যাগ করে এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতরত অবস্থায় কাফেরের তীরের আঘাতে শহিদ হয়েছে!! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন :

'কখনই নয়! আল্লাহর শপথ সে গনিমতের মাল থেকে যে চাদর চুরি করেছে তা তার উপর জাহান্নামের আগুন জ্বালিয়ে দিবে।'

অর্থাৎ গণিমতের মাল বণ্টন করার পূর্বে সে যে চাদরটি কারো কাছে না বলে নিয়ে নিয়েছে, কবরে তা তার উপর জাহান্নামের আগুন জ্বালিয়ে দিবে, এ কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক লোক একটি বা দুইটি জুতা বা জুতার ফিতা নিয়ে এলো এবং তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই নিন, এগুলো আমি গনিমতের মাল থেকে নিয়েছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন :

'একটি জুতার ফিতাও জাহান্নামের অংশ অথবা দুইটা জুতার ফিতাও জাহান্নামের অংশ।'

এ সকল ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলার ব্যাপক দয়া, রহমত ও মাগফিরাতের কথা; এজন্যে আলোচনা করা হয়েছে যাতে করে বান্দা তার রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

'বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম-অবিচার করেছো তোমরা আল্লাহররহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'[১]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার রহমত ব্যাপক ও বিস্তৃত; কিন্তু আমাদের এটাও মনে রাখতে হাবে যে, তিনি শাস্তিদানে প্রবল ও কঠিন। সুতরাং তাঁর রহমতের অধিক আশা আমাদের যেনো তাঁর নাফরমানির দিকে

---

১. সুরা যুমার: ৫৩

নিয়ে না যায়। অর্থাৎ আমাদের এ দুইটা তথা– আল্লাহর রহমত ও তাঁর কঠোরতা উভয়টার মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহর রহমতের আশার বাণীও শুনাতে হবে, সাথে সাথে তাকে আল্লাহর শাস্তির ভয়ও দেখাতে হবে। যেমন এক লোক আল্লাহর নাফরমানি করতে করতে নিজের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, সে বলছে– আমি এতো গুনাহ করেছি যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে আর মাফ করবেন না। তখন তাকে আল্লাহর রহমতের কথা শুনাতে হবে, ঐ মহিলার কথা বলা হবে যার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বলেছিলেন, সে কি তার এই ছেলেকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারবে? ঐ বৃদ্ধের ঘটনা শুনাতে হবে যে লাঠির উপর ভর করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিল, এবং সে বলেছিলো, আমার প্রতারণা ও পাপাচারও কি ক্ষমা করা হবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, হাঁ আপনার প্রতারণা ও পাপাচারও ক্ষমা করা হবে। সাথে সাথে আমরা যদি এমন লোক দেখি, যে এই বলে বলে আল্লাহ তাআলার নাফরমানিতে লিপ্ত হচ্ছে– আল্লাহ তাআলা তো গফুরুর রহিম। এই লোককে বনি ইসরাইলের সেই নারী ও তার শিশুর ঘটনা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম বালকের ঘটনা শুনাতে হবে।

আল্লাহ তাআলার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাদের সকলকে তাঁর রহমতের চাদরে আচ্ছাদিত করুন এবং আমাদের সকলঅপরাধ ক্ষমা করুন, এবং আমাদেরকে হকের উপর অটল-অবিচল রাখুন। আমিন।

জাহাজ-ভ্রমণকারী দল

এখন আপনাদের সামনে জাহাজে ভ্রমণকারী একটি দল সম্পর্কে আলোচনা করবে; কিন্তু কারা এই জাহাজে ভ্রমণকারীগণ? তাঁরা কি ঐদল যাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাঁদের একদল জাহাজের উপরের তলায় ছিলো, অপর দল ছিলো নিচ-তলায়? না-কি তারা হল ইউনুস আ. কে জাহাজ থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপকারী দল? না আমি এদের সম্পর্কে আলোচনা করবো না।

আমরা এখন অপর একটি জাহাজে ভ্রমণকারী দল সম্পর্কে আলোচনা করবো। আমরা এখন আলোচনা করবো, মুসলমানদের প্রথম সমুদ্র-ভ্রমণ সম্পর্কে। এখন প্রশ্ন হল সেই ভ্রমণে কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরিক ছিলেন না-কি ছিলেন না? তাঁদের সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন? তাঁরা কেনো জাহাজে ভ্রমণ করেছিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়েই আমাদের সামনের আলোচনা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জন্যে যখন মক্কায় জীবন যাপন সংকীর্ণ হয়ে গেল; বেলাল রা. কে অমানুষিক নির্যাতন করা হচ্ছে, আম্মার রা. ও তাঁর পরিবারের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তুমি একবার সেই দৃশ্য অনুধাবন করার চেষ্টা করো যখন কুরাইশরা মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে। দুর্বল অসহায় ও গরিব সাহাবিগণই এই নির্যাতনের বেশি শিকার হচ্ছে। কাউকে খেজুর গাছের সাথে বেঁধে নির্যাতন করা হচ্ছে। কারো উপর জলন্ত অঙ্গার ঢেলে দেওয়া হচ্ছে; চাবুকের আঘাতে কারোকারো শরীরের চামরা তুলে ফেলা হচ্ছে; প্রচণ্ড গরমের সময় উত্তপ্ত মরুভূমির উপর ফেলে কারো উপর পাথরচাপা দেওয়া হচ্ছে। এমন নির্যাতন সহ্য করা কোনো মানুষের পক্ষে কি সম্ভব!? আহ!! কী অমানুষিক নির্যাতন!

সাহাবিদের এই কঠিন আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ও তার আশেপাশে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুঁজছিলেন, যেখানে হিজরত করে সাহাবায়ে কেরাম রা. কুরাইশদের এই পাশবিক নির্যাতন থেকে বাঁচতে পারবেন এবং একটু স্বস্তির সাথে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করতে পারবেন। এভাবে একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিদের বললেন, হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়) একজন বাদশাহ রয়েছেন, যার কাছে কেউ যুলুমের শিকার হয় না। সুতরাং তোমরা তার কাছে যাও। তখনই সাহাবায়ে কেরামের একটি দল সফরের জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিলো নারী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় আশি জনের মত। তাঁরা দূরবার্তী এক অচেনা দেশ হাবশায় যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

তাঁরা এমন এক দেশের উদ্দেশ্যে বের হল যেখানে তাঁরা ইতঃপূর্বে কখনো যায়নি, যার মাটি কখনো মাড়ায়নি, যার ভাষা তাঁরা বুঝে না। তা সত্ত্বেও তারা সেই দেশের উদ্দেশ্যে বের হল, অতঃপর সেখানে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিল।

হাবশার বাদশাহ নাজাশি ছিলেন খুব ন্যায়পরায়ণ একজন বাদশাহ। মুসলিম এই মুহাজির দলটি যখন হাবশায় পৌছে তখনও তিনি মুসলমান হননি। জাফর ইবনে আবু তালিব রা.-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ যখন তার সামনে এসে দাঁড়াল, তার সাথে কথা বললো, তাকে কুরাআন তেলাওয়াত করে শুনাল, ইসলামের দাওয়াত দিল, ইসা আ. সম্পর্কে কথা বললো, ইসা আ.-এর ব্যাপারে মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে বললো, এবং তাকে সুরা মারইয়ামের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে শুনালেন। বাদশাহ নাজাশি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা আমার দেশে যেখানে খুশি সেখানে থাকতে পারবে। এটা এক দীর্ঘ আলোচনা; আমরা এখন সে আলোচনায় যাব না। বরং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হল জাহাজে ভ্রমণকারী দল।

জাহাজে ভ্রমণকারী দল দ্বারা আমরা ঐসকল সম্মানিত সাহাবিদের কথা বলতে চাচ্ছি যারা ইসলামের জন্যে সর্বপ্রথম নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে হাবশায় হিজরত করেছেন এবং হিজরতের পথে জাহাজে আরোহণ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন। তাঁরা সেখানে সাত-আট বছর কাটালেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনায় এলেন তখনও তাঁরা হাবশাতেই অবস্থান করছেন। তাঁদেরকে তখনও মদিনায় আসতে বলা হয়নি। সপ্তম হিজরিতে হাবশায় তাঁদের অবস্থানের পনের বছর পূর্ণ হল। তাঁদের মধ্যে যারা যুবক ছিলো তাঁরা বৃদ্ধ হয়ে গেল, বাচ্চারা যুবক হল এবং শিশুরা যুবক হয়ে গেল এবং নতুন অনেক শিশুর জন্ম হল। সপ্তম হিজরিতে তাঁদের হাবশা থেকে মদিনায় ফিরে আসার জন্যে বলা হল।

উম্মে খালেদ বিনতুল আ'স রা. হাবশায় জন্ম নেওয়া শিশুদের একজন। মদিনায় ফিরে আসার সময় তিনি ছোট মেয়ে। একদিন রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কারুকাজ করা একটা কাপড় হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো, তখন তিনি বলেন, উম্মে খালেদকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তাঁকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আনা হলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাকে পোশাকটি পরিধান করালেন, এবং তিনি কারুকাজের দিকে ইশারা করে বললেন : هذا سنا يا أم خالد هذا سنا

(অর্থাৎ হে উম্মে খালেদ! এটা খুব সুন্দর) তিনি এটা হাবশার ভাষায় বললেন,কারণ উম্মে খালেদ হাবশায় জন্ম নিয়েছেন। সেখানকার ছোট ছোট শিশুদের সাথে মিশেছেন, খেলা করেছেন, একারণে আরবির চেয়ে হাবশার ভাষা বেশি বুঝতেন, তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হাবশার ভাষায় বললেন হে উম্মে খালেদ! এটা ছিন্নান (অর্থাৎ এটা খুব সুন্দর)।

খায়বার বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের হাতে অনেক গনিমত আসলো। এর মাধ্যমে দীর্ঘ অভাব অনটনের পর তাঁদের মধ্যে কিছুটা স্বচ্ছলতা আসল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হাবশায় হিজরতকারী সাহাবিদের আনার জন্যে লোক পাঠালেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সারা দিয়ে তাঁরা হাবশা থেকে দ্বিতীয়বার মদিনায় হিজরত করে চলে আসলেন। তারা যখন মদিনায় আসলেন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক খুশি হলেন। বিশেষ করে জাফর ইবনে আবু তালেব রা.কে পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি জাফর ইবনে আবু তলেব রা.কে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর দুই চোখের মাঝখানে চুমু খেয়ে বললেন, তুমি চেহারায় ও চরিত্রে আমার মত হয়েছো।

জাফর রা.-এর ইন্তেকালের পর তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস রা. আবু বকর রা.কে বিয়ে করেছেন। একদিন তিনি উম্মুল মুমিনিন হাফসা বিনতে ওমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর সাথে দেখা করতে আসলেন। ওমর রা.ও তখন মেয়ের নিকট এসেছেন। ওমর রা. সালাম দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে আসমা রা.কে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে মেয়ে আমার! তোমার কাছে ইনি কে? হাফসা রা. বললেন, আসমা

বিনতে উমাইস। ওমর রা. বললেন, সমুদ্রে ভ্রমণকারিণী? সে বললো, হাঁ। ইনি কি হাবশি? সে বললো, হাঁ। ওমর রা. তখন তাঁকে দুষ্টুমি করে বললেন, আমরা তো তোমাদের পূর্বেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করেছি। একথা শুনে আসমা রা. রেগে গেলেন এবং বললেন, আপনারা আমাদের পূর্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হিজরত করেছেন? তিনি তো আপনাদের অসুস্থদের উপর দয়া করেছেন, ক্ষুধার্তদের খাবার দিয়েছেন, দুর্বলদের সাহায্য করেছেন। আর আমরা অচেনা দূরদেশ হাবশায় হিজরত করেছিলাম। আল্লাহর শপথ, আমি এটা আল্লাহর রাসুলের নিকট না জানিয়ে চুপ হবো না।

আসমা রা. তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ওমর রা. আমাকেবলেছেন, তাঁরা আপনার সাথে আমাদের পূর্বে হিজরত ও জিহাদে শরিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আমার ও আমার স্বামী জাফরের কি কোনো সাওয়াব হবে না? আমরা তো এ-বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়েছি।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হে আসমা! যারা হাবশায় হিজরত করেছে এবং এজন্যে যাঁরা জাহাজে ভ্রমণ করেছে তাঁদের সকলকে জানিয়ে দাও যে, যাঁরা হাবশায় হিজরত করেনি তাঁদের জন্যে একটি প্রতিদান, আর তোমাদের জন্যে দুইটি করে প্রতিদান রয়েছে। তোমরা হাবশায় হিজরতের জন্যে একটি, অতঃপর মদিনায় হিজরতের জন্যে আরেকটি, মোট দুইটি প্রতিদান পাবে। আসমা রা. বলেন, এরপর আমি বাইরে বের হলে, এই হাদিস শুনার জন্যে হাবশায় হিজরতকারীরা দলে দলে আমার কাছে আসলো।

হাবশায় হিজরত ছিলো তখন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ করে সমুদ্র-ভ্রমণ। ঢেউ সর্বদা তাঁদের জাহাজ নিয়ে খেলা করেছে, একবার তা ঢেউয়ের তলে নিয়ে নিয়েছে, একবার উপরে উঠিয়েছে, একবার ডানদিকে, একবার বামদিকে এভাবে প্রতি মুহূর্তই ছিলো তাঁদের ভয় ও আশঙ্কা; এই বুঝি জাহাজ ডুবে গেল, এই বুঝি জাহাজ ডুবে গেল। এছাড়া নারী-শিশু নিয়ে এতো দূরের অচিন দেশে সফর ছিলো খুবই আশঙ্কাজনক। অবশ্যই

Contents

তাঁরা এর জন্যে একটি প্রতিদান বেশি পাবে। আর আল্লাহ তাআলা নেক বান্দাদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

আসমা বিনতে উমাইস রা. দীন হেফাযতের জন্যে হাবশায় হিজরত করেছেন। তিনি শুধু মাত্র স্বামী জাফর রা.-এর অনুসরণের জন্যে হাবশায় হিজরত করেন নি বরং তিনি দীনের হেফাযতের জন্যে স্বামীর সাথে হাবশায় গিয়েছেন। তিনি যখন হাবশায় হিজরত করেছেন তখন একথা বলেননি যে, স্বামীর সাথে হিজরত করলে আমার নেকি হবে, সুতরাং আমি স্বামীর সাথে হিজরত করবো। না, শুধু মাত্র স্বামীর অনুসরণের জন্যেই তিনি হিজরত করেন নি বরং তিনিও দীন হেফাযত করার জন্যে হিজরত করেছেন। যেমনিভাবে তাঁর স্বামী হিজরত করেছেন দীনের হেফাযতের জন্যে।

হাবশা থেকে মদিনায় ফেরার আট-নয় মাস পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর রা.কে রোমানদের (বাইজান্টাইনদের) সাথে যুদ্ধ করার জন্যে মুতায় প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে জাফর রা. শহিদ হন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দিতে চাইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহদের নিকট দূত-মারফত ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি পাঠালেন। এরই ধারাবাহিকতায় হারেস ইবনে উমাইর আল আযদি রা.কে রোমের অনুগত গাসসানার বাদশাহ শুরাহবিল ইবনে আমের আল-গাসসানির নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি চিঠি দিয়ে প্রেরণ করলেন; কিন্তু শুরাহবিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তাবাহককে হত্যা করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌছলে তিনি তখনই এর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে মুজাহিদিনকে প্রস্তুত হতে বলেন এবং যায়েদ ইবনে হারেসা রা.-এর নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের একটি দলকে বসরার দিকে প্রেরণ করেন। আসমা বিনতে উমাইস রা.-এর স্বামী জাফর ইবনে আবু তালিব রা.ও মুতার যদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি সেখানে শহিদ হন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যায়েদ শহিদ হলে জাফর ইবনে আবু তালিব বাহিনীরর দায়িত্ব নিবে আর জাফর শহিদ হলে আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা. বাহিনীর দায়িত্ব নেবে।

তিন হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনী মুতা নামক স্থানে পৌছলো। অন্যদিকে রোমান খৃস্টানরা দুই লক্ষ সৈন্য-সমাবেশ ঘটিয়েছিল। কাফের বাহিনী মুসলিমদের থেকে শুধুমাত্র দুই তিনগুণ বেশিই ছিলো না বরং তাদের সংখ্যা ছিলো মুসলমানদের থেকে অনেক অনেকগুণ বেশি। অর্থাৎ দুই লক্ষ সৈন্যের সামনে মাত্র তিন হাজার সৈন্য। দুই বাহিনীর মধ্যে এক অসম কঠিন যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধ শুরুর কিছুক্ষণ পর যায়েদ রা. শহিদ হলেন, তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মত যুদ্ধের পতাকা হাতে নিলেন জাফর ইবনে আবু তালেব রা.। জাফর রা. অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন, যুদ্ধ যখন তুমুল আকার ধারণ করলো, হঠাৎ জাফর রা.-এর ঘোড়ার পা কেটে দেওয়া হল। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পায়ের উপর যুদ্ধ করতে লাগলেন। অতঃপর তাঁর ডান হাত কেটে গেল, তিনি তখন পতাকা বাম হাতে নিলে, অতঃপর তাঁর বাম হাতও কেটে গেল, তখন তিনি দাঁত দিয়ে কামড়ে পাতাকা উঁচু করে রাখলেন এবং এভাবেই শাহাদাত বরণ করলেন। তখন তার বয়স ছিলো তেত্রিশ বছর। যুদ্ধের পর তাঁর শরীরের নব্বইটি আঘাতের দাগ ছিলো, যার সবক'টিই ছিলো সামনের দিক থেকে। তাঁর শাহাদাতের পর আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা. পতাকা হাতে নিলেন এবং তিনিও শাহাদাত বরণ করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা.-এর শাহাদাতের পর পতাকা নিচে পড়ে রইল।মুসলমানরা তাঁদের পাতাকা না দেখে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগলো, তখন সাবেত ইবনে আকরান রা. পতাকা উঠালেন এবং বললেন মুসলমানগণ তোমরা আমার কাছে এসে জড়ো হও, আমার কাছে এসে জড়ো হও। অতঃপর তিনি বললেন, হে মুসলিমগণ, তোমরা তোমাদের সেনাপতি নির্ধারণ করো। লোকেরা বললো, আপনিই সেনাপতি হন। তিনি বললেন, আমি সেনাপতি হওয়ার উপযুক্ত নই। অতঃপর খালেদ রা.কে সেনাপতি নির্ধারণ করা হল। খালেদ রা. রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। এবং রাতে উভয় বাহিনী নিজনিজ শিবিরে চলে গেল। খালেদ রা. বললেন, এভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কঠিন, আবার এই অবস্থায় ফিরে গেলে যুদ্ধ থেকে পলায়নের অপবাদ আসবে।তাই তিনি আগামীকাল যুদ্ধ চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন

এবং যুদ্ধের পরিকল্পনার মধ্যে পরিবর্তন আনলেন। ডান দিকের সৈনিকদের বাম দিকে নিয়ে এলেন এবং বাম দিকের সৈনিকদের ডানদিকে ও মাঝখানে নিয়ে আসলেন এবং কিছু সৈনিকদেরকে পিছনে পাঠিয়ে এই আদেশ দিলেন যে, যখন যুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করবে তখন তোমরা খুব দ্রুত ময়দানের দিকে ছুটে আসবে। এবং উভয় পাশের পতাকা পরিবর্তন করে দিলেন, সাদা পতাকার স্থানে নীল পতাকা, নীল পতাকার স্থানে হলুদ পতাকা এবং হলুদ পতাকার স্থানে লাল পতাকা। উদ্দেশ্য হল কাফেরদের মনে এই ভীতি সৃষ্টি করা যে, মদিনা থেকে মুসলিমদের সাহায্যে নতুন দল এসে পৌছেছে।

পর দিন যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন কাফেরদের ডান দিকের সৈনিকরা দেখলো তাঁরা নতুন সৈনিকের মুকাবিলা করছে, গতকাল যাদের সাথে লড়াই করেছে এঁরা তাঁরা নয়। বাম দিকের ও মাঝের সৈনিকদের একই অবস্থা হল। এরপর তাঁদের পাতাকাও আগেরটা নেই, তাই তারা এটা বিশ্বাস করে নিল যে, মদিনা থেকে মুসলিমদের সাহয্যে নতুন সৈন্যদল এসে পৌছেছে। এরপর যুদ্ধ যখন শুরু হল তখন পিছনে রেখে দেওয়া রিজার্ভ ফোর্স ময়দানে প্রবেশ করল। এতে কাফেরদের মনোবল আরো ভেঙ্গে গেল। তারা ভাবতে লাগল মাত্র তিন হাজার সৈন্যের মুকাবিলা করতে গিয়েই আমাদের যে অবস্থা হয়েছে! তাহলে নতুন সৈন্য আসলে আমাদের অবস্থা কী হবে? যুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করলো, মুসলিমগণ মনোবল হারা কাফেরদের একের পর একহত্যা করতে লাগলো। মুসলিমদের মধ্য থেকে মাত্র বার জন শহিদ হলেন আর কাফেরদের অগণিত সৈনিক নিহত হল। রাতে যখন যুদ্ধ শেষ হল আবু সুলাইমান খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. সাহাবিদেরকে মদিনার দিকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এটা তো গেল যুদ্ধের ময়দানের ঘটনা। অন্যদিকে মদিনার অবস্থা হল, নবি কারিম রা. সাহাবিদের ডেকে একত্র করলেন এবং তিনি তাঁদের বললেন, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের বাহিনীর সংবাদ শুনাবো না? তাঁরা বললো, নিশ্চয় শুনাবেন হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যুদ্ধের পতাকা বহন করেছে যায়েদ, সে আক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর শহিদ হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁর মাগফিরাতের দোয়া করো। সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে ক্ষমা করুন ও তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি বলেন, এরপর জাফর যুদ্ধের পতাকা গ্রহণ করেছে এবং আক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর শহিদ হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁর মাগফিরাতের দোয়া করো, সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে ক্ষমা করুন ও তাঁর প্রতি রহম করুন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা. পতাকা নিয়েছে এবং আক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর শহিদ হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁর মাগফিরাতের দোয়া করো, সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর প্রতি রহম করুন। তিনি বলেন, এরপর যুদ্ধের পতাকা বহন করেছে সাইফুল্লাহিল মাসলুল (আল্লাহর নাঙ্গা তলোয়ার) এবং তাঁর হাতে বিজয় অর্জন হয়েছে।

এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর রা.-এর বাড়িতে গেলেন– তাঁর পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে ও তাঁর এতিম সন্তানদের দেখার জন্যে। পিতার সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিলো খুব গভীর। এতিম সন্তান, যারা তাদের বাবার সাথে দীর্ঘদিন হাবশায় থেকেছে, পিতার স্নেহের কোলে তাদের সকাল-সন্ধ্যা হয়েছে। কত সকাল কেটেছে বাবার স্নেহের কোলে দুষ্টমি করে করে, কত দিন বাবাকে নিজ হাতে খায়িয়ে দিয়েছে এবং তাঁর হাতে খেয়েছে, বাবার সাথে পান করেছে, তাঁর সাথে হাসি-মজা করেছে। বাবাকে চুমু খেয়েছে, বাবা তাদের চুমু খেয়েছে, বাবা তাদের কত আদার করেছে, কান্না করলে চোখের পানি মুছে দিয়েছে, মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়েছে, বুকে জড়িয়ে ধরেছে। আর তিনি তো ছিলেন যুবক, যার বয়স এখনও ত্রিশের ঘরেই ছিল। আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর ইবনে আবু তালেবের বাড়িতে আসলেন। বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আসমা রা.

বাড়ির ভিতরের পর্দা ঠিক করে তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি বাড়িতে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। আসমা রা. বলেন, আমার সন্তানরা ছিলো পাখির ছানার মত সুন্দর। তারা এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখে প্রথমে তাদের বাবা মনে করে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো এবং তাঁকে চুমু খেল। আসমা রা. বলেন, আমি তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেপ্রতিদিন গোসল করিয়ে, জামা-কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে রাখতাম এবং তাদের বলতাম, তোমাদের বাবা এসে যেনো তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখতে পায়। আমি প্রতিদিন আটা পিষে রুটি বানাতাম, সন্তানরা আমাকে জিজ্ঞেস করতো, মা! তুমি রুটি বানাচ্ছো কেনো? আমি বলতাম, তোমাদের বাবা আসবেন তাই। আমার সন্তানেরা সত্যিই প্রতিদিন তাদের বাবার জন্যে অপেক্ষা করতো। সুতরাং যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে এলেন তখন তারা মনে করেছে যে, তাদের বাবা এসে গেছে। তাই তারা তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে এবং চুমু খেয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তখন তাদেরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। আসমা রা. বলেন, আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার নিকট কি জাফর সম্পর্কে কোনো সংবাদ পৌঁছেছে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন চুপ ছিলেন, আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করালাম, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট কি জাফর সম্পর্কে কোনো সংবাদ পৌঁছেছে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জাফর শহিদ হয়েছে। সে তখন বলল, তাঁর সন্তানরা কি এতিম হয়ে গেল? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি কি তাদের দরিদ্রতার ভয় করছো? আমি দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের অভিভাকত্বের দায়িত্ব নিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলছিলেন আর কাঁদছিলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন এবং সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা জাফরের পরিবারের নিকট খাবার প্রেরণ করো, কারণ তারা আজ শোকাহত।

এক নারী সাহাবির বীরত্বের গল্প

এখন আমরা এক বীরত্বের গল্প বলবো। এটা খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-এর বীরত্বের ঘটনা নয় এবং এটা নয় ওমর ইবনে খাত্তাব, আবু বকর, উসমান ও আলি রা.-এর বীরত্বের ঘটনা; আমাদের হাবিব সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বীরত্বের ঘটনাও এখন আমি আপনাদের সামনে বলবো না। আজ আমি আপনাদের সামনে এক নারীর বীরত্বের ঘটনা বলবো। ইসলামের জন্যে এক নারীর অবদানের গল্প শুনাবো। যে নারী দীনের খেদমতে কাজ করেছেন, মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন এবং সন্তানদের সঠিক উত্তম আচার-ব্যবহারে বড় করেছেন। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অনেক পুরুষকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ইসলামে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কম নয়। সর্বপ্রথম জমজমের পানি কে পান করেছেন? এবং কে সর্বপ্রথম সাফা-মারওয়ায় সায়ি করেছেন? তিনি একজন নারী; তিনি বিবি হাযেরা রা., নবি ইসমাইল আ.-এর মা। কে সর্বপ্রথম ইসলামে প্রবেশ করেছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইমান এনেছেন? এবং কার অর্থ-সম্পদ সর্বপ্রথম ইসলামের জন্যে ব্যয় হয়েছে? তিনি একজন নারী; আম্মাজান খাদিজা রা.। ইসলামের জন্যে সর্বপ্রথম কার রক্ত ঝড়েছে? ইসলামের জন্যে জান উৎসর্গকারী প্রথম শহিদ কে? তিনি একজন নারী; হযরত সুমাইয়া রা.। সুতরাং ইসলামে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে কম নয়।

আমরা আজ এমন একজন নারীর গল্প বলবো, ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যার বিশেষ অবদান রয়েছে। দাওয়াত-তালিম ও সন্তান লালন-পালনে তাঁর অবদান বিস্ময়কর। আমরা এখন যে মহিয়সী নারীর গল্প বলবো তিনি হলেন উম্মে সুলাইম রা.। উম্মে সুলাইম রা.-এর নাম রুমাইসা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে বলেন: আমি জান্নাতে প্রবেশ করে সেখানে রুমাইসাকে দেখেছি।

Contents

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উম্মে সুলাইম রা. ছিলেন মালেক ইবনে নযরের স্ত্রী। মালেক ইবনে নযর গোত্রের লোকদের সাথে মদিনায় বসবাস করতেন। আনাস ইবনে মালেক ইবনে নযর নামে তার একটি পুত্র সন্তান ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করে আসলেন, তখন উম্মে সুলাইম রা. ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলেন; কিন্তু স্বামী মালেক ইবনে নযর এটা অস্বীকার করে বলল, চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে শামে (লেভেন্ট) চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে খৃস্টান হয়ে বসবাস শুরু করি। উম্মে সুলাইম রা. তাকে বললেন, মূর্তি-পূজা ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করতে আপনার সমস্যা কী? আপনি কেনো ইসলামে প্রবেশ করছেন না? আপনি মূর্তি-পূজা করেন, যা আপনার উপকার বা অপকার কোনোটাই করতে পারে না। মূর্তি-পূজা আপনার কোনো কাজেই আসে না। আপনি একে ডাকলে সে আপনার ডাক শুনতে পাবে না, তার কাছে সাহায্য চাইলে সে আপনার কোনো সাহায্য করতে পারবে না। আপনি কীভাবে পাথর-মূর্তির ইবাদত করেন এবং তার নৈকট্য অর্জন করতে চান?!! আপনার সামনের এই মূর্তি আপনার কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না এবং আপনর কোনো উপকারও করতে পারবে না। সুতরাং আপনি এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনেন এবং শিরিক মুক্তভাবে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করেন।

কিন্তু স্বামী মালেক ইবনে নযর তাঁর এই সত্য আহ্বানে সারা না দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে শামে পালিয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসলেন এবং ইসলাম সেখানে মজবুতভাবে খুটি স্থাপন করল। একদিন উম্মে সুলাইম রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছেলে আনাস ইবনে মালেক ইবনে নযর রা.কে নিয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাদের সাথে জিহাদ করতে পারি না এবং আমার এমন সম্পদও নেই যা আমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবো; কিন্তু এই আমার ছেলে আনাস আমার বুকের ধন, আমার সম্পদ, তাকে আমি আপনার খেদমতে পেশ করছি, আপনি তাকে গ্রহণ করে আমাকে ও তাকে ধন্য

করুন। উম্মে সুলাইম রা. ছিলেন খুবই বদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ একজন নারী, তিনি চাচ্ছিলেন যে, ছেলে আনাসের শিক্ষা-দীক্ষা ও তরবিয়তের দায়িত্ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থাকবে। তখন আনাস রা.-এর বয়স ছিলো মাত্র নয় বছর। অর্থাৎ তিনি চাচ্ছিলেন যে, ছেলে আনাস শিক্ষা-দীক্ষা সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করুক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল, তিনি আদরের সাথে মুহাব্বত করে বাচ্চাদের প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দিতেন। উদাহরণসরূপ এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করছি, আমর ইবনে সালামা রা. বলেন, আমি তখন ছোট্ট বাচ্চা ছিলাম, একদিন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খানা খাচ্ছিলাম, তখন আমার হাত প্লেটের এখান সেখান ঘোরাঘুরি করছিল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাকে বলেন,

হে বালক 'বিসমিল্লাহ' বলে খাবার শুরু করো, ডান হাত দিয়ে খাবার খাও, এবং নিজের পাশ থেকে খাবার খাও।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধীনদের প্রতিটি বিষয় শিক্ষা দিতেন। সুতরাং উম্মে সুলাইম রা. চাইলেন, ছেলে আনাস সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তরবিয়ত গ্রহণ করুক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছেলেকে পাঠানোর তাঁর আরেকটা উদ্দেশ্য ছিলো– এর মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সাথে তার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি সুন্নত সম্পর্কে সে খুব সহজেই জানতে পারবে, কারণ ছেলে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত থেকে ফিরে আসবে তখন বলবে, মা! রাসুলুল্লাহ খাবার সময় ডান হাত দিয়ে খান। মা! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে সালাত আদায় করেন এবং তিনি সালাতে অমুক অমুক সুরা তেলাওয়াত করেন। এরকম বিভিন্ন সুন্নত তিনি ছেলের মাধ্যমে খুব সহজেই শিখতে পারবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাসকে খেদমতের জন্যে গ্রহণ করলেন। আনাস রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতো; এবিষয়ে অনেক ঘটনা রয়েছে। সে বিষয়ের আলোচনা অনেক দীর্ঘ। সুতরাং আমরা এখানে তা উল্লেখ করছি না।

আবু তালহা মদিনার একজন ধনবান লোক, তার প্রচুর স্বর্ণ-রূপা, ক্ষেত-খামার ও গবাদি পশু রয়েছে; কিন্তু তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি জানতে পারলেন যে, উম্মে সুলাইম রা. তালাকপ্রাপ্তা হয়েছেন, তাঁর স্বামী নেই। তাই তিনি উম্মে সুলাইম রা.-এর নিকট বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসলেন। উম্মে সুলাইম রা. তাঁকে বললেন, হে আবু তালহা! তুমি এমন পুরুষ যার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া যায় না; কিন্তু আমার মাঝে এবং তোমার মাঝে একটা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আবু তালহা বললো, সেই প্রতিবন্ধকতাটা কী? আমি তোমার মহর হিসেবে তোমাকে টাকা-পয়সা স্বর্ণ-রৌপ্য সব দেবো। উম্মে সুলাইম রা. বললেন, আমি মুসলিম আর তুমি কাফের, তাই আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারছি না, তবে তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি। আবু তালহা বললো, না আমি আমার ধর্মের উপরই থাকবো। উম্মে সুলাইম রা. তখন বললেন, হে আবু তালহা! তোমার কি লজ্জা করে না যে, তুমি কাঠের তৈরি মূর্তির পূজা করো অথচ তা তৈরি করে অমুক ব্যক্তির এক হাবশি গোলাম, অর্থাৎ তুমি সেই ইলাহের পূজা করো যার কাছে তোমার দরিদ্রতার সময়, কষ্টের সময়, অসুস্থতার সময় আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং যার কাছে হাত জোর করে কেঁদে কেঁদে নিজের প্রয়োজনের কথা বল অথচ তা একটি কাঠের তৈরি মূর্তি বৈ কিছু না, যা উৎপন্ন হয় মাটি থেকে আর তা খোদাই করে নির্দিষ্ট একটা আকৃতিতে তৈরি করে অমুক গোত্রের অমুকের হাবশি গোলাম!! তোমার কি একটু লজ্জাও করে না যে, তুমি যার পূজা করো তা মাটি থেকে উৎপন্ন কাঠ থেকে খোদাই করে তৈরি করা একটা মূর্তি, যা বানিয়েছে এক হাবশি গোলাম। আবু তালহা বললো, হাঁ সবই ঠিক আছে; কিন্তু আমি তোমাকে মহর হিসেবে অনেক সম্পদ দিবো। উম্মে সুলাইম রা. তাকে বললো, হে আবু তালহা! আমি তোমার কাছে মহর হিসেবে কোনো টাকা পয়সাই চাই না এবং তোমার কাছে কখনো কোনো টাকা পয়সা চাবোও না; বরং তুমি ইসলাম গ্রহণ

করো, আমি তোমাকে বিয়ে করবো এবং তোমার ইসলাম গ্রহণটাই হবে আমার মহর। এরপর আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং উম্মে সুলাইম রা.কে বিয়ে করলেন।

সাহাবায়ে কেরাম রা. বলেন, আমরা উম্মে সুলাইম রা.-এর মহরের মত এত বরকতময় মহর আর দেখিনি, তার মহর ছিলো আবু তালহার ইসলাম গ্রহণ। আবু তালহা রা.-এর ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যুদ্ধের ময়দানে আবু তালহার গর্জন শত্রুর মনে যতটা ভীতি ছড়ায় একদল সৈন্যও ততটা ভয় ছড়াতে পারে না। আবু তালহা রা. ঐসকল মুসলিমদের অর্ন্তভূক্ত, যারা উহুদের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে অটল থেকেছেন। উহুদ-যুদ্ধের দিন পাহাড়ের উপর পাহারারত সাহাবিরা যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে মনে করে নিজেদের অবস্থান ত্যাগ করে গনিমত সংগ্রহের জন্যে চলে যায় তখন কাফেররা এই সুযোগে মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, মুসলমানরা অতর্কিত আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পিছু হটে, তখন যেসকল সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বুক চিতিয়ে অটল ছিলো আবু তালহা রা. তাঁদের অন্যতম। তিনিও তাঁর সঙ্গী হয়ে কাফেরদের মুকাবিলা করেছেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যুদ্ধ করেছেন। আবু বকর রা. আসা পর্যন্ত আবু তালহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে ছিলেন। আবু তালহা রা.-এর শরীরেবহু তীর বিদ্ধ হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের পিছনে তোমাদেরই এক ভাই রয়েছে, যে নিজের জন্যে জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রা. বলেন, তখন তাঁরা তাঁর দিকে অগ্রসর হল এবং তাঁকে আহত অবস্থায় সেখানে পেল; তাঁর শরীরে ছিলো অনেকগুলো আঘাত। আবু তালহা রা. ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাহাবিদের একজন। আর তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও হেদায়েতের পথে আসা হয়েছে উম্মে সুলাইম রা.-এর মাধ্যমে।

উম্মে সুলাইম রা. সর্বদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুসরণ করতেন এবং তিনি মনেপ্রাণে সর্বদা এই কামনা করতেন যে, ইসলাম প্রচারে তাঁরও ভূমিকা থাকুক। খন্দকের দিন যখন পরিখা খনন করতে করতে ক্ষুধা-পিপাশায় সকল মুসলিম ক্লান্ত। রাসুলুল্লাহ

Contents

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিদের কারণে নিজের পেটে দুইটা পাথর বাঁধলেন, যাতে পাথরের ঠান্ডায় খিদের কষ্ট কিছুটা কম অনুভব হয়। তখন আবু তালহা উম্মে সুলাইম রা.-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে বললেন, হে উম্মে সুলাইম! আমি শুনলাম খিদের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়ায ক্ষীণ হয়ে আসেছে। সুতরাং তোমার ঘরে কি কিছু আছে? তিনি বললেন, আমার কাছে কয়েক টুকরা রুটি আর কিছু খেজুর আছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে তুমি তা দিয়েই খাবার তৈরি করো। অতঃপর উম্মে সুলাইম রা. রুটি ভাজলেন এবং খেজুর আর রুটি একটা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে ছেলে আনাস রা.-এর নিকট দিলেন এবং তাঁকে বললেন, আনাস! এগুলো নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। আনাস রা. সেগুলো নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বসা পেলেন, তিনি খাবার নিয়ে তাঁর সামনে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই খাবার আপনার নিকট আমার মা পাঠিয়েছেন। সুবাহানাল্লাহ!! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করলেন? তিনি কি একাই খাবার খেলেন?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাতে নিয়ে আনাস রা.কে বললেন, আনাস! এগুলো নিয়ে উম্মে সুলাইমের কাছে যাও। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে মানুষ! দুপরের খাবার খেতে এসো! আবু তালহা তো পুরো বিষয়টাই জানতেন যে, এখানে মাত্র দু'তিনটা রুটি এবং কয়েকটা খেজুর আছে, এত মানুষ এতটুকু খাবার কীভাবে খাবে? তাই আবু তালহা রা. দ্রুত উম্মে সুলাইমের নিকট গেলেন এবং তাঁকে বললেন, হে উম্মে সুলাইম! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আনাসার ও মুহাজির সকলকে নিয়েই আসছেন!! উম্মে সুলাইম রা. ছিলেন মুমিন নারী, তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন কী হবে?। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, অতঃপর তাঁকে অনুমতি দেওয়া হল। তিনি এসে

Contents

রুটি ও খেজুরের টুকরাগুলো নিলেন এবং সেগুলোকে একসাথে করলেন। উম্মে সুলাইম রা. তখন এক কৌটা ঘি নিয়ে আসলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোও একসাথে ঢাললেন এবং তাঁর মুবারক হাত দিয়ে সবগুলো একসাথে মাখলেন, অতঃপর তাঁর মধ্যে দোয়া পড়ে ফুঁ দিলেন, তিনি দোয়া পড়লেন :

'হে আল্লাহ! আপনি এতে আমাদের জন্যে বরকত দান করেন।'

এরপরসাহাবায়ে কেরাম রা.কে বললেন, তোমরা ঘরে প্রবেশ করে খাবার খাও। সাহাবায়ে কেরাম রা. তখন দশজন করে ঘরে প্রবেশ করে সেখান থেকে পরিতৃপ্ত ভরে খাবার খেয়ে এবং পানি পান করে বের হচ্ছেন, আবার অপর দশজন প্রবেশ করছেন। উম্মে সুলাইম রা. এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখছেন যে, মাত্র তিন-চারটা রুটি, কিছু খেজুর আর অল্প ঘি এত মানুষের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাচ্ছে!! তিনি স্বচক্ষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযা দেখলেন।

উম্মে সুলাইম রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত মুহাব্বত করতেন। তিনি সর্বদাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে কল্যাণ কামনা করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন যায়নাব রা.কে বিয়ে করলেন, সেই রাতে উম্মে সুলাইম রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে হাদিয়া প্রেরণ করলেন। তিনি সেদিন কী হাদিয়া পাঠালেন?

উম্মে সুলাইম রা. কিছু শুকনো দুধ নিলেন এবং সেগুলোকে ভালভাবে মেখে মাখনের মত বানালেন, অতঃপর এতে রুটির টুকরা দিলেন, খেজুর দিলেন এবং ঘি দিয়ে এক ধরনের সুস্বাদু খাবার তৈরি করে ছেলে আনাসকে দিয়ে বললেন, আনাস! এই হাদিয়া নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও এবং তাঁকে বল, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এগুলো আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্যে সামান্য হাদিয়া। আনাস রা. এগুলো নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং তা তাঁর সামনে রেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এগুলো হল

Contents

মেহমানদারির খাবার, আমার মা এগুলো আপনার জন্যে পঠিয়েছেন এবং বলেছেন 'আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্যে সামান্য হাদিয়া'। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খুললেন এবং সেখান থেকে খেয়ে খুব খুশি হলেন। অতঃপর আনাস রা. কে বললেন, আনাস! যাও অমুক অমুককে গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো। আনাস রা. বলেন, অতঃপর আমি গেলাম এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার যার নাম বলেছেন তাদের ডেকে নিয়ে আসলাম। অতঃপর তারা রাসুলুল্লাহর নিকট এসে তাঁর সাথে বসলেন এবং সেখান থেকে খেলেন।

একদিন উম্মে সুলাইম রা. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার নিকট আমার একটা প্রয়োজন আছে। তখন তিনি বললেন, বলো তোমার প্রয়োজন কী? উম্মে সুলাইম রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার খাদেম আনাসের জন্যে দোয়া করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হাত উঠিয়ে তাঁর জন্যে দোয়া করলেন এবং বললেন:

'হে আল্লাহ আপনি তাঁর হায়াতকে লম্বা করে দিন, এবং তাঁর আমাল সুন্দর করে দিন এবং তাঁর সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দিন।'

সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দর দোয়া! তিনি শুধু তাঁর জন্যে দীর্ঘ হায়াতের দোয়া করেননি, কারণ আমলহীন দীর্ঘ হায়াত কোনো কাজে আসবে না, তাই তিনি তাঁর জন্যে দীর্ঘ হায়াতের সাথে নেক আমালেরও দোয়া করেছেন, যাতে করে সে এই দীর্ঘ জীবনে ইবাদত করতে করতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে পারে। আনাস রা. বলেন, আমার হায়াত অনেক লম্বা হয়েছে, আমার সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার মেয়ে ফাতেমা আমাকে বলেছে, আমার বংশের একশত বিশ জনের চেয়েও বেশি মানুষের ইন্তেকাল হয়ে গেছে।

উম্মে সুলাইম রা.-এর স্বামীর প্রতি অনেক টান ছিল। আবু তালহা রা.-এর থেকে তাঁর খুব সুন্দর একটি পুত্র সন্তান ছিল। আবু তালহা ছেলেকে অনেক ভালবাসতো ও অনেক আদর করতো। তিনি যখনই বাইরে থেকে ঘরে আসতেন, তখনই তাকে জড়িয়ে ধরতেন এবং কোলে নিয়ে আদর

করতেন। তার সাথে খেলা করতেন, হাসি ঠাট্টা করতেন, কারণ সন্তান বাবা-মায়ের কলিজার টুকরা। হঠাৎ একদিন এই সন্তান অসুস্থ হল এবং অত্যন্ত কঠিন আকার ধারণ করল। সন্তানের অসুস্থতায় আবু তালহা রা. খুবই চিন্তায় পড়ে গেলেন। তা সত্ত্বেও তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করার জন্যে মসজিদে গেলেন। আর তখন ছেলের রোগ আরো বেড়ে গেল এবং সে মারা গেল। উম্মে সুলাইম রা. তখন প্রতিবেশীদের বললেন, আমি বলার আগ পর্যন্ত তোমরা কেউ তাঁকে ছেলের মৃত্যু-সংবাদ দিবে না। অতঃপর আবু তালহা রা. ফিরে এলেন। উম্মে সুলাইম রা. ছেলের লাশ ঢেকে রেখেছিলেন এবং ক্রন্দন করাও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ভালভাবে সেজেগুজে শরীরে সুগন্ধি মাখলেন এবং স্বামীর জন্যে খাবার প্রস্তুত করলেন। আবু তালহা রা. ফিরে এসে খাবার খেলেন এবং ছেলের অবস্থা জিজ্ঞেস করে বললেন, ছেলে এখন কেমন আছে? উম্মে সুলাইম রা. বললেন আগের চেয়ে এখন অনেক শান্ত আছে। আবু তালহা রা. ভাবলেন, ছেলে সুস্থ হয়ে এখন ঘুমাচ্ছে। অতঃপর তাঁরা শুয়ে গেলেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা হয় তাঁদের মধ্যেও তাই হল। সে যখন পরিপূর্ণ তৃপ্ত হল তখন তাঁকে বলল, হে আবু তালহা! যদি কেউ কারো কাছে কিছু আমানত রাখে, অতঃপর কিছুদিন পর তা ফেরত চায়; কিন্তু সেই লোক তা অস্বীকার করে, এটা কি তার জন্যে ঠিক হবে? আবু তালহা রা. বললেন, না এটা করা কখনো ঠিক হবে না। তখন উম্মে সুলাইম রা. বললেন, তাহলে আপনি আপনার সন্তানের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে সাওয়াবের আশা করুন। নিশ্চয় তোমার সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে আমানত দেওয়া হয়েছিল। আর এখন তিনি তার আমানত ফেরত নিয়েছেন। একথা শুনে আবু তালহার মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায় ও তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে বলেন, তুমি আমাকে কলঙ্কিত হওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিলে, অতঃপর আমাকে বললে, আমার ছেলে মারা গিয়েছে? তখন উম্মে সুলাইম রা. তাঁকে বললেন, এখন যান আপনার ছেলেকে কবরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত করুন। এরপর তিনি ছেলেকে গোসল দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ফজরের সালাত আদায় করে কলিজার টুকরোকে জানাযার সালাতের

Contents

জন্যে সামনে নিয়ে আসলেন। অতঃপর স্ত্রী যা করেছে সে বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর নিকট অভিযোগ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু তালহা ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে গত রাতে যা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাতে বরকত দান করুন। কোনো কোনো রেওয়াতকারী বলেন, এরপর আমি আবু তালহা ও উম্মে সুলাইমের থেকে সাতজন সন্তান দেখেছি যাদের প্রত্যেকে কুরআনে হাফেয হয়েছেন।

এখান থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলামের সম্মান, মর্যাদা ও কৃতিত্ব শুধুমাত্র পুরুষদের উপর সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইসলামে নারীর অবদানও অনেক, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে জান্নাতে একত্র হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পালাতক সুফিয়ান সাওরি

তোমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ করো, তাঁর সকল আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলো, তাহলে তিনি তোমাদের দুঃখ-মুসিবতের সময় তোমাদের স্মরণ করবেন এবং তোমাদের সাহায্য করবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.কে এমনই অসিয়ত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেন, হে বালক! তোমাকে কিছু উপদেশ শিক্ষা দিচ্ছি, মনোযোগ দিয়ে শোনো! তুমি আল্লাহর সকল বিধিবিধান মেনে চলবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর বিধিবিধানগুলোর হেফাযত করো, আল্লাহ তাআলাকে তোমার পাশে পাবে। তোমার কোনো কিছুর চাওয়ার থাকলে একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই তা চাইবে, সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন হলে একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটেই সাহায্য চাইবে। মনে রেখো, সারা দুনিয়ার সকল মানুষও যদি তোমার কোনো উপকার করতে একত্র হয় তাহলেও তারা

তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না, তবে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন ততটুকু ব্যতীত। এবং তোমার কোনো ক্ষতি করতে সারা দুনিয়ার মানুষও যদি একত্র হয় তাহলেও তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তবে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন ততটুকু ব্যতীত। তাকদির লিখার কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাও শুকিয়ে গেছে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'তুমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ করো তাঁর সকল আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলো তাহলে তিনি দুঃখ-মুসিবতের সময় তোমাকে স্মরণ করবেন এবং তোমাকে সাহায্য করবেন।'

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলেছেন এবং তাঁর আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলতে বলেছেন। তাহলে আল্লাহ তাআলাও দুঃখ-মুসিবতের সময় আমাদের স্মরণ করবেন এবং আমাদের সাহায্য করবেন। এখন এবিষয়ে আমরা সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বলবো। তিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ করার কারণে আল্লাহ তাআলা মুসিবাতের সময় কীভাবে তাঁর সাহায্য করলেন এবং তাঁকে বিপদ-মুসবত থেকে উদ্ধার করলেন? সে বিষয়টি জানবো।

সুফিয়ান সাওরির পূর্ণ নাম হল সুফিয়ান ইবনে সাইদ আস-সাওরি। তিনি বাগদাদের অনেক বড় একজন আলেম ও ইমাম। তৎকালীন খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর তাঁকে কাযি বা বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতে চাইলেন; কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমাদের সালাফগণ সর্বদাই বিচারকের পদ গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকতেন। তাঁরা এই পদ গ্রহণ করতে ভয় পেতেন যে, হয়তো তার দ্বারা কারো প্রতি জুলুম হয়ে যাবে আর একারণে তাঁকে আল্লাহ তাআলার শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

Contents

'যাকে বিচারক বানানো হল, যেনো তাকে ছুরি বিহিন জবাই করে দেওয়া হল।'

অন্য এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

'বিচারক তিন প্রকার, দুই প্রকার বিচারক জাহান্নামে যাবে আর একপ্রকার জান্নাতে যাবে।'

সুতরাং সালাফগণ সর্বদা এই ভয় করতেন যে, না জানি তার নাম আবার প্রথম দুই প্রকার জাহান্নমিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হয়তো তিনি মানুষের প্রতি জুলুম করে ফেলবেন অথবা না জেনে কারো ব্যাপারে কোনো কথা বলে ফেলবেন, সঠিকভাবে তদন্ত না করেই কারো ব্যাপারে ভুল ফায়সালা দিয়ে দিবেন। সুতরাং নিরাপদ দূরে থাকার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। আর একারণেই সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ সরাসরি বিচারকের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

খলিফা আবু জাফর তাঁকে ডেকে পাঠালেন। আবু জাফর ছিলো খুবই রাগী ও একরোখা প্রকৃতির মানুষ। তার মতো একরোখা প্রকৃতির মানুষ দ্বিতীয়টি পাওয়া দুষ্কর। তিনি সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ কে বললেন, হে সুফিয়ান! আমি তোমাকে কাযি বানাতে চাই। সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন! আমি বিচারক হতে চাই না। খলিফা বলল, তোমাকে কাযি হতেই হবে। সুফিয়ান সাওরি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি কাযি হবো না। খলিফা বলল, তাহলে তরবারি দিয়ে গরদান উড়িয়ে দেবো। সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বললেন, আমিরুল মুমিনিন আমাকে আগামীকাল পর্যন্ত ভাবার সুযোগ দিন। সে বললো, ঠিক আছে তোমাকে আগামীকাল পর্যন্ত ভাবার সুযোগ দেওয়া হল; কিন্তু রাতে সুফিয়ান সাওরি রহ. শহর ছেড়ে পালিয়ে বের হয়ে গেলেন। নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নির্ধারণ করা ছাড়াই তিনি শহর থেকে বের হলেন। তাঁর প্রথম টার্গেট হল, যে করেই হোক এখান থেকে আগে পালাতে হবে। শহর থেকে বের হয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে তারপর ঠিক করলেন যে, তিনি ইয়ামানে যাবেন। তাই তিনি ইয়ামানের দিকে রওয়ানা হলেন।

কিন্তু ইয়ামানে পৌছার পূর্বেই পথে খাবার দাবার ও টাকা পয়সা সব শেষ হয়ে গেল। পূর্বে মানুষ সফরে বের হলে খাবার পানীয়সহ সকল জিনিস

সঙ্গে নিয়ে বের হতে হতো, কারণ কোনো কোনো সফরে তাদের সপ্তাহ, মাস এমননি কয়েক মাস পর্যন্ত লেগে যেতো। গন্তব্যে পৌছার পূর্বেই যদি কখনো তাদের খরচ শেষ হয়ে যেতো তাহলে পথিমধ্যে কোনো শহরে বা বাজারে কয়েক দিন কাজ করতো, মানুষের মালামাল বহন করতো বা কারো বাগানে কাজ নিতো এবং চলার মত টাকা-পয়সা হলে আবার বাকি পথ সফর করতো। সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহর যখন পথখরচ শেষ হয়ে গেল, তিনি এক লোকের আঙ্গুর বাগানে কাজ নিলেন। এদিকে খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে বিরাট পুরস্কার ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে সুফিয়ান সাওরি রহ. একটি বাগানে কাজ নিয়েছেন; কিন্তু বাগানের মালিক জানে না যে, তিনি হলেন ইমাম সুফিয়ান সাওরি।

একদিন বাগানের মালিকের নিকট মেহমান এলে, তিনি সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহকে বললেন, হে গোলাম! আমাদের জন্যে কিছু আঙ্গুর নিয়ে এসো। সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ আঙ্গুর নিয়ে এলেন; কিন্তু তা ছিলো টক। মালিক বললেন, এগুলো নয়, মিষ্টি আঙ্গুর নিয়ে এসো। তিনি আবার গেলেন এবং ভালভাবে বাছাই করে আঙ্গুর নিয়ে এলেন; কিন্তু এগুলোও ছিলো টক। মালিক তখন তাঁকে বলল, তুমি কি টক আর মিষ্টির মধ্যে পার্থক্য করতেও জান না?

-আমি জানি না যে, বাগানের কোন আঙ্গুর টক আর কোন আঙ্গুর মিষ্টি?

-কেনো জান না?

-কারণ আমি কখনো আপনার বাগানের আঙ্গুর খেয়ে দেখি নি।

-কেনো?

-আপনি তো আমাকে আঙ্গুর খাওয়ার অনুমতি দেন নি তাই। আপনার অনুমতি ব্যতীত যদি একটি আঙ্গুরও আমি খাই তাহলে এর জন্যে আল্লাহ তাআলা আমার কাছ থেকে হিসেব নিবেন।

মালিক বলল, তুমি এসব করেছো একমাত্র আল্লাহর ভয়ে; আল্লাহর শপথ, তাহলে তো তুমি সুফিয়ান সাওরির মত হয়ে যাবে। ইনিই যে

Contents

সুফিয়ান সাওরি তা লোকটি জানে না। সুফিয়ান সাওরি রহ. যখন থেকে এই বাগানে কাজ নিয়েছেন, তখন থেকে তিনি সময় মত বাগানে এসে নির্ধারিত কাজ শেষ করে নিজের থাকার ঘরে চলে যেতেন। এছাড়া কখনই তিনি আঙ্গুরের একটি দানাও মুখে দিয়ে দেখেন নি, কারণ এই চুক্তি তাঁর সাথে করা হয় নি এবং মালিক তাঁকে আঙ্গুর খাওয়ার অনুমতিও দেন নি। তাই তিনি নফসকে তা থেকে বিরত রেখেছেন।

এদিকে বাগানের মালিক বাজারে চলে গেল। বাজারে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের মানুষ এসে থাকে। লোকটি সাথীদের সাথে কথা বলছিল, কথার এক ফাঁকে সে বলল, আল্লাহর শপথ আজ আমার এবং আমার বাগানের কাজের লোকটির সাথে এমন এমন ঘটনা ঘটেছে। তখন সেখানে থাকা একজন বলল, আপনার কাজের লোকের চেহারা বা আকৃতির বর্ণনা কি আপনার মনে আছে?সে বললো, হাঁ, তাঁর চেহারার আকৃতি এমন এমন। চেহারার বর্ণনা শুনে লোকটি বলল, এটাতো সুফিয়ান সাওরির আকৃতির বর্ণনা। অবশ্যই আমরা তাঁকে গ্রেফতার করে খলিফার নিকট নিয়ে যাবো এবং তার কাছ থেকে ঘোষিত পুরস্কার গ্রহণ করবো; কিন্তু তারা যখন সুফিয়ান সাওরিকে ধরার জন্যে আসলো ততক্ষণে তিনি ইয়ামানের দিকে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

তিনি ইয়ামানে প্রবেশ করে একটা সম্মানজনক কাজের সন্ধানে বাজারে গেলেন। যেমন লোকজনের মাল বহন করা, দোকানের কর্মচারী হওয়া, শ্রমিক হয়ে মজুর খাটা ইত্যাদি সম্মানজনক কাজ। শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম যদিও কল্যাণ উভয়ের মধ্যেই থাকে। মুমিন তো এই হাদিস জানে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

তোমাদের কেউ যদি রশি দিয়ে কাঠের বোঝা বেঁধে পিঠে বহন করে তা বিক্রি করে আর এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার অভাব দূর করেন– এটা কারো কাছে হাত পাতার চেয়ে উত্তম। মানুষের কাছে হাত পাতলে হয়তো মানুষ কিছু দেয় অথবা মুখ ফিরিয়ে না করে দেয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন লোক এলো এবং বলল, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি দরিদ্র, আমার কিছু নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার বাড়িতে যা আছে তাই নিয়ে এসো। লোকটি বাড়ি থেকে এক জোড়া জুতা নিয়ে এলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা বিক্রির আদেশ দিলেন; কিন্তু সে তা বিক্রি করতে পারলো না। তাই রাসুলুল্লাহ বললেন, কে আছো যে, এই জুতা ক্রয় করবে? তখন এক সাহাবি তা দুই দেরহাম দিয়ে ক্রয় করলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে দুই দিরহাম দিয়ে বললেন, এখান থেকে এক দেরহাম দিয়ে একটি কুড়াল ও রশি ক্রয় করো এবং অন্য দেরহাম দিয়ে তোমার সন্তানের জন্যে খাবার ক্রয় করো। লোকটি কুড়াল ও রশি কিনে আনল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যাও অমুক জায়গা থেকে কাঠ কেটে আনো। লোকটি সেখানে গিয়ে কাঠ কাটলো অতঃপর রশি দিয়ে বেঁধে কাঁধে করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে এলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে আছো যে, এই কাঠ কিনবে? তিনি তা এক দেরহামের বিনিময় বিক্রি করে লোকটিকে দিলেন এবং বললেন, এখন তোমার পুঁজি আছে এবং রশি ও কুড়াল আছে সুতরাং প্রতিদিন এভাবে নিজের জন্যে উপার্জন করবে।

কিন্তু দুঃজনক বিষয় হল, আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজে কাজ না করে অন্যের কাছে হাত পাতে ও নিজেকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ করে। চমৎকার একটা ঘটনা বলছি, ঘটনাটি আমার এক বন্ধুর সাথে ঘটেছে। আমার এক সাথী রাতে হোটেলে গিয়েছিলো খাবার খেতে। সেখান থেকে বের হয়ে সে যখন গাড়ির কাছে আসে তখন এক লোক এসে তার সামনে হাত পেতে বললো, আমাকে দুইটা রিয়াল দিন, আমি রাতের খাবার খাবো। লোকটি ছিলো পূর্ণ সুস্থ। তখন আমার সাথীটি তাকে বললো, তুমি ভাল মানুষ, কাজ করারও সামর্থ্য রাখ, তাহলে কাজ না করে মানুষের কাছে হাত পাতছো কেনো? লোকটি বলল, ভাই আমাকে কেউ কাজ দেয় না, আমি

কোনো কাজ খুঁজে পাই না। আপনি আমাকে দুইটা রিয়াল দিন, আমি রাতের খাবার খবো। আমার সাথী বলেন, আমি তখন গাড়ির ভেতর থেকে একটা ছিড়া তেনা ও বালতি বের করে লোকটিকে বললাম, এই নাও তেনা ও বালতি ওখান থেকে পানি এনে আমার গাড়িটা মুছে দাও, দুই-তিন রিয়াল নয় আমি তোমাকে পনের রিয়াল দিবো। তখন লোকটি বললো, ভাই আমি আপনার কাছে কাজ চাইনি বরং আমি আপনার কাছে কিছু টাকা সদকা চাচ্ছি। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! তুমি সামান্য একটু কাজ করে শরীরের ঘাম ঝড়িয়ে পনের রিয়াল ইনকাম করবে, এটা তোমার কাছে পছন্দ হচ্ছে না। অথচ তেনাও আমার বালতিও আমার আর ওখানে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত পানি রয়েছে তুমি শুধু একটু পরিশ্রম করে আমার গাড়িটা মুছবে আর পনের রিয়াল ইনকান করবে। এটা কি লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে হাত পাতার চেয়ে উত্তম নয়? তুমি যখন মানুষের কাছে হাত পাতো তখন কেউ তোমাকে কিছু দেয় আবার কেউ অপমান করে ফিরিয়ে দেয়। তখন লোকটি আমার তেনা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে একদিকে চলে গেল।

. . .

সুফিয়ান সাওরি রহ. জানতেন উপার্জনের জন্যে কাজ করা অপমানের কিছু নয়। বরং এটা অন্যের উপর নির্ভশীল হওয়া থেকে উত্তম। এর মাধ্যমে মানুষের শরীরের মান নষ্ট হয় না বরং তা আল্লাহ তাআলা হেফাযত করবেন এবং এর বিনিময়ে প্রতিদান দিবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি করতে করতে মারা গেলে কিয়ামতের দিন তার চেহারার গোশতে কোনো পানি থাকবে না। সুতরাং সুফিয়ান সাওরি রহ. অন্যান্য মানুষের মত বাজারে প্রবেশ করলেন এবং কারো দয়া নয় বরং নিজের জন্যে একটা কাজ খুঁজলেন; কিন্তু অপরিচিত হওয়ার কারণে কিছু মানুষ তার উপর চোরের অপবাদ দিল। তিনি বললেন, হে লোকেরা আল্লাহর শপথ করে বলছি আমি চোর নই, আমি চুরি করি না; কিন্তু লোকেরা বললো, না বরং তুমি চোর। এভাবে কিছুক্ষণ বিতর্কের পর লোকেরা তাঁকে ইয়ামানের আমিরের নিকট নিয়ে গেল।

ইয়ামানে তখন খলিফা আবু জাফর আল মানসুরের নিয়োগকৃত গভর্নর দায়িত্ব পালন করছিল। আর সুফিয়ান সাওরি রহ. খলিফা আবু জাফরের পালতক একজন আসামী। তাঁকে যখন গভর্ণরের সামনে নিয়ে যাওয়া হল, গভর্নর চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন ইনি চোর হতে পারেন না, কারণ তাঁর চেহারার মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকের প্রতিচ্ছবি ভাসছিল। তাঁকে দেখেই মনে হচ্ছিল তিনি একজন বড় আলেম হবেন। গভর্নরকে অনেক চোর বাটপারের বিচার করতে হয়, সুতরাং তিনি চেহারা দেখেই বলতে পারেন কে চোর আর কে ভাল মানুষ?তিনি সুফিয়ান সাওরির চেহারা দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি চোর নন বরং ইনি একজন বড় আলেম হবেন। সুতরাং ইয়ামানের গভর্নর বিষয়টি যাচাই করাতে চাইলেন, তাই তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা সকলে বের হয়ে যাও আমি তার সাথে একাকী কথা বলবো। অতঃপর সকলে যখন বের হয়ে গেল, তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন তুমি কে?

-আমি আবদুল্লাহ, বললেন সুফিয়ান সাওরি।

-তোমার নাম কী?

-আবদুল্লাহ।

-আল্লাহর দোহায় দিয়ে বলছি তোমার প্রকৃত নাম বল।

-সুফিয়ান।

-কার ছেলে?

-আবদুল্লাহর ছেলে।

-আমি তোমাকে আল্লাহর দোহায় দিয়ে বলছি তুমি তোমার নাম এবং তোমার বাবার নাম বলো।

-সুফিয়ান ইবনে সাইদ।

-আস-সাওরি?

Contents

-হাঁ আস-সাওরি।

-তুমিই কি সুফিয়ান ইবনে সাইদ আস-সাওরি?

-হাঁ আমিই সুফিয়ান ইবনে সাইদ আস-সাওরি।

-তুমি কি আমিরুল মুমিনিনের পালাতক অপরাধী?

-হাঁ আমিই সেই।

-তোমাকে ধরার জন্যেই কি খলিফা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন?

-হাঁ আমাকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

অতঃপর গভর্নর কিছুক্ষণ চুপ রইলেন, মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মাথা উঠিয়ে বললেন, হে সুফিয়ান! তুমি ইয়ামানের যেখানে পছন্দ হয় সেখানেই থাকতে পারো। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি যদি আমার পায়ের নিচে লুকিয়ে থাকো আর তোমাকে যদি দেখা যায় হলে আমি আমার পা-ও উঠাবো না।

সুতরাং তুমি যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ করো, তাঁর সকল আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলো, তাহলে তিনি দুঃখ-মুসিবতের সময় তোমাকে স্মরণ করবেন এবং তোমাকে সাহায্য করবেন। তুমি যদি সুস্থতার সময় আল্লাহকে স্মরণ কর, তাহলে তিনি অসুস্থতার সময় তোমাকে স্মরণ করবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন। তুমি যদি স্বচ্ছলাতার সময় আল্লাহকে স্মরণ কর, তাহলে তিনি তোমার দরিদ্রতার সময় তোমাকে স্মরণ করবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন। তুমি যদি শক্তি-সামর্থ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ কর, তাহলে তিনি তোমার দুর্বলতার সময় তোমাকে স্মরণ করবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন। তুমি যদি স্বাধীন থাকা অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, তাহলে তিনি তোমার বন্দি থাকা অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন। তুমি যদি সম্মানিত ও ক্ষমতাবান থাকা অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, তাহলে তিনি তোমার ক্ষমতা চলে গেলে তোমাকে স্মরণ করবেন, তোমাকে সাহায্য করবেন। অর্থাৎ তুমি যদি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ করো, তাঁর সকল আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলো

তাহলে তিনি দুঃখ-মুসিবতের সময় তোমাকে স্মরণ করবেন এবং তোমাকে সাহায্য করবেন। ইয়ামেনের গভর্নর বলল, তুমি ইয়ামানের যেখানে পছন্দ হয় সেখানেই থাকতে পারো, আল্লাহর শপথ করে বলছি তুমি যদি আমার পায়ের নিচে লুকিয়ে থাকো আর তোমাকে যদি দেখা যায় তাহলে আমি আমার পা-ও উঠাবো না।

একবার আবু জাফর আল-মানসুর শুনতে পেল যে, সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ মক্কায় হারাম শরিফে অবস্থান করছেন। তখন ছিলো হজ্জের মৌসুম। আবু জাফরও হজ্জের জন্যে মক্কায় আসছিল। সে একথা শুনার সাথে সাথে এক দল সৈন্যকে এই নির্দেশ দিয়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিল যে, তোমরা সুফিয়ান সাওরিকে হারাম থেকেই গ্রেফতার করবে। গ্রেফতার করে তাকে গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে, আমি এসে নিজে তাকে হত্যা করবো। আবু জাফরের প্রেরিত সৈন্যরা হারামে এসে ঘোষণা করতে লাগল যে, তোমাদের মধ্যে কে আছে, আমাদেরকে সুফিয়ান সাওরিকে চিনিয়ে দিতে পারবে? এবং সুফিয়ান সাওরির কাছে নিয়ে যেতে পারবে? তোমাদের মধ্যে কে আছে, আমাদেরকে সুফিয়ান সাওরিকে চিনিয়ে দিতে পারবে? এবং সুফিয়ান সাওরির কাছে নিয়ে যেতে পারবে? খলিফা আবু জাফর পথে আছেন, তিনি মক্কায় আসছেন।

সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ তখন কাবার দিকে মুখ করে দুই হাত আসমানের দিকে তুলে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে বললেন, 'হে আমার রব! আমি আপনার কসম করে বলছি, আবু জাফর যেনো মক্কায় পৌছতে না পারে, হে আমার রব আবু জাফর যেনো মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে, সে আমার প্রতি জুলুম করেছে, সে মানুষের প্রতি জুলুম করেছে, হে আমার রব! আবু জাফর যেনো মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে'।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ;

'কিছু উষ্কখুষ্ক চুল ও ধূলোমলিন চেহারার অধিকারী লোক আছে, যাদেরকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় না, তাঁরা যদি আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে কোনো কসম করেন তাহলে আল্লাহ তাআলা তা পূর্ণ করেন।'

Contents

সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আবু জাফর যেনো মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে। আর তখনই মৃত্যুর ফেরেশতা আসমান থেকে আবু জাফরের উপর নামলো। আবু জাফর লাশ হয়ে মক্কায় প্রবেশ করল এবং হারামে তার জানাযা পড়া হল।

তুমি যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ করো, তাঁর সকল আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলো তাহলে তিনি দুঃখ-মুসিবতের সময় তোমাকে স্মরণ করবেন এবং তোমাকে সাহায্য করবেন।

আল্লাহ তাআলার নিকট এই কামনা করি যে, তিনি যেনো আমাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তাঁর স্মরণ করার ও তাঁর সকল আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলার তাওফিক দান করেন। আল্লাহ তাআলা যেনো আমাদেরকে এসকল ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করার তাওফিক দান করেন। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

'নিশ্চয়ই তাঁদের ঘটনায় বুদ্ধিমানদের জন্যে রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোনো মনগড়া কথা নয়; বরং এটা হল এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁদের জন্যে হেদায়াত ও রহমতের উপকরণ।'[১]

পবিত্র খাবার গ্রহণ করুন

এক লোক সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করলো, সালাতের সময় কাতারের কোন পাশে দাঁড়ানো উত্তম? প্রথম কাতারের ডান পাশে না-কি বাম পাশে? তখন সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'প্রথমে দেখো খাবারের জন্যে রুটির যে টুকরোটা নিয়েছো তা হালাল না-কি হারাম? তুমি কাতারের যেখানেই সালাত আদায় করো তা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। তুমি সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে খুব ভালভাবে যাচাই-বাছাই করো যে, আমি সালাত কোথায় আদায় করব? অথচ তুমি এমন একটি

---

১. সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১১১

Contents

কাজে লিপ্ত যা তোমাকে সালাত কবুল হওয়া থেকে বিরত রাখে"। যেমনিভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রা.কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

তোমরা কি জানো প্রকৃত দরিদ্র কে? তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র তো সেই যার কোনো দিনার বা দেরহাম নেই (অর্থ-কড়ি নেই)। তখন তিনি বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র তো সে-ই যে, কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম ও যাকাতের সাওয়াব নিয়ে আসবে; কিন্তু সে এ-ব্যক্তিকে গলি দিয়েছে, একে প্রহার করেছে, অন্যায়ভাবে এর মাল ভক্ষণ করেছে, তখন এই লোক তার সাওয়াব থেকে নিবে, এই লোক তার সাওয়াব থেকে নিবে, অতঃপর যখন তার সওয়াব শেষ হয়ে যাবে তখন এই লোক তার অপরাধগুলো এই লোককে দিয়ে দিবে, এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

সুতরাং সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ লোকটিকে বলেন, তুমি প্রথম কাতারে সালাত আদায় করলে তাতে কী লাভ হবে যদি তুমি মানুষের হক নষ্ট করো, অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো? সুতরাং তুমি হলাল ও পবিত্র খাবার গ্রহণ কর।

হালাল খাবারের ক্ষেত্রে আমাদের সালাফদের অবস্থা সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করবো। দোয়া কবুলের গোপন রহস্য হল হালাল ও পবিত্র খাবার গ্রহণ করা এবং এবিষয়ে এখানে কিছু হাদিস ও ঘটনা উল্লেখ করবো।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না এবং তিনি মুমিন বান্দাদের তাই আদেশ করেছেন যা তিনি নবি-রাসুলদের আদেশ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Contents

'হে রাসুলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত।'[১]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র খাবারকে নেক আমলের পূর্বে এনেছেন। অর্থাৎ তোমর সালাত আদায় করা, দিনের বেলা সিয়াম পালন করা এবং রাত্রি জাগরণ করে আল্লাহর ইবাদত করা ও কুরআন তেলাওয়াত করার পূর্বে হালাল খাবার ভক্ষণ করো। আল্লাহ তাআলা এখানে তাঁর রাসুলদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, হে রাসুলগণ! তোমরা হালাল খাবার গ্রহণ করো। এরপর তিনি বলেছেন, এবং সৎ আমল করো। অর্থাৎ নেক আমলের পূর্বে হালাল ও পবিত্র খাবার গ্রহণ করো, যাতে করে হারাম খাবার গ্রহণের কারণে তোমার নেক আমলগুলো নষ্ট না হয়ে যায়। একারণেই আল্লাহ তাআলাবলেছেন :

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا: তোমরা পবিত্র বস্তু গ্রহণ কর এবং সৎআমল কর।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত ধূলোমলিন চুল ও চেহারা ওয়ালা এক লোকের উপমা দিয়ে বলেন, সে আসমানের দিকে হাত তুলো বলে, হে আমার রব! হে আমার রব! তিনি বলেন, অথচ তার খানা-পিনা হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছেদ হারাম, সে যা ভক্ষণ করে তা হারাম, তাহলে তার দোয়া কবুল হবে কীভাবে!?

আবুল মাআলি আল-জুয়াইনি, হারমাইন শারিফাইনের ইমাম, মুনাযারার ময়দানে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রতিপক্ষ কখনই তাঁকে নিরুত্তর করতে পারতো না। তাঁর পিতা ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও খোদাভীরু একজন মানুষ। সংসারে অভাব-অনটন আর দরিদ্রতা থাকা সত্ত্যেও তিনি সর্বদা হালালভাবে উপার্জন করতেন এবং পরিবারের জন্যে হালাল ও পবিত্র খাবারের ব্যবস্থা করতেন। সন্তান আবুল মাআলি আল-জুয়াইনির যখন জন্ম হল তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি সর্বদা সতর্ক থাকো যে,

---

১. সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৫১

Contents

সন্তানকে তুমি ব্যতীত অন্য কেউ যেনো দুধ পান না করায়, কারণ আমি জানি যে, তুমি তাকে যে দুধ পান করাবে তা হালাল খাবার থেকে উৎপন্ন, কারণ আমি কেবল হালাল খাবারই তোমার জন্যে উপস্থিত করি; কিন্তু অন্যের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। সুতরাং তুমি সতর্ক থাকবে যে, তাকে যেনো তুমি ব্যতীত অন্য কেউ দুধ পান না করায় এবং আমার সন্তান হালাল ব্যতীত কখনো হারাম খাবার গ্রহণ না করে।

একদিন তার এক প্রতিবেশিণী তার বাড়িতে বেড়াতে আসলো। তখন তার স্ত্রী মেহমানদের জন্যে অন্য ঘরে খাবার আনতে গেলে সন্তান কাঁদতে শুরু করল। প্রতিবেশী মহিলাটি তখন কান্না থামানোর জন্যে তাকে কোলে নিয়ে তার দুধ পান করানো শুরু করলো। (তখনকার সময়ে এক মহিলা অন্য কারো সন্তানকে স্তন্য পান করানোটা ছিলো অতি সাধারণ ব্যাপার।) তার মা খাবার নিয়ে এসে দেখে প্রতিবেশীনি তার ছেলেকে দুধ পান করাচ্ছে, তখন দ্রুত তার কাছে থেকে তাকে কেড়ে নিল এবং তাকে এর জন্যে তিরস্কার করে বললো, এর বাবা আমাকে এব্যাপারে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি আমার সন্তানের ব্যাপারে এটা আশ্বস্ত থাকতে চান যে, সে হালাল দুধ ব্যতীত কখনো হারাম দুধ পান করে নি। আর এব্যাপারে তিনি আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে পারেন না। আবুল মাআলি আল-জুয়াইনি রহিমাহুল্লাহ বড় হলেন এবং অনেক বড় আলেম ও মুনাযিরে পরিণত হলেন। বর্ণিত আছে তিনি মুনাযারার সময় কথার মাঝখানে মাঝে মাঝে চুপ হয়ে যেতেন, তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হতো না। তখন তিনি বলতেন, এটা হল সেই মন্দ দুধ পানের ফল।

এই ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হালাল খাবার মানুষের মেধা, ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে অনেক প্রভাব ফেলে। যেমনিভাবে সুফিয়ান সাওরি রা. ঐলোককে বলেছিলেন, যে তার কাছে জানতে চেয়েছিলো সালাতের সময় কাতারের কোন পাশে দাঁড়ানো উত্তম? প্রথম কাতারের ডান পাশে না-কি বাম পাশে? তখন সুফিয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ তাকে বলেছিলেন, 'প্রথমে দেখো খাবারের জন্যে রুটির যে টুকরোটা নিয়েছো

Contents

তা হালাল না-কি হারাম? তুমি কাতারের যেখানেই সালাত আদায় করো তা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ঘরে প্রবেশ করে বিছানার উপর একটি খেজুর পেলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তিনি খেজুরটা মুখের কাছে নিয়ে খাবার উপক্রম হলেন অতঃপর তা না খেয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ আমার যদি এই ভয় না হত যে, এটা সদকার খেজুর তাহলে আমি তা ভক্ষণ করতাম। এরপর তিনি তা সদকা করার আদেশ দেন। একবার তাঁর কাছে সদকা জমা করা হল, তখন হাসান অথবা হুসাইন রা. এসে একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলেন, তখন রাসুলুল্লাহ কাছে এসে হাত দিয়ে তাঁর মুখ থেকে সেই খেজুর বের করলেন এবং তাঁকে বললেন, বাখ! বাখ! তাঁর মুখ থেকে সেই খেজুর বের করে হাত দিয়ে মুছে যথাস্থানে তা রেখে দিলেন এবং তাঁকে বললেন, তুমি কি জান না যে, এগুলো সদকার খেজুর আর মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের জন্যে তা হালাল নয়। এই হাদিসই প্রমাণ করে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল খাবার গ্রহণের ব্যাপারে কতটা সতর্ক ছিলেন?এবং তিনি কখনই হালাল ব্যতীত হারাম খাবার গ্রহণ করেননি।

একবার সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন. হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমার জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করুন, তিনি যেনো আমাকে মুস্তজাবুদ দাওয়া (যার দোয়া কবুল হয়) বানিয়ে দেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে হাত তুলে তাঁর জন্যে এই দোয়া করে বলতে পারতেন যে, 'হে আল্লাহ! আপনি সা'দকে মুস্তজাবুদ দাওয়া বানিয়ে দিন'। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামেরকে এই শিক্ষাই দিতেন যে, কোনো কিছুই তাঁদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হবে না বরং কর্মের মাধ্যমে সবকিছু অর্জন করতে হবে। তাই তিনি সা'দ রা.-এর জন্যে সাথেসাথে হাত তুলে এই দোয়া করেননি যে, 'হে আল্লাহ! আপনি সা'দকে

মুস্তজাবুদ দাওয়া বানিয়ে দিন' বরং তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি তোমার খাবারকে পবিত্র করো, তাহলে মুস্তাজাবুদ দাওয়া হয়ে যাবে'।

হে ভাই! সমস্যা দোয়ার মধ্যে না বরং সমস্যা তোমার মধ্যে। তুমি তোমার খাবারকে পবিত্র করো তাহলে মুস্তাজাবুদ দাওয়া হয়ে যাবে।

এরপর থেকে সা'দ রা. কখনই হালাল ব্যতীত কোনো খাবার গ্রহণ করেননি। বর্ণিত আছে সা'দ রা.-এর বাড়িতে একটি বকরি ছিলো তিনি ও তাঁর পরিবার এর দুধ পান করতেন, একদিন বকরিটি তাঁর এক প্রতিবেশীর ক্ষেতে প্রবেশ করে। সেই ক্ষেতের মধ্যে ঘাসের সাথে গম ও গব ছাড়ানো ছিল। বকরিটি সেখান থেকে খেয়ে পেট পুরে ঘরে ফিরল। অতঃপর সা'দ রা. এই বিষয়টি জানতে পেরে এই ভয়ে আর কখনই সেই বকরির দুধ পান করেননি যে, হয় তো তার দুধ অনুমতি ব্যতীত প্রতিবেশীর ক্ষেত থেকে খাওয়া খাবার থেকে উৎপন্ন হয়েছে। হাঁ, সা'দ রা. ছিলেন মুস্তাজাবুদ দাওয়া।

ওমর রা. সা'দ রা. কে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন। একবার ওমর রা.-এর নিকট ইরাকবাসীর পক্ষ থেকে সা'দ রা.এর ব্যাপারে অভিযোগের একটি চিঠি আসলো; তাতে লেখাছিলো যে, সা'দ এমন এমন। ওমর রা. তাঁর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে বিষয়টি যাচাই করতে চাইলেন। তিনি খবর শুনার সাথে সাথে তাঁর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান নেননি, কারণ তিনি সা'দ রা.কে চিনতেন, তাঁর ব্যাপারে ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে, তিনি কেমন? তাই তিনি বিষয়টি ভালভাবে যাচাই করতে চাইলেন, যেমনিভাবে সুলাইমান আ. হুদহুদ পাখির সংবাদ যাচাই করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

اِنِّیۡ وَجَدۡتُّ امۡرَاَۃً تَمۡلِکُہُمۡ وَ اُوۡتِیَتۡ مِنۡ کُلِّ شَیۡءٍ وَّ لَہَا عَرۡشٌ عَظِیۡمٌ ○ وَجَدۡتُّہَا وَ قَوۡمَہَا یَسۡجُدُوۡنَ لِلشَّمۡسِ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ وَ زَیَّنَ لَہُمُ الشَّیۡطٰنُ اَعۡمَالَہُمۡ فَصَدَّہُمۡ عَنِ السَّبِیۡلِ فَہُمۡ لَا یَہۡتَدُوۡنَ ۙ

'আমি এক নারীকে সাবাবাসীর উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের (মন্দ) কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। তাই তারা সৎপথ পায় না।'[১]

এই সংবাদ শুনে সুলাইমান আ. কী বললেন? তিনি কি সাথে সাথে একথা বললেন যে, হে আমার বাহিনী! তোমরা তারাতারি তাদের উপর আক্রমণ করো এবং তাদের সবকিছু ধ্বংস করে দাও। বরং তিনি বলেছেন, ইরশাদ হয়েছে:

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

'সুলাইমান বললেন, এখন আমি দেখবো তুমি সত্য বলছো না-কি মিথ্যা বলছো।'[২]

আর এটাই হল শরয়ি বিধান যে, কোনো সংবাদ এলে তা যাচাই করে তারপর সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ভালভাবে যাচাই ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। একারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সামনে এই আয়াত তেলয়াত করতেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝

'মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।'[৩]

---

১. সুরা নামল, আয়াত : ২৩-২৪

২. সুরা নামল, আয়াত : ২৭

৩. সুরা হুজরাত, আয়াত : ৬

সুতরাং যে কোনো সংবাদ প্রথমে যাচাই করতে হবে। কোনো একটা বিষয় শুনেই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

তাই ওমর রা. সা'দ রা.-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্যে ইরাকে একজন দূত প্রেরণ করলেন। দূত এসে সা'দ রা.কে সবকিছু খুলে বললো। দূত বললো, আমি মানুষের কাছে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো, সুতরাং আপনি আমার সাথে আসুন, আমরা কয়েকটি মসজিদে সালাত আদায় করাবো এবং মানুষকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। অতঃপর সে একটি মসজিদে আসলো এবং সেখানে সালাত আদায় করলো, মনে করুন যোহরের সালাত আদায় করলো, সালাতের পর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের নিকট ওমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর পক্ষ থেকে এসেছি। তাঁর কাছে এমন এমন সংবাদ পৌঁছেছে, সুতরাং তোমাদের আমিরের ব্যাপারে তোমাদের কোনো অভিযোগ ও মন্তব্য থাকলে তা আমাকে বল। লোকজন সা'দ রা.-এর প্রশংসা করলেন, কেউ তাঁর ব্যাপারে কোনো অভিযোগ বা মন্তব্য করেনি। এভাবে তিনি অনেকগুলো মসজিদে ঘুরলেন; কিন্তু কেউ সা'দ রা.-এর ব্যাপার কোনো আভিযোগ করেনি। অতঃপর তিনি বনি আসাদের মসজিদে গেলেন এবং এই মসজিদে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যা সা'দ রা.কে অনেক কষ্ট দিল এবং তা তাঁকে আল্লাহ তাআলার নিকট দুহাত তুলে দোয়া করতে বাধ্য করল।

ওমর রা.-এর দূত সা'দ রা.কে সঙ্গে নিয়ে এই মসজিদে আসলেন এবং সেখানে সালাত আদায়ের পর দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের নিকট ওমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর পক্ষ থেকে এসেছি। তাঁর কাছে এমন এমন সংবাদ পৌঁছেছে, সুতরাং তোমাদের আমিরের ব্যাপারে তোমাদের কি কোনো অভিযোগ ও মন্তব্য আছে? যদি থাকে তাহলে আমাকে তা বলো। তখন লোকজন সা'দ রা.-এর প্রশংসা করলেন, কেউ তাঁর ব্যাপারে খারাপ কোনো অভিযোগ বা মন্তব্য করলেন না। তাদের কেউ বললেন, তিনি হলেন সর্বোত্তম আমির; অপর একজন বললেন, এটা তো আমাদের জন্যে অনেক বড় সৌভাগ্য যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি আমাদের আমির। দূত কারো

কাছ থেকে কোনো অভিযোগ না পেয়ে আবার বললেন, একথা ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো কথা আছে কি?লোকেরা সকলে চুপ করে তার কথা শুনছিলো, কেউ কোনো কথা বললো না। অতঃপর দূত যখন সেখান থেকে ফিরে আসার ইচ্ছা করলেন এবং সা'দ রা.-এর প্রশংসা ব্যতীত কারো কোনো মন্তব্য শুনতে পেলেন না, তখন তিনি তাদের সকলকে আবার বললেন, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের সকলকে বলছি, একথা ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো কথা আছে কি-না আমাকে বল। তখন পেছন থেকে এক লোক বললো, আপনি যেহেতু আমাদেরকে আল্লাহর দোহায় দিয়ে বলছেন, সুতরাং আপনাকে সত্য বলা আমাদের জন্যে ওয়াজিব হয়ে গেছে। তিনি তখন তাকে বললেন, ঠিক আছে তোমার অভিযোগ কী বল? লোকটি তখন বলল, তোমার সা'দ সমানভাবে বণ্টন করে না, সে ন্যায়বিচার করে না এবং সে জিহাদে বের হয় না। অর্থাৎ সে আমাদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে না, আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করে না, আমাদের কেউ তার কাছে বিচার নিয়ে গেলে শত্রুতাবশত একজনের ব্যাপারে অন্যায় ফয়সালা করে। এবং সে কাপুরুষ, জিহাদে যেতে ভয় পায়, আমাদেরকে জিহাদে পাঠিয়ে সে ঘরে বসে থাকে।

এমন কথা কি সা'দ রা.-এর ব্যাপারে বলা যেতে পারে? একমাত্র সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-ই হলেন সেই সৌভাগ্যবান সাহাবি যার ব্যাপারে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'তোমার জন্যে আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক' তিনি বলেন (ارم يا سعدا فداك أبي و أمي) হে সা'দ! তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্যে আমার মাতা পিতা কুরবান হোক। উহুদের যুদ্ধের দিন কিছু সাহাবির ভুলের কারণে কাফেররা যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু করলো এবং মুসলমানগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখনমাত্র কয়েকজন সাহাবি কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে তীর নিক্ষেপ করছিল, সা'দ রা. তাঁদের অন্যতম। সা'দ রা. তীর নিক্ষেপ করে করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন এবং তাঁকে পাহাড়ের উপর একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলে

যাওয়ার জন্যে সাহায্য করছিলেন। সা'দ রা. যখন কাফেরদের দিকে তীর নিক্ষেপ করছিলেন তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, (ارم يا سعدا فداك أبي و أمي) হে সা'দ! তুমি তীর নিক্ষেপ কর, তোমার জন্যে আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। একমাত্র সা'দ রা.-ই হলেন সেই সাহাবি যার ব্যাপারে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার জন্যে আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। আর তুমি সেই সা'দের ব্যাপারে বলছো, সে ভীরু, কাপুরুষ; যুদ্ধে বের হয় না!!

সা'দ রা. জানতেন এই লোকটি তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলছে, সে তাঁর উপর জুলুম করছে। আর তিনি তো হালাল খাবার গ্রহণ করতেন, সুতরাং তিনি হাত উঠালেন এবং লোকটির জন্যে দোয়া করলেন। লোকটি বলছে সা'দ রা. ইনসাফ করে না; কিন্তু দেখো দোয়ার ক্ষেত্রেও সা'দ রা. কতটা ইনসাফ করে দোয়া করছেন!! তিনি দোয়ায় বললেন, হে আল্লাহ! যদি আপনার এই বান্দা অহংকারবশত এমনটি করে থাকে তাহলে আপনি তার হায়াতকে বৃদ্ধি করে দিন, সর্বদা তাকে দরিদ্রতার মধ্যে রাখুন এবং তাকে ফেতনায় পতিত করুন। এরপর সা'দ রা. সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন এবং বললেন, আমার মাঝে এবং তোমার মাঝে আল্লাহই যথেষ্ট হবেন, যিনি আমার সকল গোপন বিষয় জানেন এবং তোমার সকল গোপন বিষয় জানেন। তিনি আমার অতীত জানেন এবং তোমার অতীত সম্পর্কে জানেন, আর তিনিই আমার জন্যে তোমার ব্যাপারে যথেষ্ট হবেন। সা'দ রা. বলেন, আমি ইমারত (নেতৃত্ব) চাই না আর এর কিছুই চাই না। তিনি ইমারত ছেড়ে চলে গেলেন। আর তার দোয়া এই লোকের উপর লেগেই রইল, কারণ সা'দ রা.-এর ইন্তেকাল হয়ে গেল আর আল্লাহ তাআলা তো চিরঞ্জিব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। এই লোকটির হায়াত অনেক দীর্ঘ হল যে, সে বৃদ্ধ হতে হতে তার ভ্রূ ঝুলে চোখের উপর পড়ল। তার উপর কঠিন দরিদ্রতা নেমে এলো, ফলে সে রাস্তার পাশে বসে মানুষের নিকট হাত পেতে ভিক্ষা করা শুরু করলো। আর তার পাশ দিয়ে যখন কোনো মহিলা অতিক্রম করতো, তখন সে চোখ তোলে তার দিকে তাকাত, তাদেরকে হাত দিয়ে স্পর্শ করতো, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যেতো।

লোকেরা তখন তাকে বলতো, তোমার কি লজ্জ নেই? এমন বুড়ো বয়সে এমন কাজ করো। তোমার চেহারা নিয়ে কি তোমার লজ্জা হয় না? তুমি একজন বৃদ্ধ মানুষ, বয়সের ভারে চেহারা ঝুলে পড়েছে, রাস্তার পাশে বসে মানুষের কাছে ভিক্ষা করছো আর তোমার পাশ দিয়ে কোনো মহিলা অতিক্রম করলে তুমি হাত বের করে তাদেরকে স্পর্শ করো!! তোমার কি একটুও লজ্জা নেই।? যদি কোনো যুবক এমনটি করতো তাহলে অবশ্যই আমরা তাকে শাস্তি দিতাম; কিন্তু তোমার মত এমন একজন বৃদ্ধ একাজ কীভাবে করে? তখন সে বলত, আমি কী করবো? আমার উপর যে, সৎ ও নেককার সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর বদদোয়া লেগেছে।

সুতরাং তুমি তোমার খাবারকে হালাল ও পবিত্র করো, তাহলে মুস্তাজাবুদ দাওয়া হতে পারবে। (অর্থাৎ তোমার দোয়া কবুল করা হবে)

اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِیْنَ۝

'তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো। যারা আমার এবাদতে অহঙ্কার করে তারা সত্বরই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নমে দাখিল হবে।'[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। এবং তিনি আমাদের দোয়া কবুলের ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,(وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي) তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার নিকট দোয়া কর।

আমরা যদি আপনার নিকট দোয়া করি, তাহলে এর ফলাফল কী হবে? তিনি বলেন– (أَسْتَجِبْ لَكُمْ) তাহলে আমি তা কবুল করবো।

এবং আল্লাহ তাআলা আরো বলেন : (وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ) আল্লাহ তাআলার রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। হে আল্লাহ! আপনি কেনো

---

১. সুরা গাফির, আয়াত : ৬০

আমাদেরকে আপনার নাম সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন? তিনি বলেন : (فَادْعُوهُ بِهَا) তোমরা তাঁর (নামের) মাধ্যমে দোয়া করো।

তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করে বল– 'হে শ্রবণকারী! আমার দোয়া শ্রবণ করুন ও তা কবুল করুন। হে নিকটবর্তী! আমাকে আপনার নৈকট্য দান করুন। হে ক্ষমাশীল! আমাকে ক্ষমা করুন। হে শেফা দানকারী! আমাকে শেফা দান করুন। হে গোপনকারী! আমার দোষক্রটিগুলো গোপন করুন। হে ধনী-অমুখাপেক্ষী! আমাকে ধনাঢ্যতা দান করুন। এভাবে দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করবেন; কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। বরং কখনো কখনো আমরা নিজেরাই আমাদের মাঝে এবং দোয়া কবুলের মাঝে একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখি, যে প্রতিবন্ধকতার কারণে আমাদের দোয়া কবুল হয় না। আর এর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতাটি হলহালাল ও পবিত্র খাবার গ্রহণ না করা।

তুমি প্রবিত্র খাবার গ্রহণ কর, তাহলে মুস্তাজাবুদ দাওয়া হয়ে যাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির কথা বলেন, যে দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত ধূলোমলিন চুল ও চেহারার, যে আসমানের দিকে হাত তুলে বলে, হে আমার রব! হে আমার রব! তিনি বলেন, অথচ তার খানা-পিনা হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছেদ হারাম, সে যা ভক্ষণ করে তা হারাম, তাহলে তার দোয়া কবুল হবে কীভাবে!? একজন হারাম কজে লিপ্ত এবং নাপাকি তথা মদ পান করে, এরপর বলে, ভাই! আমার দোয়া কবুল হয় না। হাঁ, তোমার দোয়া তো কবুল হবেই না, কারণ তুমি তো মদ পান করো।

আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি মদাসক্ত অবস্থায় ইন্তেকাল করলো, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সাথে মূর্তি-পূজারীর মত সাক্ষাৎ করবে।

অন্য হাদিসে তিনি বলেন :

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের পূঁজ ও মলমূত্র পান করাবেন।

কখনো কখনো তুমি অন্যায়ভাবে মানুষের হক ভক্ষণ করো। শ্রমিকের পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দাও না। তোমার বাড়ির অসহায়া কাজের মেয়েটিকে তার প্রাপ্য ভাতা প্রদান করো না। আর তুমি আবার অভিযোগ করে বলো, আমার দোয়া কবুল হয় না??

গতকাল আমার কাছে একজন ফাতওয়া চেয়েছে যে, শায়খ! আমার ভাইয়ের নিকট এক কাজের মেয়ে সাত বছর ধরে কাজ করে, এই সাত বছরে সে তার কাছ থেকে বেতন গ্রহণ করে নি এবং সে ব্যক্তি বেতন তার পরিবারের নিকট পাঠাতেও রাজি নয় এবং সে তা খরচও করে নি। এখন আমার ভাইয়ের নিকট তার কি কোনো হক আছে? সে কি আমার ভাইয়ের নিকট বেতন পাবে?

হে ভাই! এক মহিলা একটি বিড়ালকে আটকে রাখার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাহলে তোমার কী ধারণা আল্লাহর বান্দার উপর জুলুম করলে কী অবস্থা হবে? হে ভাই! একজন ইহুদিও যদি তোমার নিকট কাজ কারে, তাহলে তোমার উপর ওয়াজিব হল তুমি তার পারিশ্রমিক ঠিক মত দিবে। তাহলে এখন অন্যদের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা?

তুমি তোমার খাবারকে পবিত্র রাখো; তাহলে তুমি দোয়া করলে তা কবুল হবে। আমি আমার ছেলে-মেয়েদের বলি, তোমরা মদ ও ধূমপান করা থেকে সাবধান থাকবে, কারণ এগুলো হল নাপাকি, কারণ আল্লাহ তাআলা পবিত্র জিনিসকে হালাল করেছেন এবং অপবিত্র জিনিসকে হারাম করেছেন। তোমরা চুরি ও মানুষের সাথে প্রতারণা থেকে সাবধান থাকবে এবং সাবধান থাকবে অন্যায়ভাবে মানুষের মাল ভক্ষণ করা থেকে।

আল্লাহ তাআলার নিকট আমার জন্যে এবং আপনাদের সকলের জন্যে প্রার্থনা করি যে, আমরা যেখানেই থাকি তিনি যেনো আমাদের উপর রহম ও বরকত দান করেন এবং তাঁর নিকট এই প্রার্থনা করি তিনি যেনো আমাদের পবিত্র খাবার খাওয়ার তাওফিক দান করেন। আমিন।

Contents

এক গুনাহগার ব্যক্তির গল্প

এখন আমরা এক গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গল্প বলবো, এক মদ্যব লোকের গল্প বলবো। আবু মিহজান আস-সাকাফি রা.-এর গল্প বলবো।মদের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি থাকার কারণে জাহেলিয়াতে থাকাঅবস্থায় আবু মিহজান আস-সাকাফি একটি কবিতায় তার ছেলেকে অসিয়ত করে বলেছিলো–

'আমি যখন মারা যাবো, তখন তুমি আমাকে আঙ্গুর বাগানের পাশেকবর দিবে। যাতে আমার মৃত্যুর পরে আমার হাড্ডিগুলো এর রস পান করতে পারে।'

'তুমি আমাকে নির্জন প্রান্তরে দাফন করো না, কারণ আমার ভয় হয় যে, তাহলে আমি মরে গেলে এর (মদের) স্বাদ আর কখনো গ্রহণ করতে পারবো না।'

অতঃপর যখন ইসলামের আগমন ঘটলো, আবু মিহজান আস-সাকাফি রা. ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি মদ পান করতেন। এরপর মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে যখন শরয়ি হুকুম জারি হল, আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۝

'হে মুমিনগণ! এই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?,'[১]

---

১. সুরা মাইদা, আয়াত : ৯১

তখন সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, হে আমাদের রব! আমরা তো ধ্বংস হয়ে গেছি। হে আমাদের রব! আমরা তো ধ্বংস হয়ে গেছি। আবু মিহজান রা.ও বললেন, হে আমাদের রব! আমরা তো ধ্বংস হয়ে গেছি, আমরা তো শেষ হয়ে গেছি। যখন মদ পান হারাম হয়ে গেল, তখন আবু মিহজান রা. কী করলেন?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আবু মিহজান রা. কখনো কখনো মদ পান করতেন আর তখন তাঁকে এর হদ-শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাত করা হত। এরপর তিনি আবারও মদ পান করতেন এবং তাঁকে আবারও এর হদ হিসেবে বেত্রাঘাত করা হত। তিনি কিছুদিন মদ পান করা থেকে বিরত থাকতেন; কিন্তু এর কিছুদিন পরই আবার শয়তান তাঁকে ধোঁকা দিত আর তিনি মদ পানে লিপ্ত হতেন, তখন তাঁর উপর এর হদ প্রয়োগ করা হতো; কিন্তু তিনি কখনই ইমান থেকে বের হননি এবং সালাত আদায় করা ত্যাগ করেন নি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহগারদের সাথে সবসময় ভাল ব্যবহার করতেন। কেউ যদি এমন কোনো অন্যায় করতো যার জন্য শরিয়তে হদ বা শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে, তাহলে তিনি এর জন্যে তাঁর উপর শরয়ি হদ প্রয়োগ করতেন; কিন্তু এরপর তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার করতেন, তাঁকে সৎকাজের জন্যে উৎসাহ দিতেন, গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি গুনাহগার ভেবে তাঁকে দূরে ঠেলে দিতেন না।

মদ পান করা একটা খারাপ কাজ, সে মদ পান করলো মানে একটা খারাপ কাজ করল, অতঃপর যদি সালাত আদায় করে, তাহলে সে একটা ভাল কাজ করলো। যেহেতু মদ পান করাটা অনেক বড় একটা পাপ এবং এর প্রভাব মানুষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বাকি থাকে আর সালাত অল্প সময়ের ইবাদত, তাই আমরা ধরে নিতে পারি যে, তাঁর মধ্যে ভালোর পরিমাণটা হল ত্রিশ পার্সেন্ট (৩০%) আর খারাবির পরিমাণটা সত্তর পার্সেন্ট ৭০%। মদ পান করা সত্ত্বেও সে যেহেতু সালাত আদায় করে, তাহলে আমাদের বলতেই হবে যে, তার মধ্যে আল্লাহর মুহাব্বত ও ইসলামের ভালবাসা আছে। যদিও তা পরিমাণে কম, মানে একশত পার্সেন্টের মধ্যে

তিরিশ পার্সেন্ট মাত্র। তবুও কিন্তু তাঁর মধ্যে আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত আছে। এটা বলা যাবে না যে, তার মধ্যে আল্লাহর মুহাব্বত একেবারেই নেই। এরপর আসুন মদ পান করার সাথে সাথে সে দান-সদকা করে, সন্তান লালনপালন করে, মাতা-পিতার সেবা-যত্ন করে। অর্থাৎ আরো অনেকগুলো ভাল কাজ সে করে। তাহলে আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে, সে একটা খারাপ কাজ করার বিপরীতে অনেকগুলো ভাল কাজ করে। অর্থাৎ এখন যদি আমরা পার্সেন্টিসের হিসেবটা করি তাহলে এমন দাঁড়াবে যে, তাঁর মধ্যে খারাপ বা মন্দ কাজের প্রবণতা ৩০% অথবা ৪০% আর ভালোর প্রবণতা ৭০% বা ৬০%। অর্থাৎ তাঁর ভালোর পরিমাণটা খারাপের চেয়ে বেশি। তাহলে আমাদের উচিত হবে তাঁকে সহাভূতির সাথে ভালকাজের প্রতি আরো বেশি উৎসাহিত করা। আমাদের জন্যে কখনই এটা উচিত হবে না যে, তাঁর সাথে খারাপ ব্যবহার করা। তুমি মদ পান করো, সুতরাং তুমি আমাদের থেকে দূরে থাকো, আমাদের কাছে আসবে না; একথা বলে তাঁকে দূরে সারিয়ে দেওয়া আমাদের জন্যে কখনই উচিত হবে না। তাহলে সে ভালোর দিকে আসার পরিবর্তে দিন দিন আরো বেশি করে খারাপের মধ্যে ডুব দিতে থাকবে। অর্থাৎ খারাপের মধ্যে ৪০% থেকে ৪৫% চলে যাবে, এরপর আমরা যখন তাঁর সাথে আরো বেশি খারাপ আচরণ করবো তখন সেই পরিমাণটা আরো বাড়তে থাকবে, অর্থাৎ ৪৫% থেকে ৫০% চলে যাবে। বরং তাঁর সাথে আমাদের ভাল ব্যবহার করা উচিত। আমরা যদি তাঁর সাথে খারাপ ব্যবহারের পরিবর্তে ভাল ব্যবহার করি, সহানুভূতির সাথে তাকে বলি যে, ভাই তুমি মদ পান করো ঠিক আছে; কিন্তু তুমি তো মাতা-পিতার খেদমত করো। ইন-শা-আল্লাহ তাঁদের দোয়ার বরকতে একদিন তুমি তাওবা করবে মদ পান ছেড়ে দিবে। তুমি তো সালাত আদায় করো, তুমি সালাত আদায় করতে থাকো, ইন-শা-আল্লাহ একদিন দেখবে সালাত তোমাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন 'নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে' আর মদ পানও তো একটা খারাপ কাজ, সালাত তোমাকে সেটা থেকেও বিরত রাখবে। আমরা যখন তাঁকে এভাবে ভাল কাজের

প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকবো তখন ধীরেধীরে তাঁর মধ্যে ভাল কাজের পরিমাণটা বাড়তে থাকবে এবং খারাপ কাজের প্ররিমাণটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে।

আবু মিহজান রা.-এর ঘটনা শেষ করার পূর্বে অন্য আরেকজনের একটি ঘটনা বলি। আবদুল্লাহ নামে এক সাহাবি ছিলেন যাকে মানুষ হাম্মার (গাধার মালিক) বলে ডাকত। এটা তাঁকে তিরস্কার করে বা গালি দিয়ে ডাকত না। যেমন আমরা বর্তমানে কাউকে 'বাজ' বলে সম্বোদন করে তাঁর ধূর্ততা ও চালাকি বুঝায়, এর মাধ্যমে তাঁকে কিন্তু একটি হিংস্র পাখি বুঝায় না বরং তাঁর ধূর্ততা ও চালাকি বুঝায়। অনুরূপভাবে সাহসী লোককে আমরা সিংহের সাথে তুলনা করি, তাঁকে সিংহ বলার মাধ্যমে আমরা বনের কোনো হিংস্র প্রাণী বুঝাই না। পূর্বেও মানুষ একজন অপরজনকে এধরনের বিভিন্ন খেতাবে ডাকত। সুতরাং তাঁরা ধৈর্যশীল মানুষকে হাম্মার বলে ডাকত। আবদুল্লাহ আল-হাম্মার রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক মুহাব্বত করতেন। তিনি সর্বদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু হাদিয়া দিতে চাইতেন; কিন্তু তিনি ছিলেন দরিদ্র, তাঁর টাকা-পয়সা ছিলো না। তিনি একবার বাজারে গেলেন, তখনকার বাজারও এখনকার বাজারের মত ছিলো না, তখন মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে পণ্য নিয়ে বাজারে যেতো এবং বিক্রি করে চলে আসতো।এই সাহাবিও বাজারে গেলেন এবং তাঁর একটা জিনিস পছন্দ হল, সে তাঁর মালিকের সাথে দর-দাম করে তাকে বললেন, ঠিক আছে তুমি আমার সাথে আসো, আমি তোমাকে এর মূল্য পরিশোধ করে দিচ্ছি। সাহাবি লোকটিকে সঙ্গে করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন এবং তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটা আপনার জন্যে হাদিয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদিয়া গ্রহণ করলেন, তখন সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি এটার মূল্য পরিশোধ করে দিন, একথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকাল এবং বললো, এটাকি তুমি আমাকে হাদিয়া দাওনি? সে বলল, হাঁ! হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটা আমার পক্ষ

থেকে আপনার জন্যে হাদিয়া; কিন্তু আমি দরিদ্র মানুষ, আমার কোনো টাকা-পয়সা নেই, তাই আপনি এটার মূল্য পরিশোধ করে দিন। সুবহানাল্লাহ! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর মুহাব্বত ছিলো এমনই অকৃত্তিম। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে লোকটির ভালোবাসা ছিলো চমৎকার; সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত মুহাব্বত করতো; কিন্তু লোকটি মদ পান করতো, কারণ সে জাহেলি যুগ থেকেই ছিলো মদাসক্ত। তাঁকে এ কাজ থেকে অনেক নিষেধ করা হতো; কিন্তু কখনো কখনো তাঁর মনদুর্বল হয়ে যেতো আর সে মদ পান করতো। সে যখনই মদ পান করতো তখন তাঁকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হত এবং এর শাস্তিস্বরূপ তাঁকে বেত্রাঘাত করা হত, অতঃপর সে চলে যেতো। এভাবেই একদিন তাঁকে মদ পান করার শাস্তি দেওয়ার পর সে বের হচ্ছিল, তখন এক সাহাবি তাঁকে বললো, তোমার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক, এতবার শাস্তি দেওয়ার পরও তুমি মদ পান করো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি তাঁকে লানত করো না, কারণ আমি জানি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মুহাব্বত করে, তাঁদের ভালবাসে। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কল্যাণের দিকে, তাঁর ভাল কাজের দিকে লক্ষ করেছেন; তাঁর মন্দ দিকটির প্রতি কিন্তু তিনি লক্ষ করেন নি এবং বারবার মদ পান করার পরও তাঁকে তিরস্কার করেন নি। বরং তাঁকে সৎ ও ভাল কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আবু মিহজান রা. ছিলেন একজন সৎ, নেককার ও মুত্তাকি লোক; কিন্তু কখনো কখনো তাঁর পা পিছলে যেতো, তিনি মদ পান করে ফেলতেন। কাদিসিয়ার যুদ্ধের সময় তিনিও মুজাহিদিনের সাথে যুদ্ধে বের হলেন। যুদ্ধের আমির ছিলেন সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.। ময়দানে পৌঁছার পর সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. এবং কাফের সেনাপতির মধ্যে দীর্ঘ পত্র আদানপ্রদান হল। এটা অনেক দিন চলতে থাকল। এই সময়ে আবু মিহজান রা.-এর মদের প্রতি আগ্রহ দেখা হল এবং ধীরেধীরে তা চূড়ান্ত

আকার ধারণ করল; কিন্তু তিনি এখানে এত মুজাহিদিনের মধ্যে কীভাবে মদ পান করবেন?

আবু মিহজান রা. লুকিয়ে একটি নিরাপদ স্থানে চলে গেলেন এবং চারপাশটা ভালভাবে দেখে নিয়ে মদ পান করলেন; কিন্তু তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধরা পড়লেন। তাঁকে গ্রেফতার করে আমিরুল মুজাহিদিন আমির সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর নিকট নিয়ে আসা হল। সা'দ রা. তাঁকে ধরে একটি ঘরের মধ্যে বন্দিকরে রাখলেন এবং তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করে দিলেন। তখন আবু মিহজান রা. কী করলেন? তিনি কি এটাকে নিজের জন্যে আশির্বাদ মনে করে হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলেন? না, আবু মিহজান রা. বরং নিজের জন্যে এটাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের বিশাল সাওয়াব থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করলেন। তিনি অনেক অস্থির হয়ে পড়লেন এবং বললেন, এটা স্থিরতার বিষয় নয়। আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে বিশাল সওয়াবের অধিকারী হওয়ার জন্যে এসেছি আর সা'দ রা. আমাকে মদ পানের অপরাধে এই সাওয়াব অর্জন থেকে বিরত রাখছে। আবু মিহজান রা. ঘরে বন্দি অবস্থায় বসে আছেন, বাইরে যুদ্ধ চলছে। ঘোড়ার খুরের আওয়ায ও তীর-তরবারির ঝনঝনানি তাঁর কানে আসছে। তিনি বাইরে যুদ্ধের আওয়ায শুনে অস্থির হয়ে চিৎকার করতে লাগলেন।

এবং বলতে লাগলেন :

كفي حزنا أن تدخل الخيل بالقني *وأترك مشدودا علي وثاقي

إذا قمت عناني الحديد و غلقت*مصاريع دوني تصم المنادي

يقطع قلبي حسرة أن أري الوغ*ولاسامع صوتي ولامن يرانا

وأن أشهد الإسلام يدعومغوثا*فلاأنجدالإسلام حين دعانا

وقد كنت ذا مال و إخوة*وقد تركوني واحدا لا أخ ليا

فلله عهد لا أحيف بعهده*لأن فرجت لا أزور الحوانيا

'দুঃখ করার জন্যে তো এটাই যথেষ্ট যে, ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করছে আর আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলে রাখা হয়েছে।'

'আমি যখন দাঁড়াতে যাই তখন দেখি আমাকে লোহার লাগাম পড়িয়ে বদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং যুদ্ধের শোরগোলের কারণে আমার আহ্বানও কেউ শুনতে পায় না।'

'যুদ্ধ শুরু হতে দেখে পরিতাপে আমার অন্তর কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু আমার আওয়ায শুনার মত কেউ নেই এবং আমাকে দেখার কেউ নেই।'

'আমি দেখছি ইসলাম একজন সাহায্যকারীর সন্ধান করছে; কিন্তু সে যখন আমাকে ডাকছে আমি তার কোনো সাহায্য করতে পারছি না।'

'আমি ছিলাম অনেক সম্পদের অধিকারী, এবং আমার অনেক ভাই ছিলো; কিন্তু তারা সকলেই আমাকে একা ফেলে চলে গেছে; এখন আমার কোনো ভাই নেই।'

'আমি আল্লাহর সাথে অঙ্গিকার করছি। আমি তাঁর অঙ্গিকার কখনো ভঙ্গ করবো না। আমি যদি এখান থেকে মুক্ত হতে পারি তাহলে আর কখনই পানশালায় যাবো না।' (মদ পান করবো না)

এরপর তিনি বাড়িতে থাকা লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, বাড়িতে কি কেউ আছেন? বাড়িতে কি কেউ আছেন? তিনি জানতেন যে, এই বাড়িতে একজন মহিলা আছেন আর তিনি সেনাপতি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা.-এর স্ত্রী। সে সময় দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলতে থাকত, কখনো কখনো তা পাঁচ-ছয় মাস পার্যন্ত চলত। তাই তাঁরা স্ত্রীদের নিয়ে যুদ্ধে বের হতেন এবং তাঁদেরকে যুদ্ধের পিছনে দূরে তাবুতে রেখে যেতেন। আবু মিহজান রা. জানতেন তাকে যে বাড়িটিতে আটকে রাখা হয়েছে তাতে কেউ একজন আছে, তাই তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, বাড়িতে কি কেউ আছেন? বাড়িতে কি কেউ আছেন? তখন সা'দ রা.-এর স্ত্রী সালমা তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি তাঁকে কী বললেন? এরপর কি তিনি যুদ্ধে শরিক হয়েছেন?

সালমা রা. এসে তাঁকে বললেন, তোমার কী প্রয়োজন? আমাকে ডাকছো কেনো? সালমা মনে করেছিলেন সে পানি অথবা খাবার চাচ্ছে; কিন্তু না

তিনি খাবার চান নি এবং পানিও চান নি। তিনি বললেন, হে সালমা! আমাকে মুক্ত করে দাও এবং আমাকে আমার তরবারি ও সা'দ রা.-এর ঘোড়া 'বালকা'কে দাও, কারণ তিনি জানতেন সা'দ রা. যুদ্ধে শরিক হননি; তিনি আহত, ঘোড়ার উপর বসে থাকতে পারেন না, তাই তিনি বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছেন এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন আর তাঁর ঘোড়া বাড়ির পিছনে বাঁধা আবস্থায় আছে। সা'দ রা. যদিও সমস্যার কারণে যুদ্ধে শরিক হতে পারেননি কিন্তু নিন্দুকরা তো আর ওজরগ্রস্ত ছিলেন না, তারা এই বসে থাকাকে ব্যঙ্গ কর বলেছে:

وعدنا وقد آمت نساء كثيرةونسوة سعد ليس فيهن أيم

'সে আমাদের কাছ থেকে যুদ্ধের অঙ্গিকার গ্রহণ করে আর অনেক নারী বিধবা হয়। অথচ সা'দের স্ত্রীর বিধবা হওয়ার কোনো ভয় নেই।'

(অর্থাৎ সা'দ রা. তো যুদ্ধই করে না, তাহলে সে নিহত হবে কীভাবে)

আবু মিহজান রা. বললেন, তুমি আমাকে মুক্ত করে দাও এবং আমাকে তরবারি ও বালকা দাও। আমি তোমাকে আল্লাহর নামে ওয়াদা করে বলছি আমি যদি নিরাপদ এবং বেঁচে থাকি তাহলে আবার ফিরে এসে স্বেচ্ছায় হাত-পা শিকলে দিয়ে বন্দিত্ব বরণ করবো। আর যদি যুদ্ধে নিহত হই তাহলে তো তোমরা আমার থেকে মুক্ত হয়ে গেলে। তিনি তখন তাঁকে মক্ত করে দিলেন এবং তাঁকে তরবারি ও বালকা ঘোড়া দিলেন। সা'দ রা. এসবের কিছুই জানতেন না, কারণ তিনি তখন বাড়ির সাদের উপর থেকে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। এদিকে আবু মিহজান রা. মুক্ত হয়ে তারবরি হাতে নিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন এবং যুদ্ধের দিকে ছুটে চললেন। তখন যুদ্ধের অবস্থা তুঙ্গে। ঘোড়া তাঁকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঢুকে পড়লো এবং একবার ডানদিকে, একবার বাম দিকে, একবার সামনের দিকে, একবার পিছনের দিকে ছুটতে লাগল। আর তিনি ঘোড়ার উপর মজবুত পাথরের ন্যায় বসে কাফেরদের উপর তীব্র আক্রমণ চালালেন; তাদের হত্যা করছেন এবং তাদের দিক থেকে আসা আক্রমণগুলো প্রতিহত করছেন।

এদিকে দূর থেকে সা'দ রা. এই দৃশ্য দেখছেন আর অবাক হচ্ছেন। তিনি ভাবছেন এমন বীরত্বের সাথে কে যুদ্ধ করছে? তিনি মনে মনে বলছেন যোদ্ধাকে দেখে তো আবু মিহজানের মত মনে হয় আর ঘোড়াকে দেখতে বালকার মত; কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? বালকা ঘরের পিছনে বাঁধা আর আবু মিহজান ঘরের ভিতরে বন্দি অবস্থায় আছে? যদি ধরেও নেই এটা বালকা, তাহলে আবু মিহজান কীভাবে এটার উপর উঠল? আর যদি মনে করি যে, এটা আবু মিহজান তাহলে সে বালকাকে পেল কোথায়? এভাবে সূর্য ডুবে গেল, উভয় পক্ষের সৈনিকরা আজকের মত যুদ্ধ বন্ধ করে নিজ নিজ তাবুতে ফিরে গেল। আবু মিহজান রা. ফিরে এলেন তাঁর চেহারায় রক্তের দাগ, তাঁর কাপড় ছেঁড়া, কারণ তিনি তো যুদ্ধে গিয়েছেন, তিনি তো আর বিবাহ করতে যান নি যে. কাপড় ও শরীর পরিচ্ছন্ন থাকবে। আবু মিহজান রা. ফিরে এসে বালকাকে যথাস্থানে বেঁধে নিজের পায়ে বেড়ি পরে বন্দি হলেন।

তখন সা'দ রা. সাদ থেকে নেমে ঘোড়ার কাছে গেলেন এবং দেখলেন, এর শরীর থেকে ঘাম ঝরছে, তিনি বুঝে গেলেন যে, এটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। অতঃপর আবু মিহজান রা.-এর দিকে গেলেন আর তাঁর মধ্যে যুদ্ধের ছাপ দেখতে পেলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু মিহজান! তুমি কি যুদ্ধ করেছো? তিনি বললেন, হাঁ আমি যুদ্ধ করেছি। আমি তোমার কাছে আল্লাহর শপথ করে ওয়াদা করছি যে, আমি আর কখনো মদ পান করবো না। সা'দ রা. তখন বললেন এবং আমিও তোমাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, তুমি যদি মদ পান না করো তাহলে আমিও তোমাকে আর শাস্তি দিবো না।

এরপর আবু মিহজান রা. অনেক বড় মুজাহিদ হয়েছিলেন, কারণ শয়তান তাঁকে একথা বলে ধোঁকা দিয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারেনি যে, আবু মিহজান! তুমি কীভাবে দীনের খেদমত করবে? এতে তোমার কী লাভ হবে? তুমি তো মদখোর? তুমি একজন ফাসেক, পাপাচারী, মদ পান করো, তাহলে কীভাবে তুমি দীনের খেদমত করবে? কীভাবে তুমি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে? অথচ তুমি একজন মদ্যপ! না শয়তান তাঁকে এভাবে ধোঁকা দিতে পারেনি। মানুষ যতক্ষণ

Contents

পর্যন্ত মুসলিম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দীনের কোনো না কোনো কাজে তাঁর প্রয়োজন অবশ্যই হবে।

এই দীন যেমন কামেল ও পরিপূর্ণ ইমানদারের মাধ্যমে উপকৃত হয়, ঠিক তেমনিভাবে একজন অসম্পূর্ণ ইমানদারের মাধ্যমেও উপকৃত হয়, অনুরূপভাবে একজন গুনাহগার ও পাপাচারী মুমিনের মাধ্যমেও উপকৃত হয় এবং কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমেও উপকৃত হয়। একজন কবিরা গুনাহে লিপ্ত; কিন্তু সে যদি একটা মসজিদ নির্মাণ করে তাহলে এতে সমস্যার কী আছে? হাঁ, সে গুনাহগার, কবিরা গুনাহে লিপ্ত; কিন্তু তাঁর এই মসজিদ নির্মাণ তো একটা পূণ্যের কাজ এবং সে তো এই মসজিদ নির্মাণের মধ্যেমে তাঁর কবিরাহ গুনাহ থেকে তওবা করবে। এতে কী সমস্যা যে, একজন লোক কখনো কখনো সালাত ত্যাগ করে, তা সত্ত্বেও সে মানুষকে মদ পান করা থেকে বিরত থাকতে বলে এবং মানুষকে সালাত আদায়ের আদেশ করে সে বলে, হে অমুক! আল্লাহকে ভয় করো সালাত আদায় করো। সে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করলে সমস্যা কী? হোক-না দীন পালনের ক্ষেত্রে তার ঘাটতি আছে। এমনকি কেউ আছে যে, সে কখনো ভুল করে নি, গুনাহের কাজ করে নি? এমনকি কেউ আছে যে, সারা জীবন শুধু নেকির কাজই করেছি?

মানুষ গুনাহে লিপ্ত হলেও তাকে সর্বদা এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাকেও উদ্দেশ্য করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

'আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে এবং উত্তমরূপে উপদেশ শুনিয়ে।'[১]

---

১. সুরা নাহাল, আয়াত : ১২৫

এবং এ আয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাকে উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকাজ করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ মুসলিম, তাঁর অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে?'[১]

আমরা যতই গুনাহগার হই না কেনো আল্লাহ তাআলার সকল আয়াতের উদ্দিষ্ট আমরাই। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান থাকবো আমরাই তার সকল আয়াতের উদ্দিষ্ট। এবং আমরা চেষ্টা করবো তিনি যেনো আমাদের একটা ভালোকাজের মাধ্যমে অন্য একটা খারাপ কাজ মুছে দেন।

এক লোক হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহর নিকট আসলে হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন, হে লোক! তুমি কি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করো? সে বললো, না। তিনি বললেন, কেনো? সে বললো, আমার ভয় হয় যে, আমি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করবো আর আমি নিজেই তা করবো না এবং আমি মানুষকে অসৎ কাজের নিষেধ করবো আর আমি নিজেই তাতে লিপ্ত থাকবো, কারণ আমি অনেক ভুল করি, আমি অনেক গুনাহে লিপ্ত। তখন হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, সুবহানাল্লাহ! শয়তান তো এটাই চায় যে, সে তোমাদের এভাবেই ধোঁকা দিবে। হে লোক! আমাদের মধ্যে কে আছে যে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? যে কোনো একটা বিতর্কিত কাজেও লিপ্ত নয়? তা সত্ত্বেও তো আমরা মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করি, কে জানে হয়তো এর মাধ্যমে একজন লোক মুক্তি পেয়ে যাবে? সুতরাং শয়তান যেনো তোমাকে নিয়ে আর খেলা করতে না পারে এবং তোমাকে ধোঁকা দিতে সফল না হয়। এমকি কেউ যদি গুনাহ ও পাপাচারের ঘর থেকেও বের হয় এবং তাতে কোনো ভিক্ষুক তার কাছে হাত পাতে তাহলে তখনও যেনো সে তাকে সদকা করে। তুমি তো এর বিনিময়ে প্রতিদান

---

১. সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৩৩

পাবে। তুমি বলবে,শায়খ! আমি তো এই মাত্র মদ পান করেছি অথবা কোনো অশ্লীল কাজ করার কারণে আমি এখনও তো নাপাক। আরে ভাই এটা একটা কাজ আর ওটা আরেকটা কাজ। তুমি গুনাহের কাজ করেছো, এর জন্যে আল্লাহ তাআলা তোমার হিসেব নিবেন। অনুরূপভাবে তুমি কোনো নেকির কাজ করলে তার হিসেবও আল্লাহ তাআলা করবেন।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধে বেরুতেন তখন তিনি কিন্তু একথা বলে ঘোষণা দিতেন না যে, আমাদের সাথে কেবল পুত-পবিত্র লোকেরাই বেরুতে পারবে, যারা কখনো কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়নি কেবল তারাই আমাদের সাথে যেতে পারবে। না, তিনি কখনই এমন আদেশ দেননি, কারণ তাঁর সাথে যারা জিহাদে বেরুতো তাঁরা কেউ ফেরেশতা ছিলো না যে, তাঁরা কখনো আল্লাহর কোনো আদেশের অমান্য করবে না বরং সর্বদা তাঁর আদেশ মেনে চলবে। বরং নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, তাঁর সাথে যারা যুদ্ধে যাচ্ছে তাঁরা হল আদম সন্তান, আর আদম সন্তান ভুল করবেই। তাই তো তিনি বলেন :

'প্রতিটি আদম সন্তানই ভুল-অন্যায়কারী আর সবচে ভাল অন্যায়কারী হল সে যে তাওবাকারী ও অনুপপ্ত।'

সুতরাং এসো আমার সকলেই একমত হই যে, আমাদের মধ্যে যারা মাদ্রাসায় আছে, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে এবং যত বন্ধু আছে, হোক তারা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে একসাথে থাকার কারণে বন্ধুত্ব হয়েছে অথবা কোনো এক সফরে গিয়ে তার সাথে পরিচয় হয়েছে অথবা অন্য কোনোভাবে, আমারা যে যতটুকু পারি নেককাজ করবো এবং কাউকে কোনো অন্যায় কাজ করতে দেখলে তাকে বাধা দিবো, হোক-না আমার মধ্যে কোনো একটা বিষয়ে ঘাটতি আছে, আমি কোনো একটা অপরাধের সাথে জড়িয়ে আছি; কিন্তু এটা যেনো আমাকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থেকে বিরত রাখতে না পারে। অনুরূপভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বাজারে অথবা অন্য কোনো স্থানে সকল বোনদের বলছি, যখন আপনি বাজারে যাচ্ছেন আপনি দেখলেন, আপনারই কোনো সহপাঠী বা

পরিচিত কেউ কোনো একটা খারাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে আপনি তাকে তা থেকে নিষেধ করবেন, এমনকি আপনি যদি হিজাববিহীন বেপর্দায়ও থাকেন এবং আপনার মধ্যে কোনো গুনাহের বিষয়ও থাকে তবুও আপনি তাকে তা থেকে নিষেধ করবেন। আপনি তাকে বলবেন হে বোন! এটা ঠিক যে আমি এখন বেপর্দায় আছি, এটা একটা গুনাহের কাজ; কিন্তু তুমি যা করছো এটা অন্যায়, সুতরাং তুমি এ কাজ থেকে বিরত থাক। অথবা আপনি কোনো বোনকে দেখলেন যে, সে সালাত আদায় করছে না তখন আপনি তাকে সালাত আদায় করতে বলবেন, আপনি তাকে বলবেন বোন! তুমি পর্দা করো না ঠিক আছে, তবে সালাতটা তো কমপক্ষে আদায় করো, কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

'মুসলমান এবং কাফের-মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হল সালাত ছেড়ে করা।'

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে যে চুক্তি রয়েছে তাহল সালাত, সুতরাং যে সালাত ত্যাগ করল সে কুফরি করলো।'

হাঁ, আপনি যদি বেপর্দাও থাকেন তাহলে আপনি কোনো সালাত ত্যাগকারীকে সালাতের আদেশ দিলে আপনার কি কোনো ক্ষতি হবে? আপনি অবৈধ কাজে লিপ্ত কাউকে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত হতে বললে আপনার কি কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে? আমরা যখন মানুষকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাকবো এবং ভাববো যে, পুরো কুরআনে কারিম আল্লাহ তাআলা আমাকেই সম্বোধন করেছেন, তাহলে আবার সাহাবাদের যুগ ফিরে আসবে।

আবু মিহজান রা. যদিও একটা ভুলের মধ্যে ছিলেন এবং একটা গুনাহ করতেন, তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে কখনো খাটো করো দেখেন নি। তিনি বলেছেন, হাঁ আমি একটা ভুলে পতিত, আমার দ্বারা একটা কবিরা গুনাহ হয়ে যায় এবং একটা বিষয়ে শয়তান আমাকে নিয়ে খেলা করে; কিন্তু আমি কিছুতেই শয়তানকে এই সুযোগ দিব না যে, শয়তান আমার উপর

এর চেয়েও বেশি প্রভাব বিস্তার করুক। আমাকে আরো বেশি গুনাহের কাজে লিপ্ত করুক। হাঁ এটা সত্য যে, শয়তান আমাকে একবার ধোঁকা দিয়েছে, আমি মদ পান করেছি, একবার ধোঁকা খেয়েছি; কিন্তু আমি তাকে এর চেয়ে বেশি সুযোগ দিব না, আমি জিহাদ থেকে বিরত থাকবো না বরং আমি জিহাদ করবো এবং দীনের সাহায্য করবো। আর একারণেই দীনের বিজয় হয়েছে। এমন অসংখ্য মানুষের মাধ্যমে দীনের বিজয় হবে শয়তান যাদেরকে ধোঁকা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি।

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাদের এবং আপনাদের তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করুন। এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেনো তিনি আমাদেরকে তাঁর কল্যাণ ও বরকতের সাথে রাখুন। আমিন।

আমরা যে কত নেকি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি!!

জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর চাওয়া ও কামনার ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্নধরনের। আমাদের হাবিব, আমাদের নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রা.কে জান্নাতের উঁচুস্তর কামনা করার জন্যে উৎসহিত করতেন। সাহাবাদের মধ্যে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু স্তর অর্জনের জন্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহাবায়ে কেরামের জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের ধরন থেকেই এটা বুঝা যায় যে, তাঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিষয়টাই কামনা ও পেতে চাইতেন। উদাহরণস্বরূপ বলছি, যেমন একজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কোনোটি? একটু ভেবে দেখো যে, সকল আমলই তো পছন্দনীয়; কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কোনোটি? তাই তাঁর প্রশ্ন হল, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কোনোটি? তিনি বলেন, সময়মতো সালাত আদায় করা।অপর একজন এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Contents

ওয়াসাল্লাম! কিয়ামতের দিন আপনার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী কে থাকবে? লক্ষ করে দেখুন, এখানে কিন্তু সে এই প্রশ্ন করে নি যে, কারাকারা আপনার নিকটবর্তী থাকবে? বরং তাঁর প্রশ্ন হল, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কিয়ামতের দিন আপনার সবচেয়ে বেশি নিকবর্তী কে থাকবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তীসে-ই থাকবে, যার আখলাক-আচরণ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুন্দর হবে। এক সাহাবি এক যুদ্ধের শুরুতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বান্দার কোন আমল দেখে আল্লাহ তাআলা বেশি খুশি হন এবং তিনি হাসেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে শত্রুদের ভিতরে গিয়ে যুদ্ধ করে। চতুর্থ আরেক জন এসে প্রশ্ন করে, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে উত্তম আমল কোনোটি? অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম রা. সর্বদা জান্নাতের উঁচুস্তর ও সবচেয়ে উঁচুমর্যাদা কামনা করতেন। আর একারণেই প্রতিটি কল্যাণকর কাজের বিষয়ে তাঁরা অনেক আগ্রহী থাকতেন। এবং আমলের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। জান্নাতের উঁচু মর্যাদা নিয়ে প্রতিযোগিতাকারী সাহাবিদের মধ্যে একজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.। জানাযার নামাজ নিয়ে তাঁর একটি চমৎকার ঘটনা রয়েছে, এখন আমরা এখানে সেই ঘটনাটি উল্লেখ করছি।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. আবু হুরাইরা রা.কে একটি হাদিস বলতে শুনলেন। আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

'যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে তার এক কিরাত সাওয়াব হবে। (আর এক কিরাত হল উহুদ পাহারের সামান সাওয়াব) আর যে, কবর দেওয়ার আগ পর্যন্ত মাইয়েতের সাথে থাকবে, তার দুই কিরাত সাওয়াব হবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এই হাদিস প্রথম শুনলেন, তাই তিনি আবু হুরাইরা রা.কে বললেন, ধিক তোমাকে! তুমি এটা কী বলছো? আবু হুরাইরা রা. বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমাদেরকে তাই বলছি যা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি। অর্থাৎ যারা যারা জানাযার সালাত আদায় করবে, তার জন্যে এক কিরাত সাওয়াব হবে। আর যারা তাকে অনুসরণ করে কবর পর্যন্ত যাবে, কবর খনন করবে, তাকে গোসল করাবে, তাকে কবরে নামাবে, জানাযার খাটিয়া বহন করবে, তাকে কবর দিবে, মাইয়েতের পরিবারকে শান্তনা দিবে, তাদের জন্যে দুই কিরাত সাওয়াব। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. যখন এই হাদিস প্রথমবার শুনলেন তখন তিনি এক লোককে এই হাদিস যাচাই করার জন্যে আয়েশা রা.-এর নিকট পাঠালেন। আয়েশা রা. আলেমা সাহাবি, তিনি ছিলেন হাফিযুল হাদিস এবং ফকিহ। তাই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এক লোককে আয়েশা রা.-এর নিকট পাঠালেন এবং তাকে বললেন, তুমি আয়েশা রা.-এর নিকট গিয়ে এই হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো।

লোকটি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর নিকট থেকে চলে গেল, তখন ইবনে ওমর রা. একটি পাথরের টুকরা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে লোকটির আসার অপেক্ষা করতে ছিলেন এবং ভাবতে লাগলেন, এটা কি হাদিস হিসেবে প্রমাণিত হবে না-কি হবে না। যদি এটা হাদিস হয়ে থাকে তাহলে এতগুলো বছর আমি এই সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়েছি!! আমি আখেরাতের ব্যাপারে সাওয়াব অর্জনের ব্যাপারে পরিপূর্ণ মনোযোগী নই। আমি যদি আখেরাতের ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগী হতাম! তাহলে আমি কেনো এই হাদিস জানি না? তিনি পেরেশানিতে একটি পাথর হাতে নিয়ে ঘুরাতে লাগলেন এবং লোকটি ফিরে আসা পর্যন্ত এঅবস্থায়ই ছিলেন। অতঃপর যখন লোকটি ফিরে এসে বলল, হ্যাঁ আয়েশা রা. বলেছেন, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই হাদিস শুনেছেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হাতে থাকা পাথরটি মাটিতে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, সুবহানাল্লাহ! কত সাওয়াব আমাদের থেকে ছুটে গেল!!

যেই মানুষ নেকির কাজ ছুটে গেলে আফসোস করে ও সামনে যেনো তা না ছুটে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকে সেই তো সফল মানুষ। সাইদ ইবনে আবদুল আজিজ বলতেন, আমি সর্বদাই জামাতে সালাত আদায় করার ব্যাপারে খুবই সর্তক থাকতাম। একদিন আমার জামাত ছুটেগেল, তখন আমার খুবই আফসোস হল, আমি পেরেশান হয়ে পড়লাম। অধিক আফসোস ও পেরেশানির কারণে আমি ভেঙ্গে পড়লাম। সেই মুহূর্তে আমার এক সাথী ইবনে মারওয়ান আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। সে আমাকে বলেছিলো,আল্লাহ তোমাকে জামাত ছুটে যাওয়ার শোক কাটিয়ে উঠার তাওফিক দান করুন। তিনি বলেন, আমার সন্তান যদি মারা যেতো তাহলেও তো আমাকে কতশত মানুষ শান্তনা দিতে আসতো।অথচ আজ আমার জামাত ছুটে গেল কিন্তু.....। অর্থাৎ তাঁদের কাছে জামাত ছুটে যাওয়াটা সন্তান মরে যাওয়ার চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক ছিল। তাঁরা এটাকে এর চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক ও কষ্টকর মনে করতেন। সালাফদের একজন বলেছেন,আমার একবার এশার জামাত ছুটে গেল, তখন আমি পার্শ্ববর্তী মসজিদে গেলাম, সেখানে গিয়ে দেখি সেখানেও জামাত শেষ হয়ে গেছে। অতঃপর আমি অন্য পার্শ্ববার্তী মসজিদে গিয়ে দেখি এখানেও জামাত চলছে। অতঃপর আমি বাড়ি ফিরে এলাম এবং আফসোস করতে লাগলাম যে, কীভাবে আমার সাতাশটি মর্যাদাছুটে গেল!! তিনি বলেন, অবশ্যই আমি সাতাশবার সালাত আদায় করবো।

কোনো নেকির কাজ ছুটে যাওয়া তাঁদের কাছে সাধারণ কোনো ব্যাপার ছিলো না। তাঁরা এটাকে কোনো সাধারণ ব্যাপার মনে করতেন না। তাঁদের কেউ এরকম বলতো না যে, একবার জামাত ছুটেছে, এটা তো সাধারণ ব্যাপার, আমি তো সবসময় জামাতেই সালাতআদায় করি। গতকাল জামাতের সাথে সালত পড়েছি, এর পূর্বে পড়েছি সামনেও পড়বো। এক ওয়াক্ত জামাত ছুটেছে তো এতে কী এমন বিশেষ ক্ষতি হয়ে গেছে? অথবা আমি এই মিসকিনকে কিছু সদকা করিনি তো কী হয়েছে? আমি তো ইতঃপূর্বে অনেক সদকা করেছি? না তাঁরা কখনো এমনটি বলেননি। বরং তাঁদের যখনই কোনো নেকির কাজ ছুটে যেতো তখনই তাঁরা এর জন্যে অনেক আফসোস করতেন। বরং এটা তাঁদের কাছে নিজ সন্তান হারানোর চেয়েও বেশি কষ্টকর ও বেদনাদায়ক ছিল।

উক্ত সালাফ বলেন, অতঃপর আমি সাতাশবার সালাত আদায় করলাম। সালাত আদায় করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে গেলাম। আমি যখন ঘুমিয়ে গেলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটা ঘোড়ায় আরোহণ করেছি। আর আমার ঐসকল সাথীরাও ঘোড়ায় আরোহণ করেছে যারা জামাতের সাথে ইশার সালাত আদায় করেছে, অতঃপর তাঁরা ঘোড়া ছুটাচ্ছে এবং দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আমিও তাঁদের পিছন পিছন ঘোড়া ছুটাচ্ছি, তাঁদের সমানে যাওয়ার জন্যে অনেক চেষ্টা করছি; কিন্তু আমি তাঁদের সামনে যাবো তো দূরের কথা তাঁদেরকে ধরতেই পারছি না। তখন তাঁদের থেকে একজন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি তো আমাদের কিছুতেই ধরতে পারবে না,কারণ আমরা তো ইশারের নামায জামাতের সাথে আদায় করেছি।

হয়তো অধিক পেরেশানির কারণে এই স্বপ্নটা দেখেছে, কারণ সে এই আফসোস করেকরে রাতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলো যে, কীভাবে আমার জামাত ছুটেগেল; কিন্তু তাঁর এই আফসোস ও পেরেশানি ছিলো বিশাল প্রতিদান পাওয়ার আশায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবয়ে কেরামকে উৎসাহ দিতেন তাঁরা যেনো বেশি বেশি সাওয়াবের আশা করে এবং নেক আমল করার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে। একারণেই সাহাবায়ে কেরাম রা. কোনো কল্যাণ ও নেক আমল ছুটে গেলে এর জন্যে অনেক আফসোস করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.কে বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর! (আবুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর বয়স তখন পনের বছরেরও কম ছিলো) তুমি অমুকের মতো হয়ো না, সে তো রাতে জাগ্রত হয়েও কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করেনা।
আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. সারা বছর রোযা রাখতেন। তিনি দুই ঈদের দিন ব্যতীত আর কোনো দিন রোযা ভাঙ্গতেন না। তিনি সারা রাত্র জাগ্রত থেকে সালাত আদায় করতেন এবং দৈনিক এক খতম করে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি মানুষকে কোনো সময়ই দিতেন না,এমনকি নিজ পরিবারকেও কোনো সময় দিতেন না। দিন-রাত শুধু ইবাদত-বন্দেগি করতেন। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডাকলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁকে এর উপর উৎসাহিত করেছেন? তিনি তাঁকে সাওয়াব অর্জনের প্রতি এই আগ্রহের প্রশংসা করেছেন না-কি তিনি তাঁর এই আগ্রহকে দমিয়ে দিয়েছেন?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! আমি কি তোমাকে বলবো যে, তুমি সারা রাত জেগে সালাত আদায় করো? তিনি বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসুলুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি রাতের তিন ভাগের এক ভাগ বা অর্ধেক রাত জেগে সালাত আদায় করবে। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁরথেকে কিছুটা ইবাদত কমাতে চাইলেন, যাতে করে অতিরিক্ত ইবাদতের কারণে লোকটি ক্লান্ত না হয়ে পড়ে। হ্যাঁ সাওয়াব ও নেকির কাজ ছুটে গেলে আমাদের ক্রন্দন ও আফসোস করা উচিত। যেমনটি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে ঘটেছিল। যখন হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহর মায়ের মৃত্যু হল, তখন তিনি অধিক ক্রন্দন করতে লাগলেন। লোকেরা তাঁকে বলল, শায়খ! আপনি কাঁদছেন অথচ আপনিই তো আমাদের ধৈর্য শিক্ষা দেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি এজন্যে কাঁদছি যে, আমার জান্নাতে যাওয়ার দুইটি পথ ছিল, আজ আমার থেকে একটি বন্ধ হয়ে গেল। আর এখন মাত্র একটি পথ বাকি আছে।

হে ভাই! সালাফগণ কোনো নেকি ছুটে গেলে এমনই আফসোস করতেন। বলছিলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. কে বললেন, আমার কাছে বলা হয়েছে তুমি না-কি দৈনিক কুরআন খতম কর? তিনি বললেন, জি। তিনি বললেন, তুমি এমনটি করো না বরং তুমি মাসে এক খতম তিলাওয়াত করবে। তিনি বললেন, আমি কি এর চেয়ে বেশি তেলাওয়াত করতে পারবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি প্রতি সপ্তাহে এক খতম তেলাওয়াত কর। তিনি বললেন, আমি কি এর চেয়ে বেশি তেলাওয়াত করতে পারবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

Contents

বললেন, তুমি প্রতি তিন দিনে এক খতম তেলাওয়াত করবে। তিনি বললেন, আমি কি এর চেয়ে বেশি তেলাওয়াত করতে পারবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না; এরচেয়ে বেশি তেলাওয়াত করতে পারবে না। যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে তেলাওয়াত করে সে কুরআন বুঝে পড়ে না। আর সিয়ামের ব্যাপারে তাঁকে বললেন, তুমি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করবে। তিনি বললেন, আমি কি এর চেয়ে বেশি সিয়াম পালন করতে পারবো? রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রতি সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে সিয়াম পালন করবে। তিনি বললেন, আমি কি এর চেয়ে বেশি সিয়াম পালন করতে পারবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি একদিন সিয়াম পালন করে ও একদিন ভঙ্গ করবে অর্থাৎ একদিন পর পর সিয়াম পালন করবে। তিনি বললেন আমি কি এর চেয়ে বেশি সিয়াম পালন করতে পারবো? তিনি বললেন, না; এর চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। এটা হচ্ছে দাউদ আ.-এর সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন এবং একদিন ভঙ্গ করতেন।

এরপর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. এভাবে আমল করতেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. সর্বদা নেক আমলের জন্যে আগ্রহী থাকতেন। তাঁদের একটা নেক আমল ছুটে গেলে এর জন্যে অনেক আফসোস করতেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. 'কিরাতে'র হাদিস দেরিতে শুনার পর আফসোস করেছেন। তিনি যখন জানতে পারলেন,জানাযার সালাত আদায় করলে এক কিরাত এবং তাকে সমাহিত করা পর্যন্ত তার সাথে থাকলে আরো এক কিরাত মোট দুই কিরাত সাওয়াব পাওয়া যায় তখন তিনি অধিক পেরেশান হয়ে পাথর হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। এভাবেই তাঁদের যখন কোনো নেকির কাজ ছুটে যেতো তখন তাঁরা এর জন্যে আফসোস করতেন ও কাঁদতেন।

হজ্জের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রা.-এর নিকট গিয়ে দেখেন আয়েশা রা. কাঁদছেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কাঁদছো কেনো? একথা শুনে তিনি আরো বেশি করে কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসুলুল্লাহ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি

এজন্যে কাঁদছো যে, তুমি হায়েযা হওয়ার কারণে তোমার উমরাহ ছুটে গেছে? তিনি বললেন হাঁ, আমার সাথীরা হজ্জ ও উমরাহ নিয়ে ফিরে যাবে আর আমি শুধু হজ্জ নিয়ে যাব। হে ভাই! তুমি কি একবার লক্ষ করেছো? নেকির কাজ ছুটে যাওয়ার কারণে তিনি কীভাবে কাঁদছেন যে, উম্মে সালাম রা. হজ্জ ও উমরাহ করে ফিরে যাচ্ছে, হাফসা রা. হজ্জ ও উমরাহ করে ফিরে যাচ্ছে, যায়নাব রা. হজ্জ ও উমরাহ করে ফিরে যাচ্ছে, তাহলে তিনি কীভাবে শুধু হজ্জ করে ফিরে যাবেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আয়েশা রা.-এর ক্রন্দন দেখলেন তখন তিনি তাঁর ভাই আবদুর রহমান রা. কে আদেশ দিলেন তিনি যেনো তাঁকে উমরাহ করিয়ে নিয়ে আসেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো মধ্যে ভালো কাজের আগ্রহ দেখতেন তখন তিনি খুশি হতেন। আবদুর রহমান রা. আয়েশা রা.কে নিয়ে তানইমে গেলেন, তানইম হল সবচেয়ে কাছের মিকাত। মক্কাবাসীদের মিকাত এবং যারা দূর থেকে হজ্জ করতে আসে তাঁরা উমরার জন্যে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধে। তানইমে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, যার নাম মসজিদে আয়েশা রা., কারণ আয়েশা রা. উমরার জন্যে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধেছেন এই কারণে এ মসজিদের নাম হয়েছে 'মসজিদে আয়েশা রা.'। অতঃপর আয়েশা রা. তাঁর ভাই আবদুর রহমান রা.-এর সাথে তানইমে গেলেন এবং ইহরাম বাঁধলেন, অতঃপর বাইতুল্লাহয় এসে তাওয়াফ করে তালবিয়া পড়ে উমরাহ আদায় করলেন। হাঁ সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহিন এভাবেই কোনো নেকির কাজ ছুটে গেলে আফসোস করতেন ও এর জন্যে ক্রন্দন করতেন।

হে ভাই! যারাই নেকির কাজ করার জন্যে দৃঢ় সংকল্প করবে এবং কোনো নেকির কাজ ছুটে গেলে এর জন্যে আফসোস করবে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে কল্যাণের কাজ করার তাওফিক দান করবেন। যে ব্যক্তি সালাতের আগের সুন্নত ছুটে গেলে আফসোস করে, অতঃপর ফরয সালাতের পর এর কাযা করে নেয়, সে অচিরেই জামাতের সাথে সালাত আদায় করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। উম্মে সালামা রা. বলেন, আমি একবার দেখলাম

Contents

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর সালাত আদায় করছেন। ফলে আমি আশ্চর্য হলাম,কারণ সেটা হল সালাতের জন্যে নিষিদ্ধ সময়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, তখন আমি আমার এক দাসীকে বললাম, তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে গিয়ে তাঁকে বলবে, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সালামা বলেছে, আমি আপনাকে বলতে শুনেছি আপনি এই সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করছেন। তাহলে আপনি কীভাবে সালাত আদায় করছেন? তিনি বলেন, তিনি যদি তোমাকে ইশারা করেন তাহলে তুমি সেখান থেকে চলে আসবে? তখন দাসীটি রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বলল, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! উম্মে সালাম বলেছে, আমি আপনাকে বলতে শুনেছি যে, আপনি এই সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করছেন। তাহলে আপনি কীভাবে সালাত আদায় করছেন? তখন রাসুলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইশারা করলেন এবং তিনি সালাত আদায় করতে থাকলেন। তখন সে চলে গেল। অতঃপর তিনি যখন সালাত শেষ করলেন তখন বললেন, হে উম্মে সালামা বনি কায়েসের প্রতিনিধি দল এসেছিলো, তাঁরা আমাকে যোহরের পরের দুই রাকাত সালাত পড়া থেকে ব্যস্ত রেখেছিলো, তাই আমি তা এখন আদায় করলাম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে এর উপর প্রশিক্ষণ দিতেন। একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন এক সাহাবি ফজরের পর নিষিদ্ধ সময়ে সালাত আদায় করছে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন,তুমি কী করছো? সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি ফজরের নফল (সুন্নত) আদায় করছি, আমি তা ফজরের পূর্বে আদায় করতে পারিনি। আমার থেকে তা ছুটে গেছে। সুতরাং আমি তা এখন আদায় করছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করলেন না বরং তাঁকে তা আদায়ের ব্যাপারে সমর্থন করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

Contents

'যে সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে যাবে অথবা সালাত আদায়ের কথা ভুলে যাবে, অতঃপর যখন স্মরণ হয় তখনই যেনো সে তা আদায় করে নেয়।,

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থতা বা অন্য কেনো কারণে কিয়ামুল লাইল না করে ঘুমিয়ে থাকতেন, তিনি তা সকালে সূর্য উঠার পর আদায় করে নিতেন। যাতে এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত না হন।

সুতরাং আমাদের অবস্থাও যেনো এমন হয় যে, আমাদের কোনো নেকের কাজ ছুটে গেলে এর জন্যে আফসোস করিযে, হায়! আমি উত্তম সময়ে সালাত আদায় করতে পারলাম না, মুস্তাহাব সময়ে উমরাহ করতে পারলাম না, দোয়া কবুলের উত্তম সময় দোয়া করতে পারলাম না এবং মসজিদ নির্মাণের সুযোগটি আমি গ্রহণ করতে পারলাম না। এমন বিভিন্ন আমল ও সাওয়াবের কাজ আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেলে আমাদের আফসোস করা উচিত এবং পরে এর অনুরূপ কাজ করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইমান ও হেদায়াত এবং প্রতিটি কল্যাণকর কাজ সময়মতো করার তাওফিক দান করেন। এবং আমরা যেখানেই থাকি, যে অবস্থাই থাকি তিনি আমাদেরকে তাঁর রহমত ও বরকতের মধ্যে রাখেন। আমিন।

উলামায়ে কেরামের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা উলামায়ে কেরামের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে রেখেছেন। তিনি বলেন :

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّه لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ؕ

'আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতাহগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি মহা প্ররাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'[১]

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে উলামায়ে কেরামের সাক্ষ্যকে ফেরেস্তাদের সাক্ষদানের সাথে একত্রে এনেছেন।

অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় পায়।'[২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উলামায়ে কেরামকে পছন্দ করেন এবং উলামায়ে কেরামকে নির্বাচন করে তাঁদের অন্তরে তাঁর ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ে উলামায়ে কেরামের যতটা প্রয়োজন এক্ষেত্রে অন্যকারোর প্রতি ততটা প্রয়োজন নেই। আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ তাঁর 'মিফতাহু দারি সাআদাত' নামক কিতাবে বলেন, মানুষ ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকৌশলীদের ব্যতীত চলতে পারবে,কারণ এই বিষয়টা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আয়ত্ত করা যায়। হাঁ একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বর্তমান সময়ে ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকৌশলীদের গুরুত্ব অনেক; কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকৌশলী না থাকলেও

১. সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮

২. সুরা ফাতির, আয়াত : ২৮

মানুষ চলতে পারবে, তারা তাদের কাজ নিজেরাই চালিয়ে নিতে পারবে, কারণ অনেকেই কোনো ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকৌশলীর সাহায্য ব্যতীত নিজেনিজে বাড়ি নির্মাণ করেছে এবং এখনও করছে, এর কোনো হিসেব নেই। মানুষ ডাক্তার ব্যতীত চলতে পারবে, কারণ মানুষ যদি বাধ্য হয় তাহলে তাদের ব্যতীতই সে এ কাজ চালিয়ে নিতে পারে। মানুষের প্রকৃতিটাই এমন যে, বাধ্য হলে সে যেকোনো কাজ করতে পারে। সে তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই বুঝতে পারে যে, কোন জিনিসটা তার জন্যে উপকার আর কোন জিনিস অপকার; কিন্তু মানুষ কখনই উলামায়ে কেরাম ব্যতীত চলতে পারবে না, কখনই তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না, কারণ শরীয়তের ইলম কোনো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন হয়নি এবং তা অর্জন হয়নি কোনো মানুষের সংস্রব দ্বারা; বরং তা নাযিল হয়েছে অহির মাধ্যমে এবং সে অহিবাহক হিসেবে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন নবি ও রাসুল আ.কে। অতঃপর নবি রাসুলগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আনিত অহি মানুষকে শিখিয়েছেন এবং তাদের নিকট পৌছে দিয়েছেন। একারণেই আল্লাহ তাআলা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টা উলামায়ে কেরামের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এমনকি কিয়ামতের দিনও আলেমদের সম্মান ও মর্যাদা থাকবেঅনেক এবং সবার থেকে আলাদা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

‘ইলমছাড়া আবেদের চেয়ে আলেমের মর্যাদা হল সকল তারকার উপর চাঁদের মর্যাদার মত।’

অন্য হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

‘ইলম ছাড়া আবেদের চেয়ে আলেমের মর্যাদা হল তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদার মত।’

হে ভাই! একবার লক্ষ করে দেখো আলেমদের মর্যাদা কত বড়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জ্ঞানহীন আবেদের চেয়ে আলেমের মর্যাদা হল তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদার মত। একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের মধ্য

থেকে একটি জামাতকে কোনো এক যুদ্ধে পাঠালেন। সেখান থেকে ফেরার সময় এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন এবং সেখানে রাত কাটালেন। রাতে এক আহত মুজাহিদের ইহতিলাম হল (স্বপ্নদোষ হল)। তাঁর মাথায় ছিলো ক্ষত। সে সকালে ঘুম থেকে উঠে সাথীদের বললো, হে কওম! আমার ইহতিলাম হয়েছে, আর আমার নিকট পর্যাপ্ত পানিও নেই। এখন তোমারা কি মনে করো যে, আমার গোসল না করে থাকার ব্যাপারে এবং সালাত আদায়ের ব্যাপারে কোনো সুযোগ আছে? লোকেরা বললো, না আমরা এব্যাপারে তোমার কোনো সুযোগ দেখছি না। লোকটি আবার বললো; কিন্তু আমার মাথায় তো আঘাতের ক্ষত রয়েছে, যদি সেখানে পানি লাগে তাহলে আমার ক্ষতি হবে। লোকেরা বললো, না আমরা এব্যাপারে তোমার কোনো সুযোগ দেখছি না। তোমাকে গোসল করেই সালাত আদায় করতে হবে। তখন অপারগ হয়ে লোকটি গোসল করল এবং তার ক্ষতের মধ্যে পানি লাগার কারণে সে মারা গেল। অতঃপর দীর্ঘ সফরের পর কাফেলা যখন মদিনায় পৌঁছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো এবং তাঁকে লোকটির ইহতিলাম হওয়া, গোসল করা ও মারা যাওয়ার ঘটনা বলা হল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, সে কি গোসল করার কারণে মারা গেছে? তাঁরা বললো, হাঁ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা তাঁকে হত্যা করেছে আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করবেন। যারা তাঁকে হত্যা করেছে আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করবেন। যারা তাঁকে হত্যা করেছে আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করবেন। তারা যখন অজ্ঞ তাহলে কেনো তারা জিজ্ঞেস করলো না। তারা যখন জানে না তাহলে কেনো তারা জিজ্ঞেস করলো না। অক্ষমের চিকিৎসাই তো অন্যকে জিজ্ঞেস করা। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'তার জন্যে তো এটাই যথেষ্ট ছিলো যে, সে তাঁর দুই হাত পবিত্র মাটিতে মারবে এবং তা দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কনুইসহ মাসেহ করবে। এবং তাঁর মাথার উপর ব্যান্ডিজ পেঁচিয়ে এর উপর মাসেহ করবে।'

ইবনে হুবাইর রহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন মহামান্য উজির,তিনি অনেক সম্পদের অধিকারী এবং সমাজের একজন সম্মানিত লোক ছিলেন। তিনি উলামায়ে কেরামকে অনেক সম্মান করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্যে তাঁদেরকে নিজ গৃহে দাওয়াত করে আনতেন। একদিন আসরের পর তিনি উলামায়ে কেরামের সাথে বসেছেন। সেখানে মালেকি মাযহাবের এক আলেমও উপস্থিত হলেন। তাঁরা একটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন মালেকি মাযহাবের ফকিহ মাসআলাটি নিয়ে তাঁদের সাথে মতানৈক্য শুরু করলেন। মাসআলাটির ক্ষেত্রে সেখানে থাকা সকল আলেম একমত; কিন্তু একমাত্র তিনিই তাতে ভিন্নমত পোষণ করছেন। অতঃপর তাঁরা বলল, হাঁ মাসআলাটি আপনি যেমন বলছেন তেমনও হবে, তবে আমরা যেটা বলছি সেটা উত্তম। মালেকি ফকিহ বললেন না বরং উত্তম এটা। ইবনে হুবাইর রহিমাহুল্লাহ তখন আশ্চর্য হয়ে তাঁকে বললো, সকল আলেম একদিকে আর তুমি একদিকে? তখন সে ইবনে হুবাইরের সাথেও মতানৈক্য শুরু করলো এবং নিজের মতের উপরই অটল রইলো এবং বললো, আমি যেটা বলেছি সেটাই সঠিক। ইবনে হুবাইর তখন বললো, তুমি কি একটা গাধা? তখন শায়খ চুপ হয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পর মজলিস শেষ করে সকলে চলে গেল। একজ বড় মহান আলেম ও শায়খকে এধরনের কথা বলার কারণে ইবে হুবাইর খুবই লজ্জিত হলেন এবং বললেন, একজন শায়েখের ব্যাপারে, একজন আলেমের ব্যাপারে আমি এধরনের বাক্য কীভাবে বললাম? অথচ তিনি একজন আলেম!! এভাবে আফসোস আর পেরেশানির কারণে ওই রাতে তিনি আর ঘুমাতে পারলেন না।

হে ভাই! একবার লক্ষ করে দেখো, তাঁরা উলামায়ে কেরামের কতটা সম্মান করতো। ঐসকল লোকদের কতটা সম্মান করতো, যারা ইলম অর্জনের জন্যে হাঁটু গেড়ে বসেছে, দীর্ঘ সময় ব্যয় করে কুরআন হিফয করেছে? কুরআন-হাদিস বুঝার জন্যে জীবনের বড় একটি অংশ ব্যয় করেছে এবং কুরআন-সুন্নাহর খেদমতের জন্যে নিজের জীবন ওয়াকফ করেছে? আল্লাহ তাআলা এই লোকদের মাধ্যমেই তো তাঁর দীনের হেফাযত করেন, সুতরাং এই আলেমের সম্মান করতে হবে। ইজ্জত ও সম্মানই তাঁর প্রাপ্য। পত্র-পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা বৈধ

নয়,ইন্টারনেটের ব্লগে,. টেলিভিসনের টকশোতে তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা বৈধ নয়। অবশ্যই এগুলো বন্ধ করতে হবে এবং তাঁদের সম্মান করতে হবে, তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে।

যে জাতি আলেম-উলামাদের দুর্বল করে রাখল, তাঁদের অসম্মান করলো, তারা তো নিজেরাইনিজেদের অসম্মান করলো, তাদের দীনকে দূবর্ল করে ফেললো এবং নিজেদের সম্মান নিজেরাই ধ্বংস করলো।

ইবনে হুবাইর রহিমাহুল্লাহ অস্থির ও পেরেশানির মধ্যে রাত কাটালেন। পরদিন সকালে আবার যখন উলামায়ে কেরাম আসলেন, গতকাল 'গাধা' বলে যে আলেমকে গালি দিয়েছিলো তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্মান করলেন এবং তাঁর হাতে চুমু খেলেন, অতঃপর বললেন, হে মানুষ! গতকাল অসর্তকতাবশত ভুলে আমার থেকে এই আলেমের প্রতি অসম্মানমূলক কথা বের হয়েছিল। আল্লাহর শপথ করে বলছি, একারণে গতকাল সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। সুতরাং আপনি আমার প্রতি সদয় হোন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমাকে ক্ষমা করে দিন। তখন আলেম বললেন, ঠিক আছে আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম; কিন্তু আলেম বললেন না, আপনি আমার প্রতি সদয় হোন, আমাকে অনুগ্রহ করুন। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি আপনার প্রতি সদয় হলাম। ইবনে হুবাইর দাঁড়িয়ে বললেন, আমার কাছে আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন। না আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে আল্লাহর দোহায় দিয়ে বলছি আপনি বলুন আপনার কোনো ঋণ আছে কি-না? আপনি যেহেতু আমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছেন তাই বলছি আমার উপর ঋণ আছে। কত? আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আপনাকে আল্লাহর দোহায় দিয়ে বলছি যে, আপনি আপনার ঋণ সম্পর্কে আমাকে জানাবেন। আমার উপর একশত দিনার ঋণ আছে। এই নিন আমি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে আপনার ঋণ পরিশোধের জন্যে একশত দিনার দিচ্ছি এবং আমি আপনাকে গতকাল যে কথা বলেছি তার জন্যে আমার পক্ষ থেকে এই নিন আরো একশত দিনার।

ইবনে হুবাইর ছিলেন একজন প্রভাবশালী উজির, তিনি চাইলেই এই মুফতিকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারতেন; কিন্তু তা না করে তিনি তাঁর

সম্মান করলেন, তাঁর ঋণ পরিশোধ করে দিলেন, কারণ ওলামায়ে কেরাম সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য, তাঁদের সম্মানই করতে হয়।

শায়খ সাইদ আল-হালাবি রহিমাহুল্লাহ, তিনি হাত প্রসারিত করেননি, তাই তাঁকে পা গুটিয়ে নিতে হয়নি।শায়খ সাইদ আল হালাবি রহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন বড় আলেম ও আল্লাহর ওলি। মানুষ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো। তিনি সর্বদা শাসকদের থেকে অমুখাপেক্ষী থেকেছেন, তাদের কাছ থেকে তিনি কিছুই গ্রহণ করতেন না, কারণ আলেম যখন শাসকদের মুখাপেক্ষী হয়, তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করে এবং তাদের মজলিসে বেশি বেশি যাওয়া আসা করে ও সেখানে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকে– বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারপর থেকে শাসকদের ব্যাপারে ফাতওয়ায় পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি করতে শুরু করে; কিন্তু আলেম যখন শাসকদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকে তখন তাঁর ফাতওয়া হয় একমাত্র আল্লাহর জন্যে। এর মধ্যে কারো কোনো পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতিরদুর্গন্ধ থাকে না। সুতরাং সাইদ আল-হালাবি রহিমাহুল্লাহও ছিলেন শাসকদের থেকে অমুখাপেক্ষী, তিনি তাদের থেকে কোনো হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। আর একারণেই খলিফা তাঁকে কাযি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর তাঁর নিকট কিছু সম্পদ হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করেন; কিন্তুতিনি তা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, আমি আমার জন্যে বাইতুল মাল থেকে নির্ধারিত বেতনের বাইরে কিছুই গ্রহণ করবো না। খলিফা তাঁকে বলেন, এটা আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্যে হাদিয়া। তিনি বলেন, আপনি যদি আমাকে হাদিয়া দিতে চান তাহলে আমাকে কাযির দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিন। তখন খলিফা বলেন, ঠিক আছে আপনি কাযিই থেকে যান। এরপর খলিফা বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি যত দিন সে আমার হাদিয়া গ্রহণ না করবে ততদিন সে বিচারের ক্ষেত্রে আমার পক্ষপাতিত্ব ও আমার প্রতি স্বজনপ্রীতি করবে না।

সাইদ আল-হালাবি রহিমাহুল্লাহ নিজ সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি শাসকদের থেকে কখনো কোনো কিছু গ্রহণ করতেন না বরং কষ্ট হলেও নিজ সম্পদ দিয়ে নিজের ও পরিবারের

জন্যে ব্যয় করতেন। একদিন তিনি মসজিদে দরস দিচ্ছিলেন, বয়সের কারণে তাঁর পায়ে ব্যথা ছিলো, তাই তিনি তাঁর পা ছড়িয়ে দিয়ে রাখতেন। তিনি যখন মসজিদে দরস দিচ্ছেন তখন ইবরাহিম পাশা মসজিদ-প্রদর্শনে আসলেন। ইবরাহিম পাশা ছিলো অত্যন্ত রাগী ও কঠোর মেজাযের মানুষ। সে যখন মসজিদে প্রবেশ করল, তাকে দেখে সকলে দরস ও কাথাবার্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল এবং সালাম করতে লাগল; কিন্তুসাইদ আল-হালাবি রহিমাহুল্লাহ দরস বন্ধ করলেন না বরং তিনি দরস চালিয়ে গেলেন। অতঃপর ইবরাহিম পাশা যখন অন্যদের থেকে ফারেগ হয়ে সাইদ আল-হালাবির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন দরসের কিছু কিছু ছাত্র দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানাল; কিন্তুসাইদ আল-হালাবি রহিমাহুল্লাহ দরস বন্ধ করে দাঁড়ানো তো দূরের কথা তিনি তাঁর পা-টা পর্যন্ত ভাঁজ করলেন না বরং তাঁর পা আগে যেমন ছাড়ানো ছিলো তেমনই প্রসারিত অবস্থায়ই দরস চালিয়ে গেলেন। ইবরাহিম পাশা যখন মসজিদ-প্রদর্শন শেষে বাইরে গেল তখন বললো, এই শায়খ কে যিনি পা প্রসারিত করে বসে আছেন? তাকে বলা হল ইনি হলেন প্রসিদ্ধ আলেম শায়খসাইদ আল-হালাবি।

অতঃপর সে বললো, সকলে যখন আমাকে সম্মান জানানোর জন্যে কাথা-বার্তা ও পড়া-লেখা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল, সে কেনো দাঁড়াল না? লোকেরা বললো, আমরা জানি না। অতঃপর তিনি এক হাজার দিনার বের করে একজনকে দিয়ে বললো, এটা নিয়ে শায়খের কাছে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে এটা তাঁকে দাও। অতঃপর সে মসজিদের অপরপ্রান্তে চলে গেল।শায়খহালাবি রহিমাহুল্লাহ দরস চালিয়ে যাচ্ছেন। লোকটি তাঁর কাছে আসলো এবং বললো, শায়খ এই নিন এক হাজার দিনার। তৎকালীন সময়ের এক হাজার দিনার অনেক সম্পদ, তা দিয়ে অনায়াসেই কয়েক বছর বসেবসে কাটিয়ে দেওয়া যেতো। শায়খ বললেন, এটা কোথা থেকে এসেছে? লোকটি বললো, এটা ইবরাহিম পাশা পাঠিয়েছেন। শায়খ তখন বললেন,ইবরাহিম পাশা কি এটা আমার নিকট পাঠিয়েছে? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি এটা তার কাছে ফেরত নিয়ে যাও এবং গিয়ে বলবে,শায়খ আপনাকে বলেছেন–'*যে পা*

প্রসারিত করে রাখে সে হাত প্রসারিত করে না'। প্রকৃতপক্ষে শায়খহালাবি রহিমাহুল্লাহ যখন শাসকদের থেকে অমুখাপেক্ষী থেকেছেন তখনই তিনি পা প্রসারিত করতে পেরেছেন। আর তিনি যখন পা প্রসারিত করে রাখেছেন তখন শাসকদের দেওয়া সম্পদ গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন।তিনি যদি তার কাছে থেকে সম্পদ গ্রহণ করতেন তাহলে অবশ্যই তার প্রতি একটা দুর্বলতা তৈরী হয়ে যেতো এবং তার সাথে ভালব্যবহার করতে চাইতো। তার এই কথা *'যে পা প্রসারিত করে রাখে সে হাত প্রসারিত করে না'* এই কথার অর্থ হল, আমি একজন আলেম, তোমাদের সম্পদের প্রতি আমার কোনো লোভ নেই। আমার যা কিছু আছে তা দিয়েই আমার চলবে। আমি ফাতওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব করতে পারবো না, ফাতওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের সাথে স্বজনপ্রীতিও করতে পারবো না।

ইলমের মর্যাদা-মিনার অনেক উঁচু, যার উচ্চতা পরিমাপ করা যায় না। একবার হজ্জের সময় খলিফা হারুনুর রশিদের একটি মাসআলা নিয়ে সমস্যা হল। তিনি আশপাশে থাকা আলেমদের মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলেন, তখন তাঁরা বললেন, এটা একেবারে নতুন একটা মাসআলা, এই মাসআলা সম্পর্কে আমরা ফাতওয়া দিতে পারবো না। তবে এবিষয়ে আতা ইবনে আবি রাবাহ ফাতওয়া দিতে পারবেন। আতা ইবনে আবি রাবাহ রহিমাহুল্লাহ ছিলেন যুগের হজ্জ ও হজ্জের আহকাম সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আলেম ও ইমাম। আতা রহিমাহুল্লাহ ছিলেন হাবশি গোলাম, তিনি ছিলেন কালো, তাঁর নাক ছিলো চেপ্টা এবং তিনি খোঁড়াও ছিলেন। হারুনুর রশিদ বললেন, তোমরা আতা ইবনে আবি রাবাহকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। অতঃপর তাঁরা আতা রহিমাহুল্লাহর নিকট গেল এবং তাঁকে বললো, খলিফা আপনাকে তার সাথে দেখা করতে বলেছেন। আতা রহিমাহুল্লাহ তখন দরসে ছিলেন, তাঁর আশেপাশে দূর-দূরান্ত থেকে আসা অনেক ছাত্রের ভীড় ছিল। তাঁদের কেউ খুরাসান থেকে এসেছে, কেউ ইরাক থেকে, কেউ শাম থেকে, কেউ ইয়ামান থেকে ইলম শিখার জন্যে এসেছে। তিনি বললেন, আমি এসকল গরিব ছাত্রদের দরস বন্ধ করে খলিফার নিকট যাব? বরং তোমরা

খলিফাকে গিয়ে বল যে, আমি ব্যস্ত আছি; আসতে পারবো না। এবং তোমরা তাকে একথাও বলবে যে, ইলম কারো কাছে যায় না বরং ইলমের নিকট যেতে হয়। অর্থাৎ তালেবে ইলমকে ইলমের নিকট আসতে হয় ইলম কখনো তালেবে ইলমের নিকট আসে না।

একথা যখন হারুনুর রশিদের নিকট পৌছল তখন তিনি তাঁর দুই ছেলে মামুন আর আমিনকে নিয়ে শায়খ আতা রহিমাহুল্লাহর নিকট গেলেন। খলিফাকে দেখে পাশে থাকা দূরদূরান্ত থেকে আগত গরিব ছাত্ররা সরে গেল এবং খলিফাকে সামনে যাওয়ার জায়গা করে দিল। তারা যখন আতা রহিমাহুল্লাহর নিকট পৌছালেন এবং মানুষ খলিফাকে দেখল, তখন তারা সরে গিয়ে তার জন্যে জায়গা করে দিল।তারা দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে আতা রহিমাহুল্লাহর সাথে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এভাবে লাইন ভঙ্গে খলিফাকে সামনে আসতে দেখে আতা রহিমাহুল্লাহ অনেক রাগান্বিত হলেন। আমরা তো সকলেই আল্লাহর বান্দা, তাঁর কাছে আমরা সকলেই সমান, আমাদের সকলেই সমানভাবে হজ্জের মাসআলার প্রতি মুখাপেক্ষী, তাহলে তিনি আগেআসবেন কেনো? খলিফা যখন লাইন ভঙ্গ করে আতা রহিমাহুল্লাহর নিকট আসলেন এবং তাঁকে সালাম দিয়ে বললেন,শায়খ আমার একটি মাসআলা জানার আছে। আতা রহিমাহুল্লাহ বললেন, আপনি পিছনে গিয়ে লাইনে দাঁড়ান, আমরা সকলেই আল্লাহ তাআলার নিকট সমান। খলিফা হারুনুর রশিদ কাতারের পিছনে চলে গেলেন, তার সাথে তার দুই ছেলে মামুন আর আমিন। এরপর একেএকে যখন খলিফার পালা এলো তিনি আতা রহিমাহুল্লাহর সামনে গিয়ে সালাম দিলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁকে মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।আতা রহিমাহুল্লাহ তখন তার সালামের জাওয়াব দিলেন, প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং তার সাথে ভাল ব্যবহার করলেন ও সুন্দরভাবে কথা বললেন। অতঃপর খলিফা তাঁর শুকরিয়া আদায় করে চলে গেল। সেখান থেকে বের হয়ে তিনি তার দুই ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে ছেলে! তোমরা ইলম শিখো। আমি এই লোকের সামনে নিজেকে একেবারে ছোট ও নগন্য মনে করি, কারণ তাঁর

Contents

কাছে যা আছে আমি এর বড় মুখাপেক্ষী। এই সম্পদ তিনি ব্যতীত অন্য আর কারো কাছে পাবো না। আর আমার কাছে তো এই পদ আর সম্পদ ব্যতীত কিছুই নেই। সুতরাং আমার কাছে যা আছে সে তা অন্যের কাছেও পাবে। যে কোনো ব্যবসায়ীই তাঁর প্রয়োজন পূরণ করে দিতে পারবে, তাঁর ঋণ আদায় করে দিতে পারবে, তাঁকে বাড়ি গাড়ি সব করে দিতে পারবে; কিন্তু তার কাছে যা আছে আমি তা অন্য কার কাছে পাব বলো?

আর এ কারণেই তাঁরা উলামায়ে কেরামের সম্মান করতো; কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে অনেকেই উলামায়ে কেরামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোপ করে, তাঁদেরকে গালিগালাজ করে। অনেক সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উলামায়ে কেরাম ও দীনদার লোকদের নিয়ে উপহাসমূলক প্রতিবেদন ছাপানো হয়, তাঁদেরকে হেয়-প্রতিপন্ন করে; তাঁদের প্রতি ছোড়া হয় সম্মানহানিকর বহু শব্দ ও বাক্য। এবং কখনো কখনো তো তারা দীনের বিভিন্ন আহকাম নিয়ে, শরয়ি কোনো কোনো বিধান নিয়ে কটূক্তিমূলক প্রতিবেদন ছাপানোর মত দুঃসাহস দেখায়। ইন্টারনেটে, বিভিন্ন ব্লগে উলামায়ে কেরামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়, শরয়ি হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধান নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা হয়। টেলিভিসনের বিভিন্ন চ্যানেলে নাটক-সিনেমার মাধ্যমে উলামায়ে কেরাম ও দীনের বিধিবিধান নিয়ে ঠাট্টা ও উপহাস করা হয়। এমনকি কোনো কোনো চ্যানেলে তো সরাসরি টক-শোর মাধ্যমে উলামায়ে কেরাম ও দীনের বিধিবিধান নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা হয়। এমনটি করা নিতান্তই না-জায়েয ও হারাম কাজ। উলামায়ে কেরাম হলেন নবি-রাসুলদের ওয়ারিস, সুতরাং তাঁদের কাউকে নিয়েই ঠাট্টা-উপহাস করা কোনো ভাবেই জায়েয নেই। তোমার যদি তাঁর সাথে কোনো মতানৈক্য থাকে তাহলে তুমি সরাসরি তাঁর সাথে কথা বল বা তাঁর কাছে চিঠির মাধ্যমে তোমার মতামত প্রকাশ করো। তাঁর সাথে সম্মান ও আদবের সাথে কথা বল। তুমি যদি কোনো আলেমকে নিয়ে কিছু লিখতে চাও তাহলে যথাযথ সম্মান বজায় রেখে শালীনভাষায় তাঁকে নিয়ে লিখ। কোনো আলেমের সম্মানহানি করা কিংবা তাঁর ব্যাপারে অশালীন শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা জঘণ্যতম অন্যায়। এটা নাজায়েয; এটা সুস্পষ্ট হারাম কাজ।

আল্লাহ তাআলার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাদেরকে উলামায়ে কেরামের যথাযথ সম্মান করার তাওফিক দান করুন এবং আমাদেরকে হক্কানি আলেমে দীন হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. যোগ্য উত্তরসূরি রেখে গেছেন

কখনো কখনো মানুষ নিজ প্রতিনিধি ও উত্তরসূরির সন্ধান করে আর এজন্যে সে মেধাবী, চরিত্রবান, দীনদার ও উত্তম আমল-আখলাক বিশিষ্ট একজনকে খোঁজ করে উত্তরসূরি বানিয়ে নিজের অবর্তমানে তাঁকে স্থলাভিষক্ত করে। মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজ উত্তরসূরি রেখে যেতে চায়, যেমন ইলমের ক্ষেত্রে একজন আলেম চায় যে, তার স্থলাভিষিক্ত অন্য একজন আলেম রেখে যেতে। একজন ভাল ডাক্তার চায় যে, তার স্থানে অন্য একজন ডাক্তার তৈরি করে যেতে, অনুরূপভাবে একজন ব্যবসায়ীও চায় তারপর এ ব্যবসা অন্য একজন ধরে রাখুক। এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ একজন প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত রেখে যেতে চায়।

এখন আমরা ইমাম আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবেত রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর এক ছাত্রের ঘটনা বর্ণনা করবো। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন কিখ্যাত ইমাম ও ফকিহ। ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ তাঁর ব্যাপারে বলেন 'মানুষ ফিকহের ক্ষেত্রে আবু হানিফার রহিমাহুল্লাহ মুখাপেক্ষী'। তার জন্ম ৮০ হিজরিতে এবং মৃত্যু ১৫০ হিজরিতে।

আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ মসজিদে দরস দিতেন। তাঁর দরসে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে কত কত ছাত্র উপস্থিত হত! তুমি কল্পনায় সেই মজলিসে উপস্থিত হলে দেখতে পাবে, মসজিদ ভর্তি ছাত্র আর একজন উস্তাদ দরস দিচ্ছেন। ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গা থেকে কিতাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে; কেউ কিতাব পড়ছে, কেউ ইলমি আলোচনা করছে, কেউ ফাতওয়া জিজ্ঞেস করছে, সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। এসকল ছাত্রদের মধ্যে বার বছরের ছোট এক বালকও ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর

দরসে উপস্থিত হতো। বালকটি ইমাম সাহেবকে মাঝে মাঝে প্রশ্নও করতো। প্রশ্ন থেকেই ছেলেটির মেধার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রশ্ন দুইধরনের হয়ে থাকে, বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন, নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ প্রশ্ন। অর্থাৎ কিছু প্রশ্ন আছে যা থেকে বুঝা যায় প্রশ্নকারী মেধাবী ও বুদ্ধিমান। আর কিছু প্রশ্ন থেকেই প্রশ্নকারীর নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ একবার দরস দিচ্ছিলেন, তাঁর চারপাশে অনেক ছাত্র। তাঁর পায়ে ব্যাথা ছিলো, যার কারণে তিনি পা ছড়িয়ে রেখেছেন। এমন সময় সুন্দর পাগড়ি, উন্নতমানের জুব্বা ও দামি চাদর পড়া অপরিচিত এক লোক উপস্থিত হল। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তাঁকে দেখে কোনো দূর দেশের বড় আলেম ও শায়খ মনে করলেন। তাই তিনি তাঁর সম্মানে কষ্ট করে নিজের পা ভাঁজ করলেন। দরস শেষ করে ইমাম ছাত্রদের বললেন, তোমাদের কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? তখন সেই আগন্তুক বললো, আমার একটা প্রশ্ন আছে। ইমাম সাহেব শ্রদ্ধার সাথে বললেন, আপনার প্রশ্ন কী বলেন? লোকটি বলল, শায়খ! রমযান এলে আমরাকী করবো? তিনি বললেন, রোযা রাখবে। হজ্জের সময় হলে আমরা কী করবো? হজ্জ করবে। যখন হজ্জ ও রোযা একসাথে হবে তখন আমরা কী করবো? রোযা রাখবো না-কি হজ্জ করবো? আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এই প্রশ্ন শুনে বললেন, আবু হানিফার জন্যে এখন পা প্রসারিত করার সময় হয়েছে। আরে রমযান ও হজ্জ কীভাবে একত্র হবে। এটা একটা মাস আর সেটা ভিন্ন আরেকটা মাস। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বুঝতে পারলেন যে, তিনি লোকটিকে প্রাপ্য সাম্মানের চেয়ে বেশি দিয়ে ফেলেছেন।

যাই হোক আমরা যে ছেলেটির কথা বলছিলাম সে হল আবু ইউসুফ; বার বছরের ছোট্টএক বালক। পরবর্তীর হানাফি মাযাহাবের বড় ইমাম; ইমাম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ। এই বালকটির মেধা ও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন দেখে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ মুগ্ধ হতেন ও আশ্চর্য হতেন; কিন্তু আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ লক্ষ করলেন, ছেলেটি দরসে অনিয়মিত, প্রতিদিন দরসে উপস্থিত হয় না। তাই একদিন ছেলেটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ছেলে! তুমি কেনো অনুপস্থিত থাকো? নিয়মিত দরসে আসো না কেনো? আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বললেন, আমরা গরিব, তাই আমার

বাবা আমাকে বাজারে পাঠান কুলির কাজ করে বাবা-মাকে কিছু দেয়ার জন্যে। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তখন তাঁকে বললেন, হে ছেলে! তুমি ইলম অর্জন করো, ইলম অর্জন করা ফরয; সাথে সাথে তা অনেক বড় ফযিলতপূর্ণ কাজ। ইলম অর্জন করলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে অনেক উঁচু মর্যাদা দিবেন। সে বললো, ঠিক আছে আমি তাই করবো। অতঃপর সে দরসে বসে গেল। কিছুক্ষণ পর তাঁর বাবা এসে পিটেয়ে তাঁকে মসজিদ থেকে বের করতে লাগল, আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তখন তার কাছে গিয়ে বললেন, আপনি আপনার ছেলেকে ইলম অর্জন করার সুযোগ দেন না কেনো? সে বলল, আবু হানিফা! তোমার রুটি তো তোমার জন্যে ভাজা অবস্থায় প্রস্তুত থাকে; কিন্তু আমরা গরিব মানুষ। আমাদের কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করতে হয়। সুতরাং সে কাজ করে আমাকে সাহায্য করে ও তার ছোট ভাই বোনদের জন্যে খরচ করে। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, আপনার ছেলে দৈনিক কত টাকা উপার্জন করে? সে বলল, দৈনিক দুই দিরহাম উপার্জন করে। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বললেন, ঠিক আছে আপনি ছেলেকে আমার কাছে রেখে যান; সে আমার কাছে ইলম শিখবে আর আমি তাকে প্রতিদিন দুই দিরহাম করে দিব। আপনি তো আপনার ছেলেকে প্রতিদিন দুই দিরহাম উপার্জনের জন্যেই কুলির কাজ করান। সুতরাং আমিও তাকে প্রতিদিন দুই দিরহাম করেই দিব, আপনি তাকে আমার কাছে রেখে যান। তাঁর বাবা এতে রাজি হল। অতঃপর আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, শুনুন! আমি আপনার ছেলেকে এমন ইলম শিক্ষা দিব যে, সে যদি ভালভাবে তা আয়ত্ত করতে পারে তাহলে সে খলিফাদের মজলিসে গালিচার উপর বসে বাদামের ফালুদা খাবে। (বাদামের ফালুদা একধরনের হালুয়া যা খলিফা, আমির-উমারা ও বড় বড় ব্যবসায়ীরা ছাড়া অন্যরা খেতে পারতো না,কারণ তাছিলো অনেক দামি।) তখন লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল, সে বাদামের ফালুদা খাবে!? সে খলিফাদের সাথে বসবে!?

এরপর থেকে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহকে প্রতিদিন দুই দেরহাম করে দেন। আর আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহতা পিতাকে নিয়ে দেন।এভাবে আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বড় হলেন, তাঁর

বুঝ-বুদ্ধিবৃদ্ধি পেল এবং অনেক জ্ঞানসম্ভার জমা হল। এখন সে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর সাথে ইলমি আলোচনা করেন; কিন্তু একদিন হঠাৎ করে আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ আসুস্থ হয়ে গেলেন এবং তাঁর অসুস্থতা অনেক কঠিন আকার ধারণ করেলো। তাই দিনি দরসে উপস্থিত হতে পরছেন না। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তাঁকে দরসে না দেখে অন্যদের জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, সে অসুস্থ। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তাঁকে দেখতে তাঁর বাড়িতে গেলেন এবং তাঁর কামরায় প্রবেশ করলেন। আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহর রোগ তখন কঠিন আকার ধারণ করেছিল, তিনি তখন প্রায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ প্রিয় ছাত্রের এই অবস্থা দেখে অনেক ব্যথিত হলেন। মা স্নেহের হাত রেখে অনেক্ষণ বসে রইলেন। তিনি বলছিলেন, এত বছর কষ্ট করে তাকে বড় করেছি, এখন তাকে যখন গঠন করার সময় হয়েছে তখনই তার এ অবস্থা হল। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তাঁকে কাছ থেকে বললেন, হায় আবু ইউসুফ! আশাছিলো আমার পর তুমি মানুষকে দরস দিবে, আমার আসনে বসবে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে; কিন্তু মৃত্যু এখন তোমাকে নিয়ে খেলা করছে।

আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ প্রিয় ছাত্র আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহর জন্যে দোয়া করতে লাগলেন এবং মসজিদে অন্যান্য ছাত্রদেরকে দরস দিতে থাকলেন। কয়েকদিন পর আবু ইউসুফ রা.-এর অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল, তিনি দিনদিন সুস্থ হতে লাগলেন, এভাবে একদিন পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। কয়েকদিন পর গোসল করে সুন্দর পোশাক পরিধান করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরুলেন। তখন পরিবারের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছো? আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বললেন, আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর দরসে। তারা বললো, তোমার আর তাঁর দরসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং তুমি নিজেই এখন শায়খ হয়ে গেছো। তিনি বললেন, আমি কীভাবে শায়খহলাম? তারা বলল, তোমার অসুস্থতার সময় আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ যখন তোমাকে দেখতে এসেছিল, তখন তোমাকে দেখে যাওয়ার সময় তিনি বলেছেন, "*হায় আবু ইউসুফ! আশাছিলো আমার পর তুমি মানুষকে দরস দিবে, আমার আসনে বসবে, আমার স্থলাভিষিক্ত হবে; কিন্তু মৃত্যু এখন তোমাকে নিয়ে*

খেলা করছে" একথার অর্থ হল আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তুমি তাঁর আসনে বসে মানুষকে দরস দিবে, তাদের ইলম শিখাবে, কিতাবের ব্যাখ্যা করবে যেমন আবু হানিফা এখন করছেন। সুতরাং আবু হানিফা শায়খ আর তুমিও শায়খ। আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, আহ! আমি শায়খ হয়ে গেছি!! অতঃপর আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর দরসে না গিয়ে অন্য আর একটি মজলিসে গিয়ে পড়ানো শুরু করলেন এবং তাঁর সামনেও ছাত্ররা জমা হল। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ দেখলেন এখানে নতুন একটি মজলিস বসেছে এবং নতুন এক শায়খ দরস দিচ্ছেন। তাই তিনি বললেন, শহরে কি নতুন কোনো শায়খ আগমন করেছেন? তারা বললো, না। তিনি বললেন, আশ্চর্য! তাহলে ইনি কে? তারা বলল, সে আবু ইউসুফ। তিনি বললেন, আবু ইউসুফ সুস্থ হয়েছে? তারা বলল, হাঁ সে সুস্থ হয়েছে। তিনি বললেন, তাহলে সে আমার দরসে আসে না কেনো? তারা বললো, আপনি তাঁকে দেখতে গিয়ে যে কথা বলেছেন তাঁকে তা শুনানো হয়েছে। তখন আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বললেন, চামড়া খুলে না দেখালে সে শিক্ষা গ্রহণ করবে না।

অতঃপর আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ এক ছাত্রকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, সেখানে যেশায়খ বসা আছেন তাঁর কাছে যাও এবং বল,শায়খ আমার একটা প্রশ্ন আছে, তখন সে এই ভেবে খুশি হয়ে যাবে যে, আমার কাছেও মানুষ প্রশ্ন করতে আসছে!! এবং বলবে তোমার কী প্রশ্ন? করতে পার। তখন তাকে তুমি বলবে,শায়খ এক লোকের একটা লম্বা জামা আছে, অতঃপর সে দরজির কাছে তা ছোট করার জন্যে দিয়েছে। দরজি কাপড় রেখে দিয়ে কয়েকদিন পরে আসতে বলেছে। অতঃপর নির্ধারিত দিনে লোকটি দরজির কাছে গেলে দরজি অস্বীকার করে বলে, তুমি আমাকে কোনো কাপড় দাওনি। লোকটি তখন পুলিশের নিকট গিয়ে অভিযোগ করল। পুলিশ এসে দরজির দোকান ও তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কাপড়টি খুঁজে বের করল এবং মালিককে তা দিয়ে দিল। এখন আমার প্রশ্ন হল দরজি এর মজুরি পাবে না-কি পাবে না? এখন সে যদি বলে যে, দরজি এর মজুরি পাবে তাহলে তাকে

বলবে, আপনি ভুল উত্তর দিয়েছেন। আর যদি সে বলে মজুরি পাবে না তাহলেও বলবে, আপনি ভুল উত্তর দিয়েছেন।

ছাত্রটি আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহর নিকট গেল এবং তাঁকে সালাম করে বললো, শায়খ আমার একটি প্রশ্ন আছে। আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ খুশি হয়ে তাকে বললেন, তোমার প্রশ্ন কী? লোকটি বলল, শায়খ এক লোকের একটা লম্বা জামা আছে, অতঃপর সে দরজির কাছে তা ছোট করার জন্যে দিয়েছে। দরজি তার কাপড় রেখে দিয়ে কয়েকদিন পরে আসতে বলেছে। অতঃপর নির্ধারিত দিনে লোকটি দরজির কাছে গেলে দরজি অস্বীকার করে বলে, তুমি আমাকে কোনো কাপড় দাওনি। লোকটি তখন পুলিশের নিকট গিয়ে অভিযোগ করল। পুলিশ এসে দরজির দোকান ও তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কাপড়টি খুঁজে বের করল এবং তার মালিককে তা দিয়ে দিল। এখন আমার প্রশ্ন হল দরজি এর মজুরি পাবে না-কি পাবে না? আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বললেন, সে যেহেতু জামা ছোট করেছে তাই সে এর মজুরি পাবে। সে বলল, শায়খ আপনি ভুল বলছেন। আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বললেন, বিষয়টা আবার বল, সে আবারও বলল। আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বললেন, সে যেহেতু অস্বীকার করেছে তাই সে মজুরি পাবে না। সে বলল, আপনি ভুল বলছেন। আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বললেন, তোমাকে কে পাঠিয়েছে? সে বললো, আমাকে শায়খ আবু হানিফা পাঠিয়েছেন।

আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ তখন আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর নিকট গেলেন এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, শায়খ! মাসআলার উত্তর কী? আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তাঁর দিকে না তাকিয়ে দরস দিতে লাগলেন। আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ আবারও বললেন,শায়খ! মাসআলাটির উত্তর কী? আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ তাঁর কোনো উত্তর না দিয়ে দরস শেষ করলেন। অতঃপর আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর সামনে এসে বসলেন এবং বললেন, শায়খ! মাসআলা। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বললেন, তুমি তো শায়খ উত্তর দাও। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি নই বরং আপনিইশায়খ। আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বললেন, তোমার মাসআলা কী বল? তিনি বললেন আপনি জানেন।

দরজি আর কাপড়-মালিকের মাসআলা? আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, দরজি তার মজুরি পাবে না-কি পাবে না এই মাসআলা?এর উত্তর হল আমরা ভালভাবে যাচাই করবো যে, আসলে কাপড়টা কার মাপে কাটা হয়েছে? যদি কাপড়টা দরজি নিজের মাপে কাটে তাহলে সে তার মজুরি পাবে না,কারণ সে চুরির নিয়তে কাপড় কেটে সেলাই করেছে এবং সে কাপড় কাটা ও সেলাই করার কাজটা করেছে নিজের জন্যে, কাপড়ের মালিকের জন্যে নয়। আর যদি কাপড় কাটে কাপড়ের মালিকের মাপে তাহলে সে মজুরি পাবে,কারণ সে কাপড়ের মালিকের জন্যেই কাজ করেছে, অতঃপর তার মনে কুমন্ত্রণা জায়গা করেছে এবং সে তা চুরি করেছে। অতঃপর তিনি বললেন, আবু ইউসুফ মাসআলাটি বুঝেছো? আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বললেন,জী বুঝেছি। এরপর ১৫০ হিজরিতে আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর মৃত্যু পর্যন্ত আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ তাঁর দরসে বসেন। আর তাঁর মৃত্যুর পর আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ রাষ্ট্রের চিফ জাস্টিস তথাপ্রধান বিচারপতিহন।

আবু ইউসুফ রহ. একদিন খলিফার মজলিসে বসা। আজ মজলিসে আরো অনেক সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আছেন। খলিফা নিজ আসনে বসা। তার সামনে অনেক লোক; বিভিন্নজন বিভিন্ন প্রয়োজন নিয়ে এসেছে। আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ একটি চেয়ারে বসা। খাদেমরা তখন তাঁদের জন্যে খাবার নিয়ে এল এবং খলিফার জন্যে বিশেষ হালুয়া তথা বাদামের ফালুদা আনা হল এবং তাঁর সামনে রাখাহল। খলিফা খাদেমকে বললেন, শায়খের মাধ্যমে শুরু কর। অর্থাৎ আগে শায়খকে দাও। একথা বলে আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করলেন। আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ তখন প্রধান বিচারপতি। খাদেম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহর সামনে বাদামের ফালুদা রাখল। আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহসামনে বাদামের ফালুদা দেখে হাসতে শুরু করলেন এবং হাসতে হাসতে শুয়ে গেলেন।

খলিফা এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে, আমরা আপনাকে সম্মান করে হালুয়া দিলাম আর আপনি এভাবে হাসছেন!! তাই সে বললো, শায়খ! হাসছেন কেনো? আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বললেন,

Contents

আল্লাহর শপথ আমার ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য নেই; বরং আমার বাবাকে বলা ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর একটি কথা মনে পড়ল। তিনি আমার বাবাকে বলেছিলেন, আমি তোমার সন্তানকে এমন ইলম শিক্ষা দেব যে, সে যদি তা ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারে তাহলে একদিন খলিফা ও আমির-ওমারাদের সাথে গালিচায় বসে বাদামের ফালুদা খাবে। আমার বাবা তখন আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, সে বাদামের ফালুদা খাবে!? সে খলিফাদের সাথে বসবে!? আপনারা লক্ষ করুন, ইলম আমার মর্যাদা কোথায় নিয়ে গেছে, এই তো আমি খলিফাদের মজলিসে সবার সামনে গালিচার উপর বসে বাদামের ফালুদা খাচ্ছি।

অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ইমানদারদের এবং আলেমদের মর্যাদা অনেক উঁচু করে দিয়েছেন।

আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ মেধাবী ও প্রবিভাবানদের সম্মান করতেন; তাঁদের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতেন। আমরা অনেক সময় পশ্চিমাদের প্রশংসা করে বলি, তারা মেধাবী ও প্রতিভাবানদের মূল্যায়ন করে। তাদের গুরুত্ব দেয়, তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে গড়ে তুলে। কোনো একটা বিষয় আবিষ্কারের জন্যে তারা তার সামনে সকল দরজা খুলে দেয়। অথচ আমরা?

আমাদের সালাফগণও মেধাবী ও প্রতিভাবানদের মূল্যায়ন করতেন এবং তাদেরকে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সব রকমের সহযোগিতা করতেন। ঠিক যেরকম আমাদের নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিভাবানদের মূল্যায়ন করতেন।

আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ কখনই চাননি যে, আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ হারিয়ে যাক, তাঁর মেধা ও প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাক। তিনি কুলির কাজ করে রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে জীবন পার করে দিক। আমি বলছি না যে, কুলির কাজ করা খারাপ বরং কুলির পেশা তো একটা মহান ও সম্মানিত পেশা যে,এর মাধ্যমে হালাল রুজি উপার্জন হয়। আর দোয়া কবুলের প্রধান শর্ত হচ্ছে হালাল রুজি ভক্ষণ করা; কিন্তু ইলম অর্জন করা ও তার জন্যে মেহনত করা কুলির পেশার থেকে অনেক অনেক উত্তম, কারণ এর মাধ্যমে একজন আলেম শুধু নিজে উপকৃত হয় না বরং পুরো জাতি

Contents

আলেমের মুখাপেক্ষী। সুতরাং ইলমের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে আর একারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

‘ইলমহীন আবেদের চেয়ে আলেমের মর্যাদা হল সকল তারকার উপর চাঁদের মর্যাদার মত।’

অন্য হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

‘জ্ঞানহীন আবেদের চেয়ে আলেমের মর্যাদা হল তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদার মত।’

আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ যখন দেখলেন আবু ইউসুফ ছেলেটা অন্য সবার চেয়ে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। তাঁর মধ্যে বিশেষ কিছু আছে। তাই তিনি তাঁকে সাহায্য করলেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব নিলেন। ফলে আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ স্বতন্ত্র ও বিশেষ কিছু হয়ে উঠলেন এবং তিনি ইমাম আবু ইউসুফ হয়ে উঠলেন। সুতরাং হে ভাই! আমরাও যখন আমাদের সাথীদের মধ্যে স্বতন্ত্র কাউকে দেখবো, কারো মধ্যে বিশেষ কিছু দেখতে পাবো তখন তাকে উৎসাহিত করবো, তার পৃষ্ঠপোষকতা করবো, তাকে বই কিনে দিবো। সে যদি কোনো কারণে পড়ালেখা বন্ধ করে দিতে চায় তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করবো, কেনো সে পড়ালেখা বন্ধ করতে চাচ্ছে? সে যদি টাকার কারণে পড়ালেখা ছেড়ে দিতে চায় তাহলে আমরা তাদের ও তাদের পরিবারের খরচ বহন করবো এবং তাদেরকে জাতির সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলবো,যুগের আবু ইউসুফ হিসেবে গড়ে তুলবো।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, মানুষ যেনোনিজ সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে গর্ব না করে, কারণ প্রত্যেক আলেমের উপর একজন আলেম রয়েছেন। পরিশেষে মহান আল্লাহ তাআলার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি যেনো আমাদের ও আপনাদের সকলকে যা কিছু বললাম ও শুনলাম এর উপর আমল করার তাওফিক দান করেন এবং আমাদের সকলের ইলম ও বুঝ-উপলব্ধি আরো বৃদ্ধি করে দিন। আমিন।

আন্দালুসের ছাত্র

আমরা এখন আন্দালুসে ভ্রমণ করবো, বর্তমানের স্পেন নয়, হাজার বছর পূর্বের আন্দালুসে ভ্রমণ করবো, যখন সেখানে অনেক মসজিদ ছিলো এবং ছিলো অনেক মাদ্রাসা। মসজিদে মসজিদে আলেমগণ দরস দিতেন এবং দূরদূরান্ত থেকে এসে অসংখ্য ইলম-পিপাসু ছাত্র সেখানে ভীড় জমাতো।

এখন আমরা আন্দালুসের এক আলেমের ঘটনা বর্ণনা করবো। তিনি কীভাবে ইলম আর্জন করেছেন? ইলমের জন্যে কোথায় কোথায় সফর করেছেন? এজন্যে কতটা কষ্ট ভোগ করেছেন?কী জন্যে তিনি ইলম অর্জনের জন্যে ভিক্ষুকের পোশাক পরিধান করেছেন? কেনো আলেম-তালেবে ইলমের পোশাক পরিধান করেননি?কী জন্যে তিনি সকাল-সন্ধ্যা দরজার সামনে এসে বলতো আল্লাহর জন্যে আমাকে কিছু সাহায্য করুন, আমাকে কিছু ভিক্ষা দিন, সে কি সত্যিই ভিক্ষুক ছিল? না লোকটি দরিদ্র বা ফকির ছিলো না; কিন্তু সে যার কাছে ইলম শিক্ষা করতো সে তাঁকে একটা শর্ত দিয়েছিলো যে, যদি তাঁর কাছ থেকে ইলম অর্জন করতে হয় তাহলে তাকে ভিক্ষুকের পোশাক পরিধান করতে হবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর দরাজায় এসে ভিক্ষা চাইতে হবে, আশ্চর্য ব্যাপার!! কেনো তিনি এমনটা করলেন? এখন আমি আপনাদের সামনে এবিষয়টিই বিস্তারিত বর্ণনা করবো।

নাকি ইবনে মুখাল্লাদ রহিমাহুল্লাহ আন্দালুস থেকে সমুদ্রে ভ্রমণ করে আফ্রিকার উপকূলে পৌছলেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মক্কায় আসলেন, মক্কায় কিছু দিন কাটিয়ে সেখান থেকে বাগদাদের দিকে পথ ধরলেন। অবশেষে অনেক কষ্টে বাগদদে পৌছলেন। তার মনইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহকে দেখা ও তাঁর দরসে বসার জন্যে অস্থির হয়ে ছিল; কিন্তু আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ তখন ফেতনার পরীক্ষায় কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। অর্থাৎ খলকে কুরআনের ফেতনা। তিনি ফাতওয়া দিলেন– কুরআনকে মাখলুক বলা জায়েয নেই। কুরআন

Contents

হল আল্লাহর কালাম আর আল্লাহর কালাম তাঁর সিফাতের অন্তরভুক্ত। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে বলেন :

وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ○

'আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে,তবে তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এর কারণ হল, এরা জ্ঞান রাখে না।'[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন :

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

'আর আল্লাহ মুসার সাথে সরারসরি কথোপকথন করেছেন।'[২]

আর আল্লাহ তাআলা নিজ সত্তার শানানুযায়ী কথা বলেন। আর কুরআন হল আল্লাহর কালাম যা তিনি আমাদের নিকট নাযিল করেছেন। সেখানে কিছু মানুষ ছিলো যারা এটা অস্বীকার করতো। তারা বলত– কুরআন হল আল্লাহ তাআলার মাখলুকের অর্ন্তভুক্ত (যা ধ্বংসশীল)। অর্থাৎ কুরআন মাখলুক। আর সেই যুগটা ছিলো আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর যুগ। তিনি বলেন, কুরআনকে মাখলুক বলা জায়েয নেই। কুরআন আল্লাহর কালাম। তারা বলে না কুরআনা মাখলুক (আর মাখলুক তথাসৃষ্টির সবকিছুই নশ্বর)। তিনি বলেন, না কুরআন আল্লাহর কালাম আর আল্লাহর কালাম কখনো মাখলুক হতে পারে না। এভাবে তাদের মাঝে বিশাল মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। তৎকালীন খলিফা ছিলো আল-মুতাসিম। তার একজন উজির ছিলো,নাম আহমদ ইবনে আবু দাউদ; যে কুরআনকে মাখলুক বলার পক্ষে ছিল। সে খলিফাকে নিজ ভ্রান্ত মতবাদ

---

১. সুরা তাওবাহ, আয়াত : ৬

২. সুরা নিসা, আয়াত : ১৬৪

বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল। খলিফা মুতাসিম ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহকে নিজ মত পরিবর্তন করতে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন; কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ ছিলেন অনড়, তিনি মরতে রাজি আছেন কিন্তু তাঁর মতবাদ-বিশ্বাস থেকে সামন্যও সরতে রাজি নন। এরপর তাঁকে প্রহার করা হল, তারপর চব্বিশ মাস জেলে বন্দি করে রাখা হল। এসময় প্রতিদিন তাঁকে প্রহার করা হত। মুতাসিম একদিন জল্লাদকে ডাকল এবং বললো, আমাকে তোমার বেতটা দেখাও, সেটা মজবুত না-কিদুর্বল আমি দেখবো। মুতাসিম বললো, তাকে আমার সামনে প্রহার করো, আমি দেখবো। তুমি কি তাকে আস্তে প্রহার করো না জোরে? এরপর জল্লাদ তাঁকে মুতাসিম ও মন্ত্রীদের সম্মুখে প্রহার করতো।

তাঁকে প্রহার করেআবার জেলে বন্দি করে রাখা হত। তখনকার জেল ছিলো খুবই সংকীর্ণ, আয়তনে ছোট, অন্ধকার; আলোবাতাস প্রবেশের কোনো ব্যবস্থা থাকত না। ওযু গোসলের জন্যে কোনোধরনের পানির ব্যবস্থা থাকত না। আর তারা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর অবস্থাকে আরো খারাপ ও শোচনীয় করে রেখেছিল, যাতে করে তিনি তাঁর মত থেকে সরে আসেন; কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ নিজ সিদ্ধান্তে পাহাড়ের মত অটল রইলেন। তিনি আপন মত থেকে চুল পরিমাণও নড়লেন না। এরপর যখন ওয়াসিক বিল্লাহ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করল তখন তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর উপর কিছুটা শিথিলতা করলেন। তিনি তাঁকে জেল থেকে বের করে গৃহবন্দি করে রাখলেন। মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা, দরস প্রদান করা ও কোনো ইলমি মজলিসে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ করলেন; এমনকি কারো সাথে কথা বলাও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিলো। কারো সাথে সাক্ষাতেরও অনুমতি ছিলো না। তাঁর সাথে যে দেখা করতে আসতো বা কথা বলতে আসতো তাকে জেলে বন্দি করে রাখা হত।

আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ যখন গৃহবন্দি অবস্থায় তখন শায়খ নাকি ইবনে মাখলাদ রহিমাহুল্লাহ আন্দালুস থেকে মক্কা হয়ে বাগদাদে পৌছলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র; তাঁর কোনো বাহন ছিলো না, তিনি এই দীর্ঘ সফর পায়ে হেঁটেপাড়ি দিয়েছেন। তিনি বাগদাদে এসে ইমাম

আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে মানুষকে জিজ্ঞেস করলেন। তারা তাকে বললো, তুমি এখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ থেকে ইলম শিখতে পারবে না, এমনকি তাঁর সাথে দেখাও করতে পারবে না, কারণ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ এখন গৃহবন্দি, সেখান থেকে বের হওয়া বা করো সাথে দেখা করা তাঁর জন্যে নিষিদ্ধ। অতঃপর নাকি ইবনে মাখলাদ রহিমাহুল্লাহ কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে মসজিদে প্রবেশ করলেন। মসজিদে তখন ইয়াহয়া ইবনে মাইন রহিমাহুল্লাহ দরস প্রদান করছিলেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহিমাহুল্লাহছিলেন নিজ যুগের একজন বড় ইমাম ও মুহাদ্দিস । নাকি রহিমাহুল্লাহ তাঁর মজলিসে গেলেন এবং তাঁকে সালাম দিয়ে বললেন, শায়খ আমি আন্দালুস থেকে এসেছি। সুতরাং আপনাকে কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি হয়তো আমার থাকবে। তিনি বললেন, ঠিক আছে আপনার প্রশ্ন করুন। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ. তখন দরস প্রদান করছিলেন, আশপাশে অনেক ছাত্র। নাকি রহিমাহুল্লাহ বললেন, আপনি অমুক রাবির ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বললেন, সে সত্যবাদী; কিন্তু অনেক বিষয়ই ভুলে যান; সুতরাং তুমি তার হাদিসের উপর ভরসা করতে পার না। এরপর অপর আরেকজনের ব্যাপারে বললো, অমুকে কেমন? তিনি বললেন সেও তার মতই। এরপর বললো, হিশাম ইবনে আম্মার কেমন? তিনি বললেন, সে সিকাহ-নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী এবং আস-সিকাহ ফাওকাস সিকাহ অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তখন তার আশপাশের ছাত্ররা বললো, আপনি তারাতারি করেন, এখানে আরো অনেক ছাত্র আছে এবং তাদের বেশ কিছু প্রশ্ন করার আছে। নাকি ইবনে মাখলাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি তখন দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম, আমার আরেকজন সম্পর্কে প্রশ্ন করার আছে।

হে ভাই! একবার কল্পনায় সেই মজলিসকে দেখার ও সেখানে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করো। নাকি ইবনে মাখলাদ রহিমাহুল্লাহ ইয়াহইয়া ইবনে মাইনরহিমাহুল্লাহর দরসে উপস্থিত। তাঁর সামনে অসংখ্য ছাত্র উপবিষ্ট। নাকি ইবনে মাখলাদ রহিমাহুল্লাহ তাঁর সামনে এসে স্পষ্ট করে বলেছে যে, সে অনেক দূর দেশ থেকে এসেছে। নাকি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি যখন দাঁড়ালাম এবং তাঁকে বললাম, আমার আরেকজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করার আছে। তিনি বললেন, কে সে?আমি বললাম আহমদ ইবনে হাম্বল। তখন সে বললো, তুমি আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. সম্পর্কে আমার কাছে প্রশ্ন করছো!!? আরে আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর নিকট তো আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আমার কি সেই অধিকার আছে যে, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলবো সে সত্যবাদী, তার হাদিস গ্রহণ করা যাবে!! বরং আমার সম্পর্কে আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ কে প্রশ্ন করা হবে। আমি একজন দুর্বল লোক। আমার ব্যাপারে যদি আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন সে সত্যবাদী, তার হাদিস গ্রহণ করা যায় তাহলে এটা তো আমার সৌভাগ্য ও খুশির বিষয়।

নাকি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি তখন সেখান থেকে উঠে সোজা আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর দরজায় এসে কড়া নাড়তে লাগলাম, তিনি ভিতর থেকে দরজা খুলে দিলেন। আমি তখন বললাম, আমি ইলম হাসিল করার জন্যে এসেছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে কিন্তু আমার অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চয় তোমার কাছে এরই মধ্যে সংবাদ পৌছেছে? আমি বললাম হাঁ, পৌছেছে; কিন্তু আল্লাহর শপথ করে বলছি আমি অনেক দূর থেকে আপনার কাছে ইলম শিখার জন্যে এসেছি। তিনি বললেন, কোথা থেকে এসেছো? আমি বললাম পশ্চিমা দেশ থেকে। তিনি বললেন আফ্রিকা? আমি বললাম, আরো দূর থেকে সমুদ্রের ওপারে আন্দালুস থেকে, সমুদ্র পার হয়ে আফ্রিকায় এসেছি, আফ্রিকা থেকে মক্কায়, অতঃপর মক্কা থেকে আপনার নিকট ইলম অর্জন করতে এসেছি। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তোমার ইলম অর্জনের অধিকার রয়েছে; কিন্তু তুমি তো আমার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছো। সুতরাং আমি তোমাকে ইলম শেখাতে ও হাদিস বর্ণনা করতে পারছি না। আমি বললাম, আমি আপনার কাছ থেকে ইলম শিখবো, আমাকে আপনার ইলম শিখাতেই হবে। তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি তোমাকে ইলম শিখাবো কিন্তু একটা শর্ত আছে আর তাহল তুমি প্রতিদিন আমার কাছে ফকির-বেশে আসবে। অতঃপর আমার দরজায় এসে ভিক্ষা চাওয়ার ভান করে চিৎকার করতে থাকবে এবং বলবে আমাকে কিছু সাহায্য করুন, আমাকে কিছু খাবার দিন,

অতঃপর আমি তোমাকে খাবার দিব এবং তোমার নিকট হাদিস বর্ণনা করবো আর তুমি তখন তা মুখস্থ করে নিবে।

আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ জানতেন যে, তাকে যেহেতু কথা বলতে ও হাদিস বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে সুতরাং তাঁর আশপাশে গোয়েন্দাও নিয়োগ করা হবে, যারা লক্ষ করবে যে, সে কারো সাথে কথা বলে কি-না, কারো নিকট হাদিস বর্ণনা করে কি-না? এবং সে ঘর থেকে বাইরে বের হয় কি-না? তিনি জানতেন যে, তাঁকে পর্যাবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সুতরাং তিনি বললেন, তুমি প্রতিদিন ফকিরের বেশে আসবে। তোমার কাঁধে ফকিরের মত ব্যাগ ঝুলানো থাকবে, পোশাক থাকবে তাদের মত জীর্ণশীর্ণ এবং তুমি তাদের মতই সাহায্য চাইবে আর আমি তোমাকে খাবার দেওয়ার ভান করে অল্পঅল্প করে কখনো পাঁচটা কখনো দশটা এভাবে সুযোগমত হাদিস শুনাবো; কিন্তু সাবধান! কেউ যেনো বুঝতে না পারে। আর একটা কথা তুমি অন্য কোনো ইলমের মজলিসে বসবে না। যাতে গোয়েন্দারা এই সন্দেহ পোষণ করতে না পারে যে, লোকটি দিনে ইয়াহইয়া ইবনে মাইনের দরসে বসে আর মাগরিবের পরে ফকিরের বেশে ঘুরে, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। সুতরাং তুমি কোনো ইলমের মজলিসে বসবে না এবং তোমার থেকে যেনো কোনোভাবেই তালবে ইলমের অবস্থা প্রকাশ না পায়। আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ ইলম হাসিলের জন্যে তাঁকে এই পরিকল্পনা দিলেন। নাকি ইবনে মাখলাদ রহিমাহুল্লাহ কি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন? তিনি কি এই পরিকল্পনামত আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর নিকট আসতে পেরেছেন? না-কি তিনি গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পরেছেন, অতঃপর তাঁর পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেছে?

নাকি ইবনে মাখলাদ রহিমাহুল্লাহ দেখলেন আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ থেকে ইলম হাসিলের অন্য এটা ব্যতীত অন্য কোনো পথ নেই। তাই তিনি কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, হাতে লাঠি ও থালা নিয়ে জীর্ণশীর্ণ পোশাকে ফকিরের বেশে প্রতিদিন আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর নিকট আসতেন এবং বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাকতেন– আমাকে কিছু সাহায্য দিন, আমাকে কিছু খাবার দিন, আল্লাহ তাআলা আপনার

উপর রহম করবেন। আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ তখন দরজা খুলে তাঁকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাবার দিতেন এবং হাদিস বর্ণনা করতেন। তিনি চার পাঁচটা হাদিস বর্ণনা করতেন আর নাকি রহিমাহুল্লাহ তখনই তা মুখস্থ করে নিতেন। লেখার মত কোনো সুযোগ ছিলো না। হাদিস মুখস্থ শেষ হলে সেখান থেকে বের হয়ে যেতেন। এই অবস্থায় অনেক দিন কেটে গেল। অতঃপর খলিফা ওয়াসিক আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহকে গৃহবন্দি থেকে মুক্তি দিল এবং তাঁর কাছে হাদিয়া পাঠাল। আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ তার হাদিয়া গ্রহণ করলেন না। বন্দি জীবন থেকে মুক্তির পর আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ আবারও দরস শুরু করলেন। নাকি ইবনে মাখলাদ রহিমাহুল্লাহও তার দরসে উপস্থিত হতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ তাঁকে চিনতেন এবং তাঁর কদর জানতেন। তিনি তো জানতেন এই ছেলেটি ইলম-পাগল, ইলমের জন্যে প্রাণোৎসর্গকারী, তাই তিনি দরসে তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব ও বিশেষ মর্যাদা দিতেন।

একদিন ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ দেখলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র নাকি দরসে উপস্থিত নেই। তখন তিনি অন্যান্য ছাত্রদেরকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞে করলেন। তারা বললো, সে অসুস্থ। নাকি ইবনে মিখলাদ রহ. সতি অনেক অসুস্থ ছিলেন, তাই তিনি হোটেলের একটি কামরা ভাড়া ক সেখানে অবস্থান করছিলেন। নাকি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি যখন অসুস্থ অবস্থায় হোটেলে অবস্থান করছিলাম তখন হঠাৎ একদিন হোটেলের ভিতর অনেক শোরগোলের আওয়ায শুনতে পেলাম। কেউ বলছে, হাঁ তিনি এসেছেন, তিনি এখানে আছেন, এই দিকে আসেন, এই তোমরা এমন কর ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আওয়ায। আমি কামরার ভিতর থেকে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে, বাহিরে কী হচ্ছে ? তারা কাকে নিয়ে কথা বলছে, আর কে এসেছে? একটু পর দেখি আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ আমাকে দেখতে এসেছেন।

তিনি বলেন, আহমদ রহিমাহুল্লাহ আমাকে দেখতে এসেছেন এবং তাঁর সাথে অনেক ছাত্র এসেছে। তিনি কামরায় প্রবেশ করে আমার কাছে আসলেন এবং আমার মাথায় হাত রাখলেন আর ছাত্ররা এই দৃশ্য দেখছে

এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহকে দেখে রোগী দেখার সুন্নত ও আদব শিখে নিচ্ছে। ইবনে জাওযি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর দরসে পনের হাজার ছাত্র উপস্থিত হত। তাদের মধ্যে পাঁচ হাজার হাদিস লিখতো আর দশ হাজার তার নিকট থেকে উসলুব-পদ্ধতি শিখত। অর্থাৎ কীভাবে হাদিস বর্ণনা করতে হয়, কীভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তারা তাঁর আখলাক, চলাফেরা দেখতো ও অনুসরণ করার চেষ্টা করতো। তারা তাঁর হাদিসের হাফেয ছিল। নাকি ইবনে মাখলাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আহমদ রহিমাহুল্লাহ আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর এবং সাওয়াবের আশা কর, হয়তো আল্লাহ তাআলা তোমাকে অনেক সাওয়াব দান করবেন। তিনি আমার সাথে কথা বলছেন আর ছাত্ররা সবকিছু লিখে রাখল। তিনি চলে যাওয়ার পর হোটেলের মালিক আমার কাছে আসল এবং আমাকে বললো, আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক কী? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ তাঁর সাথে আমার কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই; কিন্তু আমি তাঁর একজন ছাত্র। তিনি আমাকে অনেক মুহাব্বত করেন। হোটেলের মালিক বললো, তাহলে আপনি আজ থেকে আমার হোটেলে ফ্রি থাকবেন। এরপর একজন আমার নিকট বিছানা নিয়ে এলো, একজন খাবার নিয়ে এলো, একজন পানি নিয়ে আসলো। আল্লাহর শপথ, এরপর থেকে তারা আমার পরিবারের চেয়েবেশি সেবা-যত্ন করতে লাগল। আমি যদি আমার পরিবারের নিকটও থাকতাম তারা আমাকে নিয়ে এতটা ব্যস্ত হতো না। হাঁ এটাই হল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর মর্যাদা আর এই হল তাঁর কাছ থেকে ইলম অর্জনেনাকি ইবনে মাখলাদ রহিমাহুল্লাহরমর্যাদা।

আমাদের সালাফগণ ইলম অর্জনের পথে সব ধরনের কষ্ট ও ক্লান্তি হাসিমুখে মেনে নিতেন। আর মানুষও তালেবে ইলমদের যথাযথ মর্যাদা ও কদর করতো; কিন্তু বর্তমানে সমস্যা হল অনেক মানুষ তালেবে ইলমদের ইলম অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং শরয়ি ইলম অর্জন করার ব্যাপারে তাদের নিরুৎসাহিত করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেছেন বিষয়টি যেনো ঠিক তেমনই হয়ে গেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

Contents

'নিশ্চয় কিয়ামতের পূর্বে এমন দিন আসবে যখন ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং জাহালাত (মুর্খতা) নামিয়ে দেওয়া হবে।'

বুখারিতে হাদিসটি এভাবে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'নিশ্চয় কিয়ামতের পূর্বে এমন দিন আসবে যখন ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং জাহালাত (মূর্খতা) ছাড়িয়ে দেওয়া হবে।'

অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে মানুষের মধ্যে জাহালাত ছড়িয়ে যাবে। এখন তো মানুষ এমনসব বিষয়ে প্রশ্ন করে যা শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে, এমন বিষয়ও কারো অজানা থাকতে পারে? তুমি দেখবে যে, তোমাকে তাহারাত বা ওযুর মাসআলা জিজ্ঞেস করছে অথচ সে একজন বয়স্ক লোক, এই মাসআলাগুলো তার এমনেই জানা থাকা দরকার ছিল। তোমাকে সালাতের এমন একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করবে যে, তুমি আশ্চর্য হয়ে তাকে বলবে, আরে ভাই আপনার চল্লিশ বছর হয়ে গেল এখনও এই মাসআলাটা জানেন না, এটা জানেন না যে, সালাতে এই বিষয়টা ভুল, এটা সুন্নত আর এটা সঠিক!!

আর আফসোসের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে মানুষ ইলমে শরয়ি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুখ থাকছে। বর্তমানে দীনের ইলম ব্যতীত মানুষকে তুমি অন্যসব বিষয়ে দক্ষ দেখতে পাবে। তারা কম্পিউটার শিখে এবং তার খুঁটিনাটি সব বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে। তারা গাড়ি চালানো শিখে ও তার অন্যান্য সব বিষয় সম্পর্কে জানে। মোবাইল সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা তোমার পাশের কাউকে জিজ্ঞেস করলে সে তোমাকে এর সমাধান দিবে। অতঃপর তুমি যদি তাকে বল মা-শা-আল্লাহ! তোমার তো দেখছি অনেক জ্ঞান। তুমি কম্পিউটারের সব বিষয় সম্পর্কে জান, মুবাইলের সব বিষয় সম্পর্কে জান; আচ্ছা তুমি কি'আল্লাহুস সামাদ'-এর অর্থ জান? তুমি কি'গাসিকিন ইযা ওয়াকাব'-এর অর্থ জান? তুমি কি জানো চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতে কেউ যদি শেষ রাকাতে না বসে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সে কী করবে? সাহু সিজদা কখন দিতে হয়? সালামের আগে না পরে? তুমি দেখবে সে বলছে আমি জানি না!!

আমাদের সালাফদের নিকট ইলম অর্জন এত সহজ ছিলো না, ইলম অর্জন ছিলো অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তা সত্যেও তাঁরা ইলম অর্জন করেছেন। তারা ইলমের জন্যে সারা দুনিয়া সফর করেছেন। অতঃপর ইলমের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়েছেন। তাঁরা ইলম অর্জনের জন্যে দীর্ঘপথ সফর করতেন, অনেক মরুভূমি ও উপত্যকা পাড়ি দিতেন। কখনো কখনো মরুভূমিতে পথ হারিয়ে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করতেন। কখনো ক্লান্তিতে যমিনের উপর পড়ে যেতেন। কেউ কেউ তো ইলম অর্জনের জন্যে বের হয়ে পথিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করতেন। এবিষয়ে তো একটি কিতাবই রচিত হয়েছে, "আর রিহলাতু ফি তালাবিল হাদিস ও ফি তালাবিল ইলম" ।তাঁরা এটাকে কোনো সমস্যাই মনে করেননি বরং তাঁরা ইলম অর্জনের জন্যে নিজের সবকিছুই বিলিয়ে দিতেন।

বর্তমানে আমাদের জন্যে ইলম অর্জন করা অনেক সহজ। ইলমে শরয়ি অর্জন করা আরো বেশি সহজ। বর্তমানে অনেক কম দামে কিতাব পাওয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো এগুলো ফ্রি বিতরণ করা হয়। ইন্টারনেটে খুব সহজে দীনি বই পাওয়া যায়। অনেক লাইব্রেরি রয়েছে। অনেক এলাকায় পাবলিক পাঠাগার আছে। মানুষ চাইলে খুব সহজেই ইলম অর্জন করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে ইলম শিক্ষার মজলিস হয়, ইলম শিক্ষার কোর্স হয়। এর মাধ্যমে মানুষ খুব সহজে ইলম অর্জন করতে পারে। মোটকথা বর্তমানে ইলম অর্জন না করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাধা নেই, কোনো প্রতিবন্ধকতা বা ওজর নেই। হাঁ এটা পূর্বে ছিলো; কিন্তু এখন নেই, কারণ পুর্বে তাঁরা অনেকেই লিখতে জানতো না, তাদের কাছে ইলম অর্জনের জন্যে কিতাব ছিলো না; কিন্তু বর্তমানে বিষয়টি অনেক সহজ হয়েছে, এর চেয়ে আর সহজ হয় না; কিন্তু মানুষ এখন ইলম থেকে বিমুখ থাকছে। বাবারা ছেলেদেরকে শরয়ি ইলম শিখাচ্ছে না, মায়েরা ছেলে-মেয়েদের ইলমে দীন শিখার উপর উদ্বুদ্ধ করছে না।

একটি মজার ঘটনা বলে আজকের আলোচনা শেষ করছি। ঘটনাটি ঘটেছিলো আ'মাশ রহিমাহুল্লাহ ও তাঁর এক ছাত্রের মধ্যে। আ'মাশ

রহিমাহুল্লাহর নিকট দূর দেশ থেকে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এক ছাত্র হাদিস শিখার জন্যে আসলো। সে এসে আমাশ রহিমাহুল্লাহর সাথে মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করল, অতঃপর দরসে বসার ইচ্ছা করল। তখন আ'মাশ রহিমাহুল্লাহর এক ছাত্র তাঁকে বললো, আজ দরস হবে না। সে বললো, কেনো? আমি আমার পরিবার পরিজন ছেড়ে এত দূর দেশে থেকে এসেছি অথচ আজ তিনি হাদিস বর্ণনা করবে না, আজ তাঁর দরস হবে না এর কারণ কী? তাঁরা বললো, আজ শায়খ অত্যন্ত রাগান্বিত, আমরা তাঁকে এক অনুচিত প্রশ্ন করেছিলাম। ফলে সে কসম করেছে যে, আমাদেরকে এক মাস পর্যন্ত হাদিস বর্ণনা করবেন না। তখন সে বললো, এক মাস হাদিস শুনা ছাড়া এমনি এমনি কাটিয়ে দিতে হবে? তারা বললো হাঁ, আমরা এই সময়ে হাদিস লিখে বাড়িতে গিয়ে নিজ নিজ পরিবারের সাথে দেখা করে আসতে চাচ্ছি। তিনি তো এক মাস পর্যন্ত হাদিস বর্ণনা করা বন্ধ রাখবেন। এই সুযোগে আমরা আমাদের পরিবারের নিকট যাব।

তখন ছেলেটি আ'মাশ রহ.-এর নিকট গেল। আ'মাশ রহিমাহুল্লাহ চোখে কম দেখতেন, বিশেষ করে রাতে চোখে দেখতেন না। ছেলেটি তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, শায়খ! আমি অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছি, সুতরাং আপনি আমার প্রতি একটু লক্ষ করুন। তখন তিনি বললেন, না এক মাস কোনো হাদিস বর্ণনা করা হবে না, আমি কসম করেছি। অতঃপর আ'মাশ রা. লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। ছেলেটি তখন তাঁকে বললো, শায়েখ আমি আপনাকে বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসি। তিনি বললেন, ঠিক আছে ভাল, আল্লাহ তাআলা তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। ছেলেটি তাঁর হাত ধরে মসজিদ থেকে বের হল এবং তাঁকে নিয়ে বামে তাঁর বাড়ির দিকে না নিয়ে ডানে মরুভূমির দিকে নিয়ে গেল। আ'মাশ রহিমাহুল্লাহ ছেলেটির সাথে হাঁটছে কিন্তু তিনি জানেন না যে, ছেলেটি তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? অনেক্ষণ হাঁটার পর আ'মাশ রহিমাহুল্লাহ ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা এখন কোথায় আসলাম? ছেলেটি তখন তাঁকে বলল, শায়খ! আমরা এখন মরুভূমিতে আছি। আপনি যদি আমাকে এই মুহূর্তে একশত হাদিস বর্ণনা না করেন

তাহলে আমি আপনাকে এই মরুভূমির মধ্যে একা ফেলে চলে যাব। আপনি মরুভূমিতে একা একা থাকলে মৃত্যুবরণ করবেন। অতঃপর আগামীকাল আমরা আপনাকে হয়তো কোনো বাঘ অথবা সাপের পেট থেকে উদ্ধার করবো। আপনি কি আমাকে একশত হাদিস বর্ণনা করবেন না-কি আমি আপনাকে এই মরুভূমিতে একা ফেলে চলে যাব? আমাশ রহিমাহুল্লাহ বললেন, তুমি আমার সাথে এমনটি করতে পার না, এটা হারাম। ছেলেটি তখন বললো; বরং আপনি নিজেই নিজের উপর হারাম। আমি এত দূর দেশ থেকে কত কষ্ট করে আসলাম, আমি তো আপনার সাথে কোনো সমস্যা করিনি। অথচ আপনি আমাকে হাদিস থেকে বঞ্চিত রাখছেন? আ'মাশ রহিমাহুল্লাহ যখন দেখলেন তিনি এখন অপারগ, হাদিস বর্ণনা ছাড়া তাঁর সামনে আর কোনো পথ নেই তখন বললেন, ঠিক আছে লিখো, আমি হাদিস বর্ণনা করছি। এরপর ছেলেটি লিখতে লাগল আর শায়খ আ'মাশ রহিমাহুল্লাহ হাদিস বর্ণনা করলেন। এরপর ছেলেটি কাগজগুলো সাথে নিয়ে শায়খকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেলেন।

তাঁরা যখন শহরে প্রবেশ করল তখন ছেলেটি কাগজগুলো তার এক সাথীর কাছে দিয়ে দিল। অতঃপর শায়খকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল। তিনি যখন বাড়িতে পৌঁছলেন তখন বললেন, হে লোকেরা! তোমরা একে ধরো, এই ছেলেটি চোর, দেখো তার সাথে খাতা আছে। ছেলেটি তখন বললো, শায়খ! আমার কাছে কোনো খাতা নেই, আমি শহরে ঢুকেই তা এক সাথীর কাছে দিয়ে দিয়েছি। আ'মাশ রহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, আমি তোমাকে যতগুলো হাদিস বর্ণনা করেছি তার সবগুলোই যইফ (দুর্বল)। ছেলেটি তখন বলল, শায়খ আপনি এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরব্যাপরে মিথ্যা কথা বর্ণনা করতে পারেন না। আ'মাশ রহিমাহুল্লাহ বললেন, হাঁ তুমি সত্য বলেছো; কিন্তু আমি এখন তোমাকে বলছি তুমি হাদিসগুলো মুছে ফেল, এগুলো যইফ হাদিস। এরপর তিনি তাকে বললেন, এখন তোমার অন্তরও জ্বলতে থাক যেভাবে খানিক পূর্বে আমি কষ্ট পেয়েছি। বিভিন্ন কারণে তাঁরা ছাত্রদের সাথে কখনো কখনো কৌশল করতেন।

Contents

আল্লাহ তাআলার নিকট আমার জন্যে এবং আপনাদের জন্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেনো আমাদের সকলকে উপকারী ইলম ও আমলে সালিহা (সৎকর্ম) করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আমরা এবং পরিবেশ: কে কার পরিবর্তন করে?

প্রকৃতগতভাবেই মানুষ আশপাশের অবস্থা ও পরিবেশের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। সুতরাং যে জীবন ও জীবনের চলার পথ পরিবর্তন করতে চায় সে যেনো তার চারপাশের অবস্থা ও পরিবেশে পরিবর্তন আনে। আমি যখন আমার সন্তানের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখি যা তার মধ্যে পূর্বে ছিলো না অথবা তার মধ্যে কোনো খারাপ অভ্যাস দেখতে পাই যা পূর্বে ছিলো না, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কার সাথে চলাফেরা করো? তুমি কি নতুন কোনো বন্ধু গ্রহণ করেছ? অথবা তার কথা বলার মধ্যে অথবা ভাষার মধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন দেখি তাহলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি নতুন কোনো বন্ধুর সাথে চলাফেরা শুরু করেছো? তোমার প্রতিষ্ঠানে কি অমুক অমুক অঞ্চলের কেউ ভর্তি হয়েছে? মানুষ সত্তাগতভাবেই তার চারপাশের অবস্থা ও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এখন আমরা উপত্যকায় বসবাসকারী এক বেদুইন কবির গল্প বলব, যে পূর্বে কখনো শহরে যায়নি এবং শহর দেখেনি। মরুভূমিতে উট, দুম্বা আর ভেরা-বকরি চড়িয়েই যার জীবন কেটেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই যার দেখা হত উট-দুম্বা আর ভেরা-বকরির সাথে। যে এই বিশাল আকাশ, বিস্তৃত মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত আর ঝর্ণা-প্রস্রবণ ব্যতীত কিছুই দেখেনি। শহরের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও এর সভ্যতার সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। আশপাশের পরিবেশ ও এর সভ্যতা-সংস্কৃতি অতিক্রম করে অন্য কিছু নিয়ে ভাবাটা মানুষের জন্যে অনেক কষ্টকর বিষয়; কখনো কখনো তা অসম্ভবও হয়ে উঠে। এই বেদুইন কবিও কথা বলতে পারে মরুভূমি অবস্থা নিয়ে, ঠান্ডা-গরম, ঝড়-বৃষ্টি নিয়ে; কিন্তু এর বাইরে তুমি তার থেকে কিছু আশা করতে পারো না। আমাদের আলোচ্য কবিও

এই বাইরে নয়; কিন্তু এই কবি একদিন শহরে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের নিকট গিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করল আর তখনই খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সাথে তার এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনাটিই আমাদের সামনের আলোচ্য বিষয়।

বেদুইন কবি আলি ইবনে হাযাম শুনেছে যে, খলিফা মুতাওয়াক্কিল কবিদের অনেক সম্মান করেন এবং তাদের হাদিয়া ও পুরস্কার দেন। তাই সে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের নিকট গেল। সে খলিফার দরবারে গিয়ে দেখল সেখানে অনেক কবি খলিফার প্রশংসা করে কবিতা আবৃত্তি করছে। একজন কবিতায় বলছে, হে আমিরুল মুমিনিন আপনার সুনাম ও সুখ্যাতি সূর্যের মত, এমন প্রশংসা শুনে মুতাওয়াক্কিল তাকে অনেক পুরস্কার দিল। এরপর আরেক কবি এসে বলছে, আমিরুল মুমিনিন! আপনার অনুগ্রহ সুরাইয়া তারকার মত। মুতাওয়াক্কিল তাকেও পুরস্কৃত করল। এভাবে একসময় বেদুইন কবি আলি ইবনে হাযামের আবৃত্তির পালা এলো। তার তো কবিতা রচনার নির্দিষ্ট একটা সীমানা ছিলো,সে সীমানা কখনো অতিক্রম করতে পারেনি। সে বলল, হে খলিফা!

انت كالكلب في حفاظك للودو كالتيس في قراع الخطوب

أنت كالدلو لا عدمتك دلوامن كبير الدلا كثير الذنوب

‘বন্ধুত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আপনি কুকুরের ন্যায় এবং বিপদাপদ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে পুরুষ ছাগলের ন্যায়।’

‘আপনি দয়া ও মহানুভবতার ক্ষেত্রে বালতির মত, পানিতে পূর্ণ একজ বড় বালতি, যা থেকে কোনো বালতি খালি যায় না।’

কবিতার মধ্যে প্রথমে মুতাওয়াক্কিলকে কুকুর, তারপর ছাগল, এরপর বালতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। মুতাওয়াক্কিল অত্যন্ত রাগীও কঠোর স্বভাবের লোক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। কবির মুখে নিজেকে ছাগল-কুকুর আর বালতির সাথে তুলনা করতে শুনে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন; রাগে তাঁর চোখ লাল হয়ে গেল। মুতাওয়াক্কিলকে রাগ হতে দেখে তাঁর আশপাশে থাকা মন্ত্রী ও সভাসদরা নিশ্চিত ধরে নিল যে, এখনই এই

কবির হত্যার আদেশ আসবে। তাই তারা পরিধেয় কাপড়কে রক্তের ছিটা থেকে বাঁচানোর জন্যে গুটিয়ে একটু দূরে সরে গেল; কিন্তু আজ মুতাওয়াক্কিলের মধ্যে কিছুটা দয়া ও কোমলতা প্রকাশ পেল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কিছুটা সহানুভূতি দান করলেন। সে বুঝতে পারল যে, এই কবি গ্রাম থেকে আসা একজন অসহায় লোক। সে তার কবিতার মাধ্যমে তার প্রশংসাই করতে চেয়েছে। সে যে পরিবেশ থেকে এসেছে তা থেকে সে মুক্ত হতে পারেনি। তাই সে তাকে প্রশংসা করার ক্ষেত্রে কুকুর-ছাগল আর বালতির সাথে তুলনা করেছে। সুতরাং তার পরিবেশের পরিবর্তন দরকার। অতঃপর মুতাওয়াক্কিল কবির জন্যে প্রসাদের একটি সুন্দর কামরায় থাকার ব্যবস্থা করার আদেশ দিল। কায়েকজন আধুনিক কবিকে তার সঙ্গ দেওয়ার, তার সাথে থাকার নির্দেশ দিল এবং প্রসাদের সবচেয়ে সুন্দরী দাসীকে তার জন্যে খাবার পরিবেশনের নির্দেশ দিল। এরপর মাত্র দুই কি তিন সপ্তাহ পর মুতাওয়াক্কিল কবি আলি ইবনে হাযামকে তাঁর নিকট উপস্থিত করার নির্দেশ দিল। কবিকে তাঁর কাছে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন, তুমি এবার আমাকে নিয়ে কবিতা রচনা করো এবং আবৃত্তি করে আমাকে শুনাও।

এবার সে তার কবিতার মধ্যে মুতাওয়াক্কিলকে আধুনিক বিভিন্ন বিষয়ের সাথে তুলনা করতে বললো। তার এখনকার কবিতা শুনে দরবারের লোকেরা বুঝতে পারল যে, কেনো প্রথমবার মুতাওয়াক্কিল এই কবিকে হত্যার নির্দেশ দেয়নি। সে পরিবেশের কারণে বাদশার প্রশংসার ক্ষেত্রে কুকুর-ছাগল আর বালতির উপমা ব্যবহার করেছে। আর এখন সে উন্নত ও আধুনিক পরিবেশে কিছুদিন কাটানোর কারণে তার কবিতার রং-ঢং পালটে গেছে, এখন তার কবিতার মধ্যে আধুনিক জিনিসের উপমা এসেছে।

ভাই! এসো আমরা এবার বিষয়টাকে আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখি। আমাদের চারপাশে কত খারাপ ছেলে রয়েছে আবার অনেক ভাল ছেলেও চারপাশে দেখতে পাই। আমরা যদি এদের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব, যারা খারাপ তাদের অবশ্যই খারাপ বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, আর ভালদের রয়েছে ভাল বন্ধু। সুতরাং যারা

ভাল তারা বন্ধুদের ভালর দিকে নিয়ে গেছে, আর যারা খারাপ তারা বন্ধুদের খারাপের দিকে নিয়ে গেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, অনেক মেয়ে যারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভাল ছিলো, পর্দা করতো, খারাপ কোনো দিকে যেতো না, কোনো ছেলের সাথে হারাম সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকত; কিন্তু যখন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল তখন থেকে চলাফেরা, কথাবার্তা ও আচার-আচরণে পরিবর্তন আসা শুরু করল। এর কারণ কী?

এর কারণ হল পরিবেশ। পরিবেশ ও সাহচর্যই তাকে ধীরেধীরে পরিবর্তন করে দিয়েছে। মানুষের জীবনে পরিবেশ ও সাহচর্য অনেক বড় প্রভাব ফেলে, আর বিষয়টি আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۝

'সেদিন যালেম নিজ হস্তদ্বয় কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসুলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম।'[১]

কোন জিনিস তাকে রাসুলের সাথে পথ অবলম্বন করতে বাধা দিয়েছে? তার মাঝে ও এর মাঝে কোনো জিনিস আড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল? আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

'হায় আমার দূর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।'[২]

তাকে (অসৎ ব্যক্তিকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে কী হবে? কুরআনের ভাষায় শুনুন তাকে বন্ধুরূপে গহণ করলে কী ক্ষতি হবে?আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

১. সুরা ফুরকান, আয়াত : ২৭

২. সুরা ফুরকান, আয়াত : ২৮

لَقَدْ اَضَلَّنِیْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِیْ ؕ وَ كَانَ الشَّیْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ○

'আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিলো। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।'[১]

অর্থাৎ সত্যপথ থেকে আমি দূরে সরে গেছি। আর আমার দূরে সরে যাওয়ার কারণ হল সেই বন্ধু, যে আমার কাছে সত্য উপদেশ আসার পর আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল।সে আমাকে কুরআনের মজলিসে যাওয়া থেকে বাধা দিয়েছিলো বা বিভ্রান্ত করেছিলো। সে আমাকে বলেছিল, সেখানে যাওয়ার দরকার নেই। বিভিন্ন ভাল চ্যানেল বা ভাল ব্লগ দেখতে নিষেধ করেছে। সে বলেছে, তুমি এটা দেখো না; সে বলেছে প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াতের কী দরকার? শুক্রবারে একদিন তেলাওয়াত করলেই তো যথেষ্ট। আমি সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখতে চেয়েছি কিন্তু সে আমাকে বলেছে, রমযানের রোযা রাখাই যথেষ্ট। আমি ওয়ায ও নসিহতের মজলিসে উপস্থিত হতে চেয়েছি; কিন্তু সে আমাকে বলেছে, সেখানে যাওয়ার দরকার নেই। আমি বলেছি, আমি অমুক মেয়ের সাথে সম্পর্ক করবো না বা তার সাথে সম্পর্ক ছেড়ে দিব; তখন সে বলেছে, আরে ভাই! এখন যৌবনকাল, যৌবনকে উপভোগ করো। এই বন্ধুই আমার কাছে উপদেশ আসার পার আমাকে উপদেশ গ্রহণ করা থেকে বাধা দিয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের আলোচনা করেছেন এবং তারা জান্নাতে নিয়ামত আর আনন্দ খুশির মধ্যেদুনিয়াতে থাকা তাদের ঐসকল বন্ধুদের কথা স্মরণ করবে যারা তাদের বিপথে নিতে চাইতো। আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে বলেন:

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّیْ كَانَ لِیْ قَرِیْنٌ

'তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিলো।'[২]

---

১. সুরা ফুরকান, আয়াত : ২৯

২. সুরা সাফফাত, আয়াত : ৫১।

Contents

দুনিয়াতে আমার বন্ধু ছিল। আমি যখন মাদ্রাসায় বা কলেজে ছিলাম তখন আমার অনেক বন্ধু ছিলো, আমি যাদের সাথে একত্রে বসতাম,কথা বলতাম, কোথাও হাঁটতে বের হতাম, এভাবে আমাদের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে; কিন্তু তাদের মধ্যে অমুক বন্ধু ছিলো খারাপ। সে বলত, কুরআনের ভাষায় শুনুন, সে কী বলতো, আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ

'সে বলতো, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হবো, তখনও কি আমরা প্রতিফলপ্রাপ্ত হবো।'[১]

অর্থাৎ তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আখেরাত ও কিয়ামত-দিবস বলতে কিছু আছে? সুতরাং জান্নাতে যাওয়ার পর বিশ্বাসী বন্ধু বলবে,

قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ

'আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও?'[২]

সে জান্নাতে তার সেই বন্ধুকে খোঁজ করবে; কিন্তু সে তাকে জান্নাতে পাবে না। সুতরাং সে যেহেতু জান্নতে নেই তাই অবশ্যই সে জাহান্নামে থাকবে, কারণ মৃত্যুর পর জান্নাত ও জাহান্নাম ব্যতীত অন্য কোনো কিছু থাকবে না। সুতরাং সে তাকে জাহান্নামে পাবে।

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ

'অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে।'[৩]

সে যখন তাকে সেখানে দেখবে তখন বলবে,

قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ

---

১. সুরা সাফ্‌ফাত, আয়াত : ৫২-৫৩। ।

৩.সুরা সাফ্‌ফাত, আয়াত : ৫৪

১. সুরা সাফফাত: ৫৫

'সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে।'[১]

আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে, আমাকে পথভ্রষ্ট করে প্রায় জাহান্নামেই নিয়ে গিয়েছিলে। এরপর বলবে,

وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ○ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ○ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ○ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ○ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ○

'আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। এখন প্রথম মৃত্যু ছাড়া আমাদের আর মৃত্যু হবে না এবং আমরা শাস্তিপ্রাপ্তও হবো না। নিশ্চয় এটা এক মহাসাফল্য। এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।'[২]

সুতরাং তুমি যদি নিজেকে পরিবর্তন করতে চাও তাহলে তোমার পরিবেশ পরিবর্তন কর। মুতাওয়াক্কিল আলি ইবনে হাযামের পরিবেশ পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তাকে তার অবস্থান থেকে ভিন্ন এক স্থানে, ভিন্ন এক পরিবেশে রেখেছিল। সুতরাং তুমিও নিজেকে পরিবর্তন করতে চাইলে ভিন্ন এক পরিবেশে নিয়ে যাও, যেখানে তুমি ভাল বন্ধু পাবে, ভাল সাথী পাবে। যাদের সাথে চলে তুমি নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবে।

একবার একটি বাজারে মাহফিল ছিলো, সেখানে লেকচার দেওয়ার পর এক যুবক এ বিষয়ে আমাকে অনেক অশ্চর্যজনক একটি ঘটনা শুনিয়েছে। সেই ঘটনাটি কী? এবং তা থেকে আমরা কী শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি?

আমি একবার উইসাগরিয় অঞ্চলে লেকচার দিতে গিয়েছিলাম। সেখানের এক বাজারের একটি মাহফিলে আমি লেকচার দেই, লেকচারের বিষয়ও মোটামুটি এমনই ছিল।বিষয়টি ছিলো 'তাআলল্লুক মাআল্লাহ' তথা

---

১. সুরা সাফফাত, আয়াত : ৫৪-৫৬

২. সুরা সাফফাত, আয়াত : ৫৭-৬১

আল্লাহ তাআলার সাথে সুন্দর সম্পর্ক এবং এমন খারাপ পরিবেশ থেকে দূরে থাকা যা আমাকে অকল্যাণের দিকে নিয়ে যেতে পারে'।

নিজেকে ভাল করার ইচ্ছা করলে অবশ্যই আমাকে খারাপ পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন কেউ ধূমপান ছেড়ে দিতে চাইলে অবশ্যই তাকে ধূমপায়ীদের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে এবং তাদের সাথে সবধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, এমনকি মোবাইল থেকে তাদের নাম ও নাম্বার পর্যন্ত ডিলেট করতে হবে। অনুরূপভাবে একজন মাদকাসক্ত যদি নেশা ত্যাগ করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে নেশাকারীদের সঙ্গ পরিপূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে হবে, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। যে ব্যক্তি অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ ছেড়ে দিতে চায় তার ব্যাপারেও একই কথা অর্থাৎ তাকে সকল খারাপ সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে এবং সকল অপরিচিত মেয়েদেরনাম্বার নামসহ মুছে দিতে হবে। অর্থাৎ মানুষ যখন ভাল হতে চাইবে, খারাপ কোনো কাজ বা খারাপ কোনো অভ্যাস থেকে দূরে থাকতে চাইবে তাকে অবশ্যই খারাপ পরিবেশ ও খারাপ লোকদের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে। তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে।

আমার লেকচার শেষে এক যুবক এসে বললো, শায়খ আপনি যেবিষয়ে কথা বললেন আমার জীবনেও এমনই একটা ঘটনা ঘটেছে। আমি বললাম কী হয়েছিলো তোমার জীবনে? সে বলল, একবার আমার সাথীরা বললো, আমরা অমুক দেশে ঘুরতে যেতে চাই, তুমি কি আমাদের সাথে যাবে? দেশটি মুসলিম দেশ; কিন্তু সেখানে মদ-জুয়া আর অশ্লীলতায় ভরা। আমি তাদের বললাম, আমি তোমাদের সাথে যেতে পারি কিন্তু কোনো খারাপ বা অশ্লীল জায়গায় যাওয়া যাবে না। তারা রাজি হল, আমরা সেখানে তিন-চার দিন ভালভাবেই কাটালাম, এরপর এক রাতে আমরা একটি স্থান পরিদর্শনে গেলাম যেখানে নেশা ও অশ্লীলতায় ভরপুর ছিল। আমি তখন আমার সাথীদের বললাম, আমরা কিন্তু এই বিষয়ে অঙ্গিকার করে এসেছি যে, আমরা এধরনের যায়গায় প্রবেশ করবো না। এটা অশ্লীল কাজ, এটা হারাম। এটি সম্পূর্ণনা-জায়েয ও গর্হিতএকটি কাজ, আল্লাহকে ভয় কর। শায়খ! তারা বলল, এসো

যৌবনটাকে উপভোগ কর, একথা বলে তারা আমাকে খারাপ কাজের দিকে টেনে নিতে চেষ্টা করল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাকে শক্তি দিলেন এবং আমার ইমানি শক্তি বৃদ্ধি করে দিলেন। আমি তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে হোটেলে চলে এলাম। দুই-তিন ঘণ্টা পর হোটেলের দরজা খোলার আওয়ায পেলাম, আমি আমার কামরার দরজা বন্ধ করে ভিতারে বসে ছিলাম। আমি ওদের সাথে মেয়েলী কণ্ঠও শুনতে পেলাম। আমার তখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে, ওরা আজরাত অশ্লীল ও ঘৃণ্যভাবে কাটাতে চাচ্ছে।

এর দশ মিনিট পর ওদের একজন এসে আমার দরজায় নক করে বলতে লাগল, দরজা খুলো, আমাদের সাথে এসো জীবনটাকে উপভোগ কর। আমি বললাম, আমি আমার জীবনকে খুব ভালভাবেই উপভোগ করছি। মদ পান না করলে, নারীর সাথে অবৈধ মেলামেশা না করলে কি জীবন উপভোগ করা যায় না? আলহামদুল্লিাহ আমি আমার জীবনকে ভালভাবেই উপভোগ করছি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি দরজা খোলবো না এবং তোমাদের কাছে আসবো না। এরপর সে চলে গেল এবং দশ পনের মিনিট পর আবারও তারা দরজার কাছে এলো এবং দরজায় নক করে বলল, দরজা খোল; আমি বললাম, আমি কিছুতেই দরজা খুলব না। তখন তারা বলল, দরজা খুলে আমাদের মুবাইলের চার্জারটা দাও। আমি তাকিয়ে দেখলাম মোবাইলের চার্জার আমার কামরায়। আমি দরজা খুলে তাদের চার্জার দিতে গেলে তারা সকালে দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে দিল এবং একটা মেয়েকে আমার কামরার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি ভিতর থেকে চিৎকার করতে লাগলাম কিন্তু তারা দরজা না খুলে বরং বাহির থেকে সকলে হাসতে শুরু করলো। আমি ওদের পক্ষ থেকে সাহায্যের ব্যাপারে হতাশ হয়ে, ওদের সাহায্যের আশা ছেড়ে দিয়ে মেয়েটাকে আল্লাহর ভয় দেখাতে লাগলাম; কিন্তু ওরা একে টাকা দিয়ে চুক্তি করেছিলো যেনো সে আমাকে খারাপ কাজে লিপ্ত করে, তাই সে কোনোভাবেই আমার থেকে দূরে যেতে রাজি হচ্ছিল না, এদিকে বাইরে থেকে সকলেই হাসাহাসি করছিল। আমি এবার মেয়েটাকে বললাম, তুমি আমার সাথে খারাপ কাজ

করতে চাও কিন্তু আমি তো এইডসে আক্রান্ত, তখন মেয়েটিবললো, কত দিন থেকে তুমি এইডসে আক্রান্ত? আমি বললাম,এক বছর; তখন সে বললো, সমস্যা নেই আমিও দুই বছর থেকে এইডসে আক্রান্ত।

শায়খ! এবার মেয়েটি বললো, আমরা উভয়ে যেহেতু এইডসে আক্রান্ত সুতরাং এটা আমাদের বিশেষ কোনো ক্ষতি করবে না। মেয়েটি যখন এই কথা বলল, আমি তখন চিৎকার দিয়ে আমার সাথীদের বললাম, তোমরা দরজা খুলো, এই মেয়ে এইডসে আক্রান্ত। দরজা খুলো, এই মেয়ে এইডসে আক্রান্ত। তখন তারা দ্রুত দরজা খুলে তাকে হোটেল তাড়িয়ে দিলো। তারা তাকে এইডসের ভয়ে কামরা থেকে বের করে দিল কিন্তুআল্লাহকে ভয় করল না। তারপর ছেলেটি বলল, শায়খ! আমি তখন থেকে বিশ্বাস করে নিয়েছি যে, খারাপ লোকেরা কখনই চাইবে না যে, আপনি ভাল থাকেন বরং তারা সর্বদা এটাই চাইবে যে, আপনিও তাদের মত খারাপ কাজে লিপ্ত হন। তারা যদি এটা বলতো যে, মা-শা-আল্লাহ তুমি তো অনেক ভাল, কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত হও না। আমাদেরও খারাপ কাজ বর্জন করা উচিত। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি তিনি যেনো আমাদেরকে ভাল রাখেন এবং খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করেন। আমিন।

হে ভাই! সমস্যা হল, প্রতিটি যিনাকারিণী নারীই কামনা করে যে, পৃথিবীর সকল নারী যেনো যিনাকারিণী হয়ে যায়। আমার সাথে যোগাযোগ করে অনেকেই হেদায়াতের দোয়া চায় এবং হেদায়েতের পথে চলার আশা ব্যক্ত করে। আমি তাদের বলি, তোমার এই আশা এবং আহলে কিতাবদের আশায় কোনোই কাজ নেই। যে খারাপ কাজ করে সে সেটাকে বৈধ মনে করে এবং সেটা চালিয়ে যায়। কোনো জিনিস শুধু মাত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে অর্জন করা যায় না। কবির ভাষায়,

‘আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে উদ্দেশ্য অর্জন করা যায় না; বরং দুনিয়াকে গ্রহণ করতে হলে তাকে পরাজিত করতে হবে।’

মানুষ যখন সত্যিসত্যিই হেদায়াত কামনা করবে, অবশ্যই তাকে এর জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে মানুষ কমলার চারা

Contents

লাগাবে সে সেখান থেকে কমলাই পাবে,এখানে কলা বা আঙ্গুরের আশা করাটা হবেচ নিতান্তই বোকামি। অনুরূপভাবে যে খারাপ লোকদের সাথে চলাফেরা করে, নিজের জীবনের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করবে অতঃপর তার সাথীদের দিকে তাকিয়ে বলবে আল্লাহ! সে কত বড় হয়েছে, সে মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছে. আমার এই সাথী ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছে, অপরজন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে! আর আমি এই অবস্থায় পড়ে আছি। আমরা বলি, তোমার অবস্থা তো এমনই হবে। তুমি খারাপ লোকদের সাথে চলে জীবনের মূল্যবান সময় টুকু নষ্ট করেছো। তাহলে তোমার অবস্থা এমন হবে না তো কেমন হবে?

আমি অনেকগুলো জেল পরিদর্শন করেছি এবং সেখানে অনেক ধূমপানকারী ও নেশাগ্রস্তদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, কথা বলেছি এবং তাদের সামনে বক্তব্য দিয়েছি। এমনকি অনেক ফাঁসির আসামীদের সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে। তাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি যে, তাদের এই পরিবর্তন পরিবেশের কারণেই হয়েছে; খুনি বা নেশাগ্রস্ত হয়েছে। কোনো খুনিই জন্মের সময় মায়ের পেট থেকে অস্ত্র নিয়ে আসেনি। অথবা পৃথিবীতে এসেই সে অস্ত্র দেখেনি যে, সে জন্মের পর থেকেই খুনি হয়ে জন্মাবে। অনুরূপভাবে কোনো ধূমপানকারীও জন্মের সময় তার মায়ের পেট থেকে গাজা, হিরইন ও ইয়াবা নিয়ে আসেনি; বরং অন্য আর দশটা সন্তানের মত তাদেরও নিষ্পাপ অবস্থায় জন্ম হয়েছে; কিন্তু পরিবেশ তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সে যখন খারাপ পরিবেশে থেকেছে, খারাপ লোকদের সাথে মিশেছে তখন সে খারাপের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে।

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ যখন জাহান্নামিদের অবস্থা সম্পর্কিত এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ○ وَ لَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ○ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ○ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ○

Contents

'আমাদের কোনো সুপরিশকারী নেই এবং কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই। হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম! তাহলে আমরা মুমিন হয়ে যেতাম। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন এবং তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। আপনার পালনকর্তা প্রবল প্ররাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।'[১]

হাসান বসরি রহ. যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করেন তখন তিনি বলেন তোমরা দুনিয়াতে বেশি বেশি নেক লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো। তোমরা যদি তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করতে না পারো বা না চাও তাহলে অন্ততপক্ষে তোমরা তাঁদের সাথে পরিচিত হও। যেমন তুমি কোনো মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, হাফেযে কুরআনের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তালেবে ইলমের সাথে বন্ধুত্ব করবে না তাহলে কমপক্ষে যেনো এমন হয় যে, তুমি তাদের সাথে পরিচিত হবে, তোমাকে দেখলে সে যেনো চিনতে পারে এবং তুমিও তাঁকে চিনতে পার, সে তোমার নাম জানে এবং তুমিও তাঁর নাম জান। এটা শর্ত নয় যে, তাঁর সাথে প্রতিদিন আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতে হবে বরং তার সাথে দুই সপ্তাহে একবার দেখা করবে। তাও না পারলে সে যেনো আমাকে চিনে, আমার নাম জানে, আমি যখন তাঁর কাছে যাই সে যেনো আমার নাম নিয়ে বলতে পারে হে অমুক! কেমন আছো? অভিনন্দন তোমাকে।

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমরা দুনিয়াতে সৎ ও নেককার লোকদের সাথে বেশি বেশি বন্ধুত্ব করো,কারণ কিয়ামতের দিন সৎ ও নেককার বন্ধু তোমার উপকারে আসবে। লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করল, কীভাবে? তিনি বলেন, জাহান্নামিদের জন্যে নবি-রাসুলগণ, শহিদগণ এবং ফেরেস্তাগণ শাফায়াত করবেন। আর জান্নাতিরা তাদের নিয়ে আলোচনা করবে। যেমন এক জান্নাতি বলবে, আমার অমুক বন্ধুর কী হয়েছে? জান্নাতি বন্ধু যখন দুনিয়াতে থাকা তার বন্ধুকে জান্নাতে দেখতে না পাবে। অথচ সে কাফেরও ছিলো না, সে মুমিন ছিলো কিন্তু কখনো

১. সুরা আশ-শুআরা, আয়াত : ১০০-১০৩

Contents

কখনো গুনাহে লিপ্ত হত। সে বলবে, আমার অমুক বন্ধুর কী হয়েছে? সে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, অতঃপর যখন বলা হবে যে, তাকে তো জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তখন মুমিন বন্ধু বলবে, হে আমার রব!অমুক বন্ধুকে ছাড়া জান্নাতে আমার স্বাদ পূর্ণ হবে না। তখন আল্লাহ তাআলা আদেশ দিবেন আর তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। তখন জাহান্নামিরা একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে, তার জন্যে কে শাফায়াত করল? কোনো নবি কি তার জন্যে শাফায়াত করেছে? বলা হবে, না; কোনো শহিদ? বলা হবে, না; তাহলে সে কি তার নেক আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে? বলা হবে, না; তাহলে কে তার জন্যে শাফায়াত করল? তখন বলা হবে, তার অমুক বন্ধু তার জন্যে শাফায়াত করেছে। আর তখন জাহান্নামিরা বলবে :

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ○ وَ لَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ○فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ○

'আমাদের কোনো সুপরিশকারী নেই এবং কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই। হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম! তবে আমরা মুমিন হয়ে যেতাম।'[১]

অর্থাৎ হায় আমরা যদি দুনিয়াতে নেক ও সৎ বান্দাদের সাথে সম্পর্ক রাখতাম তাহলে আমরাও উত্তম লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতাম এবং তাদের সাথে জান্নাতেও থাকতে পারতাম।[২]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে নেককার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার তাওফিক দান করুন এবং আমরা এতক্ষণ যা কিছু আলোচনা করলাম তার উপর আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

---

২. সুরা শুআরা: ১০০-১০২

২. সুরা আশ-শুআরা, আয়াত : ১০০-১০৩

Contents

জান্নাতি নারীদের সর্দার

আমরা এখন কথা বলবো জান্নাতি নারীদের সর্দার ফাতেমাতুয যাহ্‌রা রা. সম্পর্কে। ফাতেমা রা. হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্টতম মানব মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শ্রেষ্টতম মানবী খাদিজা রা.-এর কন্যা।(খাদিজা রা. হলেন নারী ও পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারিণী এবং ইসলামের জন্যে সর্বপ্রথম অর্থব্যয়কারিণী।) এখন আমরা ফাতেমা রা. সম্পর্কে কথা বলবো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফামেতা রা.-এর সাথেঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করবো। এর মাধ্যমে সকল বাবারা জানতে পারবে যে, মেয়েদের সাথে তাদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত এবং মেয়েরা জানতে পারবে যে, বাবাদের সাথে তাদের আচরণ-উচ্চারণ কেমন হওয়া উচিত।

ফাতেমা রা. হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরকন্যা, জান্নাতের সর্দার হাসান ও হুসাইন রা.-এর মা, ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলি হায়দার রা.-এর স্ত্রী এবং তিনি জান্নাতি নারীদের সম্রাজ্ঞী। ফাতেমা রা. নারী ও পুরুষদের মধ্যে চেহারায় ও চরিত্রে নবি কারিম রা.-এর সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ দিকের ঘটনা। ফাতেমা রা. একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। ফাতেমা রা. যখন আসতেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসতেন এবং তাঁকে নিজের ডান পাশে অথবা বাম পাশে বসাতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যখন ফাতেমা রা.-এর নিকট যেতেন তখন তিনি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং নিজ আসনে তাঁকে বসাতেন; কিন্তু এবার যখন ফাতেমা রা. আসলেন তিনি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন না, কারণ এখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ সময়, তিনি শয্যাশায়ী। ফাতেমা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে গিয়ে বসলেন। আয়েশা রা. বলেন, ফাতেমা রা. আমাদের নিকট আসলেন, তাঁর হাঁটা ছিলো রাসুলুল্লাহ

Contents

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটার মত; কিন্তু এবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন না,কারণ তিনি অসুস্থ ছিলেন। তিনি এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মেয়ে আমার! অভিনন্দন তোমাকে, তোমার আগমন শুভ হোক! এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রা.-এর কানে কানে কী যেনো বললেন, আর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি যখন কাঁদলেন তাঁর কানে আরো কিছু বললেন আর তিনি হেসে দিলেন। আয়েশা রা. বলেন. আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে আশ্চর্যজনক আর কিছুই দেখিনি যে, প্রথমে কাঁদলেন এরপর ততক্ষণাত আবার হাসলেন। আমি ফাতেমা রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, হে ফাতেমা! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে কী বলেছেন? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা গোপন রেখেছেন আমি তা প্রকাশ করবো না। আয়েশা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর একদিন আমি ফাতেমা রা.কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন আপনাকে কী বলেছিলেন? তখন তিনি আমাকে বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন আমাকে বলেছিলেন, হে মেয়ে! জিবরাইল আ. প্রতি বছর একবার করে আমার সাথে কুরআন দাওর তথা পুনরাবৃত্তি করেন;কিন্তু এবছর তিনি আমার সাথে দুইবার কুরআন দাওর করেছেন,তাই আমার মনে হচ্ছে আমার অন্তিম মুহূর্ত সন্নিকটে। ফাতেমা রা. বলেন, একথা শুনে আমি কেঁদে দেই।এরপর তিনি আমাকে বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি জান্নাতি নারীদের সম্রাজ্ঞী হবে? ফাতেমা রা. বলেন, একথা শুনে আমি হেসে দেই। এটাই আমার সুসংবাদ ও হাসির কারণ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রা.-এর প্রতি অনেক বেশি লক্ষ রাখতেন, এমনকি আলি রা.-এর সাথে বিয়ের পরও তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন। একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক যুদ্ধ বন্দি নিয়ে আসা হল। আলি রা. তখন ফাতেমা রা. কে বললেন, একা একা বাড়ির সকল কাজ করতে কি

Contents

তোমার ক্লান্তি লাগে না? বিয়ের পর থেকে বাড়ির সকল কাজ তিনি একাই করতেন এবং এতে তাঁর অনেক কষ্ট হতো, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। আগেকার মেয়েরা বর্তমানের মেয়েদের মত এত আরাম-আয়েশে থাকত না। তাদের কূপ থেকে পানি আনতে হত, চাক্কি ঘুরিয়ে আটা পিষতে হত, উট-ঘোড়ার খাবার দিতে হত, এছাড়াও বাড়ির সকল কাজ নিজেদেরই করতে হত। এখনকার মত তাদের সামনে প্রস্তুতকৃত আটা আসতো না, কাপড় ধোয়ার জন্যে ওয়াশিন মেশিন ছিলো না, কল ঘুরালেই পানিবেরুতো না। বরং তারা অনেক পরিশ্রম করতেন, দূর থেকে পানি আনতেন, আটা পিষতেন, ঘোড়াকে খাবার খাওয়াতেন ইত্যাদি কঠিন ও কষ্টকর কাজগুলো তখন মেয়েরাই করতেন।

আলি রা. ফাতেমা রা.কে বললেন, ফাতেমা! বাড়ির এত কাজ করতে কি তোমার কষ্ট হয়? আটা পিষতে, ঘোড়ার খাবার দিতে, পানি আনতে, ঝাড়ু দিতে কি তোমার একার পক্ষে কষ্ট হয়ে যায়? ফাতেমা রা. বললেন, হাঁ আমার কষ্ট হয়।

বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় হওয়ার আগ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর অভাব-অনটনের মধ্যেই দিন কাটতো। তাঁদের খুব বেশি সম্পদ ছিলো না। তারা সামান্য যা কিছু জামা করতেন জিহাদ ও যুদ্ধের সফরের জন্যে তা খরচ করতেন। এমনকি আলি রা. ও স্ত্রী ফাতেমা রা. একদিন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। আলি রা. তখন এক ইহুদির ক্ষেতে গেলেন এবং তাকে বললেন, আমি তোমার ক্ষেতে কাজ করতে চাই। সে বললো, কূপ থেকে পানি উঠাও। কূপের পাশে একটি হাউজ ছিলো, আলি রা. কূপ থেকে পানি উঠিয়ে হাউজে রাখতেন। তিনি তার সাথে প্রতি বালতি পানির বিনিময়ে একটি করে খেজুরের চুক্তি করলেন। ভাই! একবার চিন্তা কর, এক মুঠো খাবারের জন্যে তাদের কত কষ্ট করতে হয়েছে, বালতি নিয়ে গভীর কূপ থেকে পানি উঠিয়ে হাউজে রাখা। বিশেষ করে একজন ক্ষুধার্ত মানুষের জন্যে কতটা কষ্টের!! তা সত্ত্বেও তিনি পানি উঠিয়ে হাউজে রাখলেন। বারটি খেজুর নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং পরিবারকে বললেন, এই নাও তোমাদের খাবার।

আলি রা. ফাতেমা রা.কে বললেন, তোমার কি একজন খাদেমের প্রয়োজন? ফাতেমা রা. বললেন, হাঁ। আলি রা. বললেন, তোমার বাবার কাছে আজ

একজন বন্দি এসেছে, সুতরাং তুমি তাঁর কাছে গিয়ে একজন খাদেম চাও। তখন ফাতেমা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন; কিন্তু তখন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তাই তিনি আয়েশা রা.-এর নিকট গেলেন। কথার এক ফাঁকে আয়েশা রা. তাঁকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, বাড়ির সকল কাজ একা করতে আমার কষ্ট হয়, আমি এতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাই আমার একজন খাদেম প্রয়োজন। আয়েশা রা.-এর মন ছিলো স্বচ্ছ-পরিষ্কার, তাতে ছিলোনা কোনো হিংসা বা বিদ্বেষের লেশ। তিনি ফাতেমা রা.কে ভালবাসতেন, ফাতেমা রা.ও তাঁকে মুহাব্বত করতেন। কিছুক্ষণ পর ফাতেমা রা. চলে গেলেন। অতঃপর রাতের শেষ প্রহরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে ফিরলেন আয়েশা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ফাতেমা রা. এসেছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেনো এসেছিল? আয়েশা রা.-এর অন্তর ছিলো স্বচ্ছ, তাঁর অন্তরে কোনো ধরনের হিংসা ছিলো না, তিনি বিদ্বেষবশত এই সংবাদ লুকিয়ে রাখেননি বা বলেননি যে, আমিও তো বাড়ির কাজ করি, আমিও তো ক্লান্ত হই, আমারও একজন খাদেম প্রয়োজন। না তিনি এমনটি বলেননি বরং তিনি ফাতেমা রা.-এর জন্যে সুপারিশ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ফাতেমা রা. বাড়ির সকল কাজ একা করে, বাড়ির কাজ করতে গিয়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাঁর কষ্ট হয়, তাঁর একজন খাদেম প্রয়োজন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই ফাতেমা রা.-এর বাড়িতে আসলেন এবং দরজায় আঘাত করে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি কীভাবে ঘরে প্রবেশ করলেন? তিনি কি এসে নিজে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেন? তিনি কি ফাতেমা রা.কে খাদেম দিয়েছিলেন?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রা.-এর বাড়িতে এসে দরজায় আঘাত করে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ভিতরে ফাতেমা রা.-এর সাথে আলিও রা. ছিলেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি সামান্য অপেক্ষা করুন,

Contents

আমরা ঘরটা একটু গুছিয়ে নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; বরং তোমরা তোমাদের আপন অবস্থাতেই থাক, কারণ ভিতরে যারা আছেন তাঁদের একজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে আর অন্যজন মেয়ের জামাই, তাঁর চাচাত ভাই, তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, ছোটকাল থেকেই যাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানদের মতই ছিলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খাদিজা রা. নিজ বাড়িতে তাঁকে লালন-পালন করে বড় করেছেন।তিনি তো তাঁর ছেলের মতই। তাই তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের আপন অবস্থাতেই থাক।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রা.-এর পাশে বসলেন এবং তাঁকে বললেন, তুমি কি আমার কাছে গিয়েছিলে? ফাতেমা রা. বললেন, হাঁ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেনো গিয়েছিলে? তিনি বললেন, আমার একজন খাদেম প্রয়োজন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে খাদেমের চেয়ে উত্তম কিছুর সন্ধান দিবো না? তিনি বললেন, হাঁ অবশ্যই দিবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে তখন তেত্রিশবার তাসবিহ তথা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। তেত্রিশবার হামদ তথা 'আলহামদুলিল্লাহ, বলবে এবং চৌত্রিশবার তাকবির তথা 'আল্লাহু আকবার' বলবে। তিনি বলেন, এটা তোমাদের জন্যে একজন খাদেম থেকেও উত্তম। তখন আলি রা. ও ফাতেমা রা. চোখে-চোখে তাকালেন, অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাহলে খাদেম? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবললেন, খাদেমকে আমি আসহাবে সুফফার জন্যে দিয়েছি, ক্ষুধায় যাদের পেট আর পিঠ একাকার হয়ে আছে।

আসহাবে সুফফা হল ঐসকল দরিদ্র সাহাবি যাঁরা ইসলামগ্রহণ করে নিজ পরিবার-পরিজন ছেড়ে চলে এসেছে; তাঁদের নিকট আর ফিরে যেতে পারেনি,কারণপরিবারের লোকেরা ছিলো কাফের এবং তাঁদেরকে আবারও কুফরির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁদের উপর চালাতো চরম নির্যাতন। অন্যদিকে মদিনাতেও এমন কোনো স্থান ছিলো না যেখানে তাঁরা

Contents

থাকবে। মুসলিমরা তখন ছিলো অনেক দরিদ্র অবস্থায়। তাই তাঁরা মসজিদে থাকতেন এবং কাঠ কেটে বিক্রি করতেন অথবা এ ধরনের সাধারণ কাজ করে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করতেন। রাসুলুল্লাহ তাঁদের জন্যে একটি সুফফা অথবা ছাতা বা শামিয়ানা টানিয়ে দিয়েছিলেন; তাঁরা যার নিচে থাকত। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এই খাদেমদেরকে আসহাবে সুফফার জন্যে বিক্রি করবো এবং এর মূল্য আসহাবে সুফফাকে দিবো। আলি রা. বলেন, আমি এই কথা জীবনে আর কখনই ভুলিনি।

ফাতেমা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক প্রিয় ছিলেন। আর একারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর রা.ও তাঁকে অত্যন্ত মুহব্বত করতেন, কারণ তিনি তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আবু বকর রা. নিজ সন্তানদের চেয়েও ফাতেমা রা.কে বেশি ভালবাসতেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

নিশ্চয় নবি-রাসুলগণ মিরাস হিসেবে কোনো সম্পদ রেখে যান না আমরা যে সম্পদ রেখে যাই তা সদকা।

নবি-রাসুলগণ যেনো সাধারণ মানুষের মত দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে পড়ে এবং সম্পদ জমানোর মত মানবীয় গুণ যেনো তাঁদের মধ্যে প্রবেশ না করে তাই আল্লাহ তাআলা তাঁদের জন্যে শরয়ি বিধান হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা যে সম্পদ রেখে যাবে তা মুসলমানদের জন্যেসদকা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কোনো সম্পদ রেখে যাননি এবং তাঁর পূর্বের কোনো নবি-রাসুলও মিরাস হিসেবে কোনো সম্পদ রেখে যাননি। এমনকি দাউদ আ. যিনি ছিলেন বাদশাহ, তিনিও সুলাইমান আ.-এর জন্যে মিরাস হিসেবে কোনো সম্পদ রেখে যাননি, তিনি তাঁর জন্যে মিরাস হিসেবে নবুওত রেখে গেছেন। অনুরূপভাবে যাকারিয়া আ.ও কোনো সম্পদ মিরাস হিসেবে রেখে যাননি, ইরশাদ হয়েছে :

وَ اِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآءِیْ وَ کَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ

وَلِیًّا ۙ یَّرِثُنِیْ وَ یَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ ۖ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ۝

'আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে আর আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজ-পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। সে ইয়াকুব বংশের আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। হে আমার পালনকর্তা! তাঁকে সন্তোষজনক করুন।'[১]

যাকারিয়া আ. ধনী ছিলেন না, তাঁর নিকট অনেক সম্পদ ছিলো না। তা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি একজন পুত্রসন্তান চাই, যে আমার ওয়ারিস হবে। তাঁর যেহেতু সম্পদ ছিলো না, তাহলে তিনি কিসের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে যেতে চান? তিনি ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হিসেবে নবুওয়ত রেখে যেতে চান, কারণ আম্বিয়া আ. যে সম্পদ রেখে যান তা সদকা। আর তাঁরা পরবর্তীদের জন্যে ইলম ও নবুওয়ত মিরাস হিসেবে রেখে যান।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবু বকর রা. ফাতেমা রা.-এর নিকট এসে বললেন, হে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে! আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় তোমার সাথে সুসম্পর্ক রাখাকে আমি নিজ সন্তানদের সাথে সম্পর্ক রাখার চেয়েও বেশি প্রিয় মনে করি। নিশ্চয় তুমি আমার কাছে আমার সন্তানদের চেয়েও বেশি প্রিয়। তুমি আমার সম্পদ থেকে যা খুশি নিয়ে নাও। তুমি কি আমার বাড়ি নিতে চাও, তাহলে নিয়ে নাও। আমার যদি উট, ভেরা বা অন্য কোনো সম্পদ থাকে তাহলে তুমি তা নিতে চাইলে নিয়ে নাও। তুমি আমার সম্পদ থেকে যা খুশি নিয়ে নাও। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারা এবং তোমাকে সম্পদ দিতে পারাকে আমি আমার সন্তানদের সম্পদ দেওয়ার চেয়েও বেশি প্রিয় মনে করি; কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভূমি সদকা হিসেবে রেখে গেছেন। আমি এখন খলিফা, মুসলমানদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়েছে। আল্লাহর শপথ, এই সম্পদ আমি আমার নিজের জন্যে নিচ্ছি না বরং এটা মুসলমানদের বাইতুল মালেসদকা হিসেবে থাকবে। অতঃপর ফাতেমা রা. খুশিমনে তা দিয়ে দিলেন। কেনোই-বা তিনি খুশি হয়ে তা দিবেন না? তিনি যে রাসুল-কন্যা জান্নাতি নারীদের সরদার।

---

১. সুরা মার্‌ইয়াম, আয়াত : ৫-৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের ছয় মাস পর ফাতেমা রা.-এর ইন্তেকাল হয়। তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে অসুস্থতার সময় আবু বকর ও ওমর রা. তাঁকে দেখতে ও অবস্থার খোঁজখবর নিতে আসেন। আলি রা. তাঁদের আগমনের কথা তাঁকে বললেন এবং তাঁদেরকে আসার অনুমতি দিতে বললে তিনি তাদের আসার অনুমতি দেন। আবু বকর ও ওমর রা. ঘরে প্রবেশ করেন এবং ফাতেমা রা.-এর পাশে বসেন, ফাতেমা রা. তখন পূর্ণ পর্দার সাথে ঘরে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর তাঁরা ফাতেমা রা.-এর জন্যে দোয়া করেন এবং ফাতেমা রা.ও তাঁদের জন্যে দোয়া করেন। তাঁরা সেখান থেকে চলে আসেন। ফাতেমা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরদীক্ষায় বড় হয়েছেন। তিনি ছিলেন স্বচ্ছ হৃদয় ও নিরাপদ অন্তরের অধিকারিণী। তিনি সর্বদা মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করতেন। কোনো সাহাবির প্রতি তাঁর মনে বিন্দু পরিমাণও হিংসা বা বিদ্বেষ ছিলো না।

বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর উম্মাহাতুল মুমিনিনের সাথে ফাতেমা রা.-এর সম্পর্ক ছিলো খুব সুন্দর ও নির্মল। আয়েশা রা.-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো খুবই প্রশংসনীয়। হাফসা, সাওদা যাইনাব রা.সহ উম্মুল মুমিনিনের সকলের সাথেই তাঁর সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত সুন্দর ও চমৎকার। তিনি উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রা.-এর কন্যা ফাতেমা রা., যাঁকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লালন-পালন করে বড় করেছেন। এরপর আঠার বছর বয়সে আলি রা.-এর সাথে বিয়ে হয়ে আলি রা.-এর দায়িত্বে চলে যান। তিনি হাসান ও হুসাইন রা.-এর মা। তিনি তাঁদেরকে পূর্ণ কল্যাণের উপর বড় করেছেন। এমনকি তিনি তো হাসান ও হুসাইন রা.কে সঙ্গে নিয়ে বেশিরভাগ সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কাটাতেন। ফাতেমা রা. বর্ণনা করেন কীভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রা.-এর সাথে খেলা করতেন, তাদের আদর করতেন। ফাতেমা রা. যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উঠে এসে ফাতেমা রা.কে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং তাঁকে নিজের ডান অথবা বাম পাশে বসাতেন। আর একারণেই ফাতেমা রা. তাঁর সাথে ও তাঁর সন্তানদের সাথে রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটার বিভিন্ন হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি খুবই আগ্রহ নিয়ে আনন্দচিত্তে এই হাদিসগুলো বর্ণনা করতেন।

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেনো ফাতেমা রা.-এর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং জান্নাতে তাঁর মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে দেন, এবং উম্মাহাতুল মুমিনিনসহ সকল সাহাবিদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং জান্নাতে তাঁদের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে দেন এবং আমাদেরকেও তাঁদের সাথে জান্নাতে যাওয়ার তাওফিক দান করেন। আমিন।

এক গুপ্তচরের গল্প

অন্যের গোপন বিষয় তালাশ করা বা গুপ্তচরবৃত্তি করা অনেক পুরনো রীতি। এক্ষেত্রে আরব-অনারব মুসলিম-অমুসলিম সকলেই সমান। বিভিন্ন জন বিভিন্ন অশ্চর্যজনক পন্থা অবলম্বন করে অন্যের বিষয়ে গোপ্তচরবৃত্তি করে বা অন্যের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। কখনো কখনো এই গোপ্তচরবৃত্তিটা হয়ে থাকে অন্যের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে, কখনো শুধুমাত্র মজা বা ঠাট্টা করার জন্যে, অন্যে কী করে তা জানার জন্যে। আবার কখনো কখনো গুপ্তচরবৃত্তি হয়ে থাকে অন্যের ক্ষতি করার জন্যে। এখন আমরা খলিফা মু'তাদিদের এক গুপ্তচরের কাহিনী বলবো। এই ঘটনা বলার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্যহল এটা জানানো যে, মানুষ কখনো কখনো অন্যের বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করে– শুধুমাত্র মজা করার জন্যে। অথচ কোনো কারণ ছাড়া অন্যের বিষয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করা জায়েয নেই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো ব্যাপারে গুপ্তচরবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন। কুরআনে এবিষয়ে সতর্কবাণী এসেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

'তোমরা কারো ব্যাপারে গুপ্তচরবৃত্তি করবে না এবং কারো গোপন বিষয় জানতেও চাবে না।'

কারো অনুমতি ব্যতীত তার গোপন বিষয় জানতে চাওয়া হারাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'যে ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত কারো লেখা চিঠি দেখে তার জন্যে এমন এমন শাস্তি রয়েছে।'

অথবা হাদিসে এভাবে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'অনুমতি ব্যতীত অন্যের লেখা চিঠি দেখা তোমাদের কারো জন্যে জায়েয নেই।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

'তোমরা করো ব্যাপারে গুপ্তচরবৃত্তি করবে না এবং কারো গোপন বিষয়ে জানতেও চাবে না।'

খলিফা মুতাদিদের কাসেম বিন আবদুল্লাহ নামক খুবই আস্থাভাজন একজন মন্ত্রী ছিল। সে দরাবারের প্রতিটি কাজ খুবই বিশ্বস্ততার সাথে করতো, খলিফা এতে তাঁর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিল, খলিফা তাঁর বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিষয়েও এই উজিরের সাথে কথা বলতো। প্রতিটি মুনুষেরই ব্যক্তিগত কিছু বিষয় থাকে যা সে অন্য কাউকে জানাতে চায় না। সে তাঁর পরিবারের সাথে একান্তে অনেক সময় কাটায়, তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করে। এই বিষয়গুলো সে বাহিরের কাউকেই জানাতে চায় না। মন্ত্রী কাসেমও নিজ পরিবারের সাথে একান্তে অনেক সময় কাটাতেন, তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন, যা সে খলিফাকে জানাতেন না। এবং এটা জানানো তাঁর দায়িত্বের মধ্যেও ছিলো না।

একদিন সকালে কাসেম যখন খলিফার দরবারে উপস্থিত হয়েছে, খলিফা তখন তাঁকে ডেকে বলে, কাসেম! গতকাল তুমি অমুক অমুকের সাথে বাড়িতে খেলা করেছো, তখন আমাকে ডাকো নি কেনো?

একথা শুনে মন্ত্রী কাসেম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, খলিফা কীভাবে আমার ব্যক্তিগত বিষয় জানলেন? এটাতো একান্ত আমার পারিবারিক বিষয়। এটা তো খলিফার জানার কথা নয়। এসকল বিষয় ভেবে তার মন অনেক খারাপ হয়ে গেল; কিন্তু তিনি খলিফার সামনে মুচকি হেসে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

অতঃপর বিষয়টি নিয়ে তাঁর একান্ত সচিবের সাথে পরামর্শ করলেন। সচিব তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করলো যে, সে বিষয়টি দেখবে।

পরদিন ভোরে এই সচিব কাসেম ইবনে আবদুল্লাহর প্রাসাদের সামনে এসে অবস্থান করল। সে এতটাই ভোরে এসেছে যে, তখনও কাসেম বাড়ি থেকে বের হয়নি। সে বাড়ির সামনে এসে প্রহরীদের প্রতি লক্ষ করতে শুরু করল। সে বলেছে, আমি প্রহরীদের প্রতি লক্ষ করছিলাম, এমন সময় এক পঙ্গু ভিক্ষুক সেখানে উপস্থিত। আমি লক্ষ করলাম প্রহরীরা সকলে তাকে চিনে এবং সেও তাদের সাথে কথা বলছে ও হাসি-ঠাট্টা করছে। কথাবার্তার এক পর্যায়ে পঙ্গু লোকটি বললো, তোমরা কেমন আছ? তোমাদের মনিব কাসেম কেমন আছে? সে গতকাল কখন বাড়িতে ফিরেছে? এভাবে খুব চাতুরতার সাথে কাসেম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে নিচ্ছে; কিন্তু তারা কেউ বুঝতেই পারছে না। তখন প্রহরীরা তাকে বললো, আমরা ভাল আছি, আমাদের মনিব কাসেমও ভাল আছেন, সে গতকাল অমুক সময় বাড়িতে ফিরেছেন। অন্যান্য দিনের চেয়ে সে কালকে একটু দেরিতেই ফিরেছেন, ফিরার সময় তাঁর সাথে অমুক লোক ছিল। এরপর ভিক্ষুকটি ভিক্ষার ভান করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ির আরো ভিতরে গেল; কিন্তু কেউ কিছুই মনে করল না, কারণ সে ভিক্ষুক, মানুষের কাছে চাওয়া ও ভিক্ষা করাই তার পেশা। সে বাড়ির ভিতরে গিয়ে কাসেমের প্রাসাদের নিকটবর্তী কর্মচারীদের কাছে গেলএবং পূর্বের ন্যায় এখানেও তাদের সাথে খুব কৌশলে কথা চালিয়ে গেল; সে তাদেরকে বললো, তোমাদের খবর কী? তোমাদের মনিবের খবর কী? তোমাদের মনিব গতকাল রাতে কার সাথে ছিল? তারা বললো, আমরা ভাল আছি, আমাদের মনিবও ভাল আছেন, সে গতকাল রাতে তাঁর অমুক স্ত্রীর সাথে ছিলেন। তারপর সে বলল, সে কি দেরি করে তাঁর কাছে গিয়েছেন না তারাতারি? অতঃপর হেসে বললো, সে যদি আগেআগেই যেয়ে থাকে তাহলে তো মনে হয় তার এই স্ত্রী অনেক সুন্দরী। সে খুব কৌশলে তাদের কাছ থেকে কাসেম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে নিল, তাদের কাছে হাত পাতার কারণে তারাও তাকে কিছু দান করল। এরপর সে ভিক্ষার ভান করে করে আরো ভিতরে যেতে লাগল এবং পথে ছোট বড় দেখা হওয়া প্রত্যেককের কাছ থেকেই অত্যন্ত দক্ষতা ও সুকৌশলে কাসেম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে নিচ্ছিল। এরপর সে রান্নাঘরে প্রবেশ করল, খোঁড়া ও দরিদ্র হওয়ার কারণে সকলেই তার প্রতি দয়াশীল হল এবং যে যার মত দান-সদকা করল এবং

ভিতরে প্রবেশ করতেও তাকে কেউ বাধা দিল না। সে রান্নাঘর থেকে থলিতে কিছু খাবারও ভরে নিল। এরপর সে বাবুর্চিকে প্রশ্ন করল, তুমি গতকাল রাতে কী রান্না করেছিলে? তোমার মনিব কাসেম কী পরিমাণ খাবার খায়? গতকাল সে কতটুকু খেয়েছে? কথাগুলো বাবুর্চিদের সাথে কথার ফাঁকে ফাঁকে কৌশলে জেনে নিল। এভাবে সে প্রসাদের ছোট-বড় প্রায় প্রতিটি লোকের সাথে কথা বলে সেখান থেকে বের হয়ে আমাদের পিছনের এলাকায় চলে গেল।

সচিব বলে, সেখান থেকে বের হওয়ার পর আমি তাকে অনুসরণ করলাম। আমি দেখলাম সে একটি নির্জন রাস্তায় এসে নিজ আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলল। এখন তাকে দেখে একজন সুন্দর সুঠামদেহী লোক মনে হচ্ছে। আমি এটা দেখে খুবই আশ্চর্য হলাম। এরপর সে তার ভিক্ষার ব্যাগটা নিয়ে কয়েকজন ফকিরকে দিয়ে বললো, নাও এগুলো তোমাদের জন্যে। অতঃপর সে একটি বাড়িতে প্রবেশ করল। আমি বাড়িটি চিহ্নিত করে সেখান থেকে চলে এলাম এবং রাতে আবার সেই বাড়ির কাছে গিয়ে তার উপর নযর রাখছিলাম, এমন সময় দেখলাম খলিফার দরবারের এক কাজের লোক সেই বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তাকে চিনে ফেললাম। সে বাড়িতে এসে দরজায় আঘাত করল আর তখন ভিতর থেকে দরজার নিচ দিয়ে একটা কাগজ বেরিয়ে এলো, সেটি নিয়ে লোকটি চলে গেল। আমি জানি না আসলে কাগজে কী লেখা ছিল। এরপর আমি কয়েকজন প্রহরীকে নিয়ে এসে সেই বাড়িতে প্রবেশ করলাম এবং লোকটিকে ধরে বেঁধে কাসেমের কাছে নিয়ে গেলাম। কাসেম তাকে বলল, সত্য ঘটনা খুলে বল। সে বললো, আমি কিছুই করিনি। আমি একজন অসহায় লোক। তারপর যখন আমি তাকে প্রহার করা শুরু করলাম তখন সে বলল, হাঁ, আমি খলিফা মুতাদিদের গোপ্তচর, সে আপনার সংবাদ সংগ্রহের বিনিময়ে প্রতি মাসে আমাকে এক হাজার দেরহাম বেতন দেন। আমি পঙ্গুর ভান করি এবং আপনার বাড়ির পাশে এই বাড়িটি বাড়া নিয়েছি, যাতে করে কেউ আমাকে চিনতে না পারে এবং বুঝতে না পারে যে, আমি পঙ্গু ও ফকিরের ভান করছি। আমি ফকিরের বেশভূষা ধারণ করি এবং আমার এই দাড়ির উপরে কৃত্তিম দাড়ি লাগাই, অতঃপর আপনার প্রাসাদে প্রবেশ করে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাই

এবং কৌশলে ছোট-বড় সবার কাছ থেকে আপনার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করি। এরপর আমি আমার ভারা করা সেই বাড়িতে গিয়ে সকল তথ্য লিখে রাখি। রাতে খলিফার কাছ থেকে এক লোক এসে সেই কাগজ নিয়ে যায় এবং তা খলিফার নিকট হস্তান্তর করে। এর মাধ্যমে খলিফা মুতাদিদ জানতে পারে যে, আপনি প্রতিদিন কী করেন?

কাসেম লোকটিকে ধারে বন্দি করে রাখল। পরদিন রাতে মুতাদিদের প্রহরী এসে যখন লোকটির দরাজায় আঘাত করল, তার স্ত্রী দরজা খুলে তাকে বললো, গতকাল কয়েকজন লোক এসে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি তাদের চিনিনা, আসলে তারা কারাছিল? এরপর থেকে সে এখনও ফিরে আসেনি। সে এখন কোথায় আছে, কার কাছে আছে আমি জানি না। এর পরের রাত্রেও তার স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে বললো, আমার স্বামী এখনও ফিরেনি, সে এখন জীবিত না মৃত আমি এর কিছুই জানি না।

এদিকে কাসেম প্রতিদিনের মত খলিফার দরবারে যাওয়া আসা করছে। কয়েক দিন পর খলিফা মুতাদিদ তাঁকে বলল, পঙ্গু লোকটি এখন কোথায়, আছে তার খবর কী? তাকে কী করেছো? কাসেম বলল, আমিরুল মুমিনিন আমি তো তাকে চিনি না। খলিফা বললো, না; তুমি তাকে চিনো। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি যদি তাকে হত্যা করে থাক অথবা তাকে কিছু করে থাক তাহলে আমি কিন্তু তোমার এই এই... করবো। আমি তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি এরপর থেকে তোমার ব্যক্তিগত বিষয় জানার চেষ্টা করবো না। এখন বলো, তুমি তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছো? তারাতারি তাকে বের করেদাও। কাসেম বলল, আমি তার সাথে ভাল ব্যবহার করেছি এবং হাদিয়া দিয়ে তাকে আমার কাছ থেকে মুক্ত করে দিচ্ছি।

আমি যখন ইবনুল জাওযিরহ.-এর লিখিত 'আল মুনতাজিম ফি আখবারিল মুলুক ওয়াল উমাম' নামক কিতাবে এই ঘটনা পড়লাম, তখন এটা ভেবে আমি অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিতহলাম যে, একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের গুপ্তচরবৃত্তি কাজটা সকল যুগে, সকল দেশে,সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান ছিলো এবং আছে। তুমি কখনো কখনো লক্ষ করে দেখবে যে, একজনকে বিশ্বাস করে তার কাছে তোমার গোপন

বিষয়টা শেয়ার করছো, আর কিছু দিন পরেই সে তোমার গোপন বিষয়টি অন্যজনের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে। একারণে মানুষের উচিত যত বিশ্বস্তই হোক না কেনো কাউকে তার গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত না করা, কারণ মানুষের হৃদয় তো নিজের গোপন বিষয় লুকিয়ে রাখার ক্ষেত্রেই অনেক সংকীর্ণ। তাহলে অন্যের বিষয় সে কীভাবে ধারণ করবে? তখন তো সে আরো সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় বিষয় হল, কোনো কল্যাণ নিহিত না থাকলে কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে অনুসন্ধান বা গোপ্তচরবৃত্তি করা জায়েয নেই। উদাহরণস্বরূপ, যেমন কারো ব্যাপারে নেশা করার সন্দেহ হল, আমরা তার ব্যাপারে গোপনে অনুসন্ধান করবো, তারপর বিষয়টা সত্য প্রমণিত হলে এর জন্যে তার ব্যাপরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

অনুরূপভাবে যদি করো ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, সে অসৎ নারীর কাছে যাওয়া-আসা কারে, তাহলে আমরা তার ব্যাপারে গোপনে অনুসন্ধান করবো, তারপর বিষয়টা সত্য প্রমণিত হলে এর জন্যে তার ব্যাপরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। তবে এই কাজটা সবাই করবে না বরং পুলিশ বা গোয়েন্দা সংস্থার কেউ করবে অথবা এর দায়িত্বে থাকা অন কেউ এই কাজটি করবে। তবে কোনো কারণ ছাড়া অযথা শুধু শুধু মানুষের একান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করা বা গুপ্তচরবৃত্তি করা জায়েয নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতে নিষেধ করেছেন; বরং তিনি তো অন্যের ঘরে অনুমতি ব্যতীত উঁকি দিলে তার চোখ উপরে ফেলারও অনুমতি দিয়েছেন।

অনুমতি ব্যতীত করো ঘরের দরজা বা জানালার ফাঁকদিয়ে কেউ তাকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চোখ উপড়ে ফেলার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কেউ এমনটি করলে তার কোনো হদ বা দিয়াত নেই। এটা তো জানা কথাই যে, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কারো চোখ উপড়ে ফেলে, তাহলে এর হদ হিসেবে তার চোখও তুলে ফেলা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

‘চোখের বিনিময় চোখ উপড়ে ফেলা হবে।’[১]

---

১. সুরা মায়িদা: ৪৩

অর্থাৎ কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের চোখ তুলে ফেলে তাহলে তার চোখও অনুরূপভাবে তুলে ফেলতে হবে। আর যদি কেউ ইচ্ছাকৃত নয় বরং ভুলে কারো চোখ তুলে তাহলে তাকে অর্ধেক দিয়াত-রক্তপণ দিতে হবে। আর এটা মানুষের যে অঙ্গগুলো জোড়ায় জোড়ায় আছে এর একটা যদি কেউ ভুলে নষ্ট করে যেমন কেউ ভুলে কারো হাত কেটে ফেললো বা কারো পা কেটে ফেললো তাহলে তাকেঅর্ধেক দিয়াত দিতে হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হরিণের শিং দিয়ে মাথা চুলকাচ্ছিলেন। এমন সময় এক লোক ঘরের ফাঁকা দিয়ে ভিতরের লোকদের দুষ্টমি দেখছিল। এটা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক রাগান্বিত হলেন। লোকটি যদি চলে না যেতো তাহলে তিনি তার চোখ উপড়ে দিতেন। তিনি বলেন, এটা বৈধ। এটা করলে কারো দিয়াত-রক্তপণ দিতে হবে না। এর মাধ্যমে তিনি কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে অনুসন্ধানের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। মানুষ যখন অন্যের গোপন বিষয়ে অনুসন্ধান করলো তখন সে নিজেও ধ্বংস হল, অন্যকেও ধ্বংস করল। আর একারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

'মানুষের মিথ্যারগুনাহ করার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে।'

এবং তিনি আরো বলেন :

'মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল অনর্থক কাজ ছেড়ে দেওয়া।'

হে ভাই! কারো মাঝে ও তার স্ত্রীর মাঝে সমস্যা থাক বা না থাক তাতে তোমার কী? কে কত বেতন পেল না পেল তা দিয়ে তুমি কী করবে? এক লোক ও তার স্ত্রীর বা তার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সামান্য ঝামেলা থাকতেই পারে, তুমি কেনো অযথা তাদের গোপন খবর তালাশ করতে যাবে? অনর্থক বিষয়ে তুমি কেনো অন্যকে জিজ্ঞেস করতে যাবে? তুমি কেনো অনর্থক বিষয়ের পিছনে ছুটবে?

মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল অনর্থক কাজ ছেড়ে দেওয়া।মন্ত্রীর ব্যক্তিগত বিষয়ের অনুসন্ধান করাটা খলিফা মুতাদিদেরমোটেও ঠিক হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম রা. কারো কোনো বিষয়ে অনর্থক নাক

Contents

গলাতে যেতেন না। তাহলে তোমার কি হল যে, তুমি অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাতে যাবে? যেমনিভাবে মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল কুরআন তেলাওয়াত করা; মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল নফল সালাত আদায় করা; মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার যিকির করা; অনুরূপভাবে মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল অনর্থক কাজ ছেড়ে দেওয়া।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো অনর্থক কাজ করতেন না। তিনি মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতেন না। সাহাবায়ে কেরাম রা.ও কখনো অনর্থক কাজ করেননি। আমরা ইতিহাস পড়ে দেখতে পাই যে, সাহাবায়ে কেরাম রা. অন্যের কোনো বিষয় নিয়ে অযথা মাথা ঘামাতেন না। অনুরূপভাবে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত পড়ে জানতে পারি যে, তিনি কখনো কোনো সাহাবির দোষ তালাশ করেননি। তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো প্রতি ইহসান-অনুগ্রহ করতে চাইতেন তখন তার বিষয়ে জিজ্ঞাস করতেন। যেমন নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.ও সেই যুদ্ধে তাঁদের সাথে ছিলেন। তাঁরা প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে উটের উপর চড়ে বিশাল উপত্যকা পাড়ি দিচ্ছিলেন।শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট প্রতিদানের আশায় এই ত্বক পোড়া রোদের কষ্ট সহ্য করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর সাথে তাঁদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছিল। মদিনায় পৌছতে অল্প পথ বাকিছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেয়াল করলেন যে, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. সকলের থেকে পিছিয়ে পড়েছে, ফলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে আসলেন এবং তাঁকে বললেন, জাবের! চলো; জাবের রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার উট অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সে হাঁটতে পারছে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উটকে বসাও। তখন তিনি তাঁর উটটিকে বসালেন। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার লাঠিটা আমাকে দাও। জাবের রা. লাঠি দিলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Contents

ওয়াসাল্লাম তখন লাঠি দিয়ে উটের উপর আঘাত করলেন এবং এর জন্যে দোয়া করলেন, তখন উট দাঁড়িয়ে গেল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় পথ চলতে শুরু করল।

অতঃপর জাবের রা. তাঁর উটের উপর চড়লেন, এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজ উটের উপর উঠলেন। অতঃপর তিনি জাবের রা.-এর সাথে সাথে চলতে লাগলেন। জাবের রা.-এর বয়স তখন ছিলো একুশ বছর। তিনি জাবের রা.কে জিজ্ঞেস করলেন, জাবের! বিয়ে করেছো? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবের রা.কে অনর্থক এমন প্রশ্ন করেননি। যেরকম আমরা একে অপরকে করে থাকি, ভাই কেমন আছেন? দিন কাল তো মনে হয় ভালই কাটছে? শুনলাম, স্ত্রীর সাথে ঝামেলা হয়েছে? কারণ কী? এধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন। আরে ভাই এমন প্রশ্ন করার তোমার প্রয়োজন কী। তুমি কেনো তার বিষয়ে জানতে চাইবে? তুমি কি মেয়ের বাবা না তার বড় ভাই? না-কি তুমি ছেলের বাবা? তুমি কি সমাজের মতব্বর যে, এবিষয়ে মীমাংসা করবে? এমন অযথা প্রশ্ন ছেড়ে দাও। আবার কেউ কেউ এসে তোমাকে প্রশ্ন করবে, কী ভাই! শুনলাম অমুককে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছো, সত্য না-কি? এগুলো অনর্থক প্রশ্ন, কী দরকার আছে অন্যের বিষয়ে এধরনের প্রশ্ন করার। মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা। যেমন সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা ইসলামের সৌন্দর্য, তেমনিভাবে অনর্থক বিষয়ে জড়িত না হওয়াও ইসলামের সৌন্দর্য; কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবের রা.কে অযথা প্রশ্ন করেননি; বরং তিনি তার প্রতি ইহসান করতে চেয়েছেন। যেমন তুমি কোনো দরিদ্র লোককে সাহায্যের উদ্দেশ্যে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তুমি তাকে বল, তোমার অবস্থা কী? বাড়ি ভাড়া কত? তুমিতাকে সাহায্য করার জন্যে এধরনের প্রশ্ন করো। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেও বুঝতে পারে যে, তুমি তাকে সাহায্য করার জন্যে এধরনের প্রশ্ন করছো।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবের রা.কে বলেন, হে জাবের! তুমি কি বিবাহ করেছ? জাবের রা. বলেন, জি ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি বিবাহ করেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হলেন এবং বললেন, কুমারী না-কি বিবাহিতা নারী বিয়ে করেছ? সে

বলল, বিবাহিতা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুমারি মেয়ে কেনো বিয়ে করলে না? তাহলে তুমি তার সাথে সোহাগ করতে পারতে আর সেও তোমার সাথে আনন্দ করতে পারতো। তখন জাবের রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার বাবা যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন, আর তিনি আমার দায়িত্বে সাতজন বোন রেখে গেছেন। আমি বাড়িতে তাঁদের মতই আরেকজন মেয়ে আনতে চায়নি ।যেনো বাড়িতে আমার বোনদের সাথে তার ঝগড়া-বিবাদ লেগে না যায়। তাই আমি একজন বয়স্কা মহিলা বিয়ে করেছি, যাতে সে বাড়িতে তাঁদের সাথে মায়ের মত হয়ে থাকতে পারে।

হে ভাই! বোনদের প্রতি এমন মায়ার কি কোনো দৃষ্টান্ত হতে পারে যে, নিজের আনন্দ-ফুর্তিকে, নিজের চাহিদাকে বোনদের জন্যে কুরবানি করে দিয়েছে। একথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তিনি জাবের রা.কে আর্থিক সাহায্য করতে চাইলেন। তাই তিনি তাঁকে বললেন, জাবের! তুমি কি তোমার উটটা আমার কাছে বিক্রি করবে? একথা বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবের রা.-এর উটটির দিকে তাকালেন, যা ছিলো খুবই দুর্বল এবং কিছু পূর্বেও বসে পড়েছিলো. এখন তা সবল হয়ে উদ্যমতার সাথে হাঁটা শুরু করলো। হঠাৎ একথ শুনে জাবের রা. কী করবেন বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!যে উটটি কিছুকাল পূর্বেও অসুস্থ ছিলো এবং এখন সুস্থ হয়ে উদ্যমতার সাথে চলছে, আপনি কি সেটার কথা বলছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ; তুমি আমার কাছে তা বিক্রি করো। জাবের রা. বললেন, আপনি এটা নিয়ে নিন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না বরং তুমি আমার কাছে তা বিক্রি করো। জাবের রা. বলেন, হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কত টাকা দিয়ে ক্রয় করবেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক দেরহাম। জাবের রা. বললেন, কম হয়ে যায়। একটি উট মাত্র এক দেরহাম? অনেক কম হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুই দেরহাম। জাবের রা. বললেন, কম হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Contents

ওয়াসাল্লাম বললেন, তিন দেরহাম। তিনি বললেন, কম হয়ে যায়। এভাবে রাসুলুল্লাহ বাড়াতে বাড়াতে চল্লিশ দেরহম ও সাথে এক উকিয়া স্বর্ণমুদ্রা পর্যন্ত বললেন। জাবের রা. তখন বললেন, ঠিক আছে তবে একটা শর্ত আছে আর তাহল, আমি মদিনা পর্যন্ত এর উপর আরোহণ করে যাব।

মদিনায় পৌছে জাবের রা. বাড়িতে গিয়ে পরিবারের নিকট মালপত্র নামিয়ে রেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলো এবং তাঁর নিকট উট হস্তান্তর করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বেলাল রা.কে বললেন, বেলাল! উটটি নিয়ে বেঁধে রাখো এবং জাবেরকে চল্লিশ দেরহামের সাথে কিছু বেশি দিয়ে দাও। বেলাল রা. তাঁকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরদেওয়া পরিমাণ মাল দিয়ে দিলেন। জাবের রা. উটের মূল্য গ্রহণ করে ভাবতে লাগলেন, আমি এই টাকা দিয়ে কী করবো। আমি এর মাধ্যমে অন্য একটি উট ক্রয় করব না-কি এর মাধ্যমে আমার বোনদের বিয়ের ব্যবস্থা করবো? অথবা পরিবারের লোকদের জন্যে খাবার ক্রয় করবো? অর্থাৎ আমি তো এই উটের উপর সফর করতাম, এর মাধ্যমে পানি আনতাম, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বহন করতাম; কিন্তু এখন এর মূল্য দিয়ে আমি কী করবো? এটা ভাবতে ভাবতে জাবের রা. নিজ গৃহের দিকে ফিরে যাচ্ছেন, তখন রাসুলুল্লাহ সা বেলাল রা.কে বললেন, বেলাল! যাও জাবেরকে উটটিও দিয়ে দাও এবং তাঁকে বল, উট এবং উটের মূল্য উভয়টিই তাঁর জন্যে। বেলাল রা. জাবের রা.-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে বললেন, জাবের! তোমার উট নিয়ে নাও। জাবের রা. বললেন কেনো? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এটা নিবেন না? তখন তিনি বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উট এবং উটের মূল্য উভয়টিই তোমার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আচরণ দেখে জাবের রা. অত্যন্ত খুশি হলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবের রা.কে সাহায্য করার জন্যে তাঁর গোপন বিষয় জানতে চেয়েছেন।'*তোমরা কারো ব্যাপারে*

গোপ্তচরবৃত্তি করবে না এবং কারো গোপন বিষয়ে জানতেও চাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে একথা বলে, আবার নিজেই তার খেলাফ করেননি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের গোপন বিষয়ের হেফাযত করুন এবং আমাদেরকে অন্যের গোপন বিষয় সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল অনিষ্টতা থেকে হেফাযত করুন। আমিন।

যুলুম করো না

বিভিন্ন ঘটনা আর দুর্ঘটনার মধ্য দিয়েই পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে চলেছে; কিন্তু পৃথিবীতে যারা ক্ষমতাবান, যাদের অধীনে অন্যরা চলে, তাদের থেকে আমরা এমন অনেক বিষয় বা সিদ্ধান্ত দেখতে পাই। আসলে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারবো না যে, এই সিদ্ধান্তের পিছনে তাদের মূল কারণ বা উদ্দেশ্য কী ছিল? এসকল সিদ্ধান্ত বা দুর্ঘটনার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা হল, বারমাকি গোত্রের দুর্যোগের ঘটনা। যদিও আমরা এখানে বারমাকি গোত্রের দুর্যোগের পূর্ণ ঘটনা আলোচনা করবো না, কারণ এবিষয়ের আলোচনা অনেক দীর্ঘ। যদি খলিফা হারুনুর রশিদকে প্রশ্ন করা হয়, (বারমাকি গোত্রের সাথে হারুনুর রশিদের অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইয়াহইয়া আল-বারমাকি ছিলেন হারুনুর রশিদের দুধ বাবা। হারুনুর রশিদের নিকট তাঁর অনেক মর্যাদা ছিল। তিনি ছিলেন অনেক বৃদ্ধ। তা সত্ত্বেও হারুনুর রশিদ তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত জেলে আটকে রেখেছে। বারমাকি গোত্রের দুর্যোগের ঘটনাটা একটা ইতিহাসের এক রহস্যজনক ঘটনা।) আপনি কেনো বারমাকি গোত্রের সাথে এমন করলেন? আপনি একদিন সকালে হঠাৎ করে তাদের কতককে হত্যার আদেশ দিলেন আর কতককে জেলে বন্দির আদেশ দিলেন, এবং তাদের সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলেন? এমন প্রশ্ন হারুনুর রশিদকে করলে হয়তো সে বলবে, আল্লাহর শপথ করে বলছি আমার এই হাতও যদি এর কারণ জানতো তাহলেও আমি তা কেটে ফেলতাম।

পূর্বেই বলেছি ইয়াহইয়া আল-বারমাকি হারুনুর রশিদের দুধ পিতা ছিল, তা সত্ত্বেও তাঁকে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। হারুনুর রশিদবারমাকি

বংশের অনেককে হত্যা করেছে এবং অনেককে জেলে বন্দি করে রেখেছে। ইয়াহইয়া আল-বারমাকি ছিলো অনেক বৃদ্ধ; তার বয়স ছিলো আশির উর্ধ্বে। তাঁর সাথে নিজ ছেলে খালেদকেও বন্দি করা হয়েছিল। তাঁদের সাথে জেলে অনেক কঠিন ব্যবহার করা হয়েছিল। তখন ছিলো শীতকাল; প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছিল, বয়সের কারণে বৃদ্ধ ইয়াহইয়ার অনেক কষ্ট হচ্ছিল; কিন্তু জেলার তাঁদেরকে আরো বেশি কষ্ট দেওয়ার জন্যে জেলের ভিতর থেকে সব ধরনের কাঠ সরিয়ে নিয়ে ছিলো, যাতে করে তাঁরা জেলের ভিতর আগুন জ্বালিয়ে শীত কমাতে বা ঠান্ডা পানি গরম করতে না পারে।

খালেদের বৃদ্ধ পিতার ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করতে অনেক কষ্ট হত। বিশেষ করে সকালে ফজরের সময়। এদিকে জেল কতৃপক্ষও সকল কাঠ-খড়ি সরিয়ে নিয়েছে। তাই ইয়াহইয়া যখন ঘুমিয়ে যেতো, খালেদ তখন পানির পাত্র নিয়ে জানালায় রাখা কামরা আলোকিত কারার বাতির নিভুনিভু আলোতে সারা রাত দাঁড়িয়ে থেকে পানি যে সামান্য গরম হতো, সকালে ফজরের আজানের সময় পিতার ঘুম ভাঙ্গলে সেই পানি দিয়ে ওযু করাতো– যাতে ঠান্ডা পানি দিয়ে ওযু করতে পিতার কষ্ট না হয়। অতঃপর জেল কতৃপক্ষ যখন এই পদ্ধতি জানতে পারলো, তখন তাঁদের আরো কষ্ট দেওয়ার জন্যে বাতি জানালা থেকে আরো দূরে সরিয়ে রাখত– যাতে সারা রাত দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট করেও পানি সামান্য গরম করতে না পারে। এরপর পিতা ইয়াহইয়া আল-বারমাকি যখন ঘুমিয়ে যেতেন, খালেদ তখন পিতার মুহাব্বত ও ভালবাসার কারণে পানির পাত্র পেট ও রানের মধ্যে রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে ফজর পর্যন্ত বসে থাকত, অতঃপর ফজরের আজান হলে পিতার খেদমতে সেই পানি পেশ করতো।

ইয়াহইয়া ও তার পুত্র খালেদের উপর শুধুমাত্র এই বিপদই নেমে আসেনি; বরং তারা তাঁদের সকল সম্পদওহারিয়েছিল। বর্ণিত আছে, একবার ইয়াহইয়ার নিকট ইবনুল মুসল্লি আসলো। ইবনুল মুসল্লি ছিলো খলিফার এক কর্মকর্তা। সে ইয়াহইয়ার নিকট এসে বলল, খলিফা আমাকে বলেছে আমি যদি তাকে দশ মিলিয়ন দেরহাম না দেই তাহলে

তিনি আমাকে হত্যা করবে। (ইবনুল মুসল্লির বিরুদ্ধে দশ মিলিয়ন দেরহাম চুরির অভিযোগ আনা হয়েছিল।) তাই সে ইয়াহইয়ার নিকট এসে কান্নাকাটি শুরু করল। ইয়াহইয়া তখন তার গোলামকে বললো, দেখো কোষাগারে কত দেরহাম জমা আছে। সে বললো, পাঁচ মিলিয়ন দেরহাম আছে। সে তাকে বললো, এগুলো তাকে দিয়ে দাও। তারপর ছেলে খালেদের নিকট লোক পাঠিয়ে বললো, আমি শুনেছি তুমি একটা বাগান কিনতে যাচ্ছ, তো তোমার কাছে কত দেরহাম আছে? সে বললো, দুই মিলিয়ন। তিনি বললেন, এটা তাকে দিয়ে দাও। অতঃপর ছেলে ফযলের নিকট লোক পাঠিয়ে বললো, তুমি আমাকে এক মিলিয়ন দাও, এরপর মেয়েকে বললো, তোমার যে অলঙ্কারগুলো আছে সেগুলো দাও। এভাবে সে দশ মিলিয়ন দেরহাম জমা করে ইবনে মুসল্লিকে দিল।

ইবনে মুসল্লি এই সম্পদ নিয়ে যখন বেরুলো তখন সে তার সাথীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি মনে কর যে, সে আমার প্রতি ইহসান করে আমাকে এই সম্পদ দিয়েছে? না; বরং সে আমার ভয়ে আমাকে এই সম্পদ দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ! সে তোমাকে কেনো ভয় করবে? আচ্ছা বুঝলাম সে তোমাকে ভয় করতো; কিন্তু সে যদি তোমাকে এই সম্পদ না দিত তাহলে তুমি কি খলিফার হাত থেকে বাঁচতে পারতে? আর তুমিই-বা এই সম্পদের জন্যে ইয়াহইয়ার পায়ে পড়তে গেলে কেনো? অতঃপর ইবনে মুসল্লি যখন খলিফার নিকট এই সম্পদ দিয়ে নিজেকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল তখন তার সেই সাথী যে ইয়াহইয়ার থেকে সম্পদ নেওয়ার সময় তার সাথে ছিলো, সে ইয়াহইয়ার নিকট গিয়ে বলল, ইবনে মুসল্লি বলেছে, আপনারা না-কি তার ভয়ে তাকে এই সম্পদ দিয়েছেন? অর্থাৎ এটা স্পষ্ট নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা। ইয়াহইয়া তখন বলল, হয়তো সে না বুঝে কথাটা বলেছে। সে তখন হতাশ ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল; সে কীভাবে নিজেকে মৃত্যু থেকে বাঁচাবে সে চিন্তাতেইব্যস্ত ছিল।

ইয়াহইয়া আল-বারমাকি একজন সম্পদশালী ও সম্মানিত লোক ছিলেন; কিন্তু জেলে তাঁর এই করুণ অবস্থা দেখে, একদিন ছেলে খালেদ তাঁকে বলল, বাবা! এত কিছুর পরও আমরা কীভাবে ধৈর্যধারণ করবো। আমাদের কোনো কিছু কি আর বাকি আছে যার কারণে আমরা ধৈর্য ধারণ

Contents

করবো? কেনো আমাদের এই অবস্থা হল?কী কারণে আমাদের এখানে আনা হল? ইয়াহইয়া তখন ছেলেকে বলল, হে আমার ছেলে! শুনো! আমরা যখন গাফেল হয়ে রাতে ঘুমাই, মাযলুমের দোয়া তখন রাতের অন্ধকারে আসমানের দিকে উঠে যায়। আর আল্লাহ তাআলা তো ঘুমান না, তিনি কখনো তা থেকে গাফেল থাকেন না।

বর্ণিত আছে যে, জেলের ভিতর ইয়াহইয়া আল-বারমাকির যখন মৃত্যুর সময় হল, তখন সে একটি কাগজ আনতে বললো, এবং তাতে কিছু কথা লিখে তা পকেটে রেখে দিয়ে বলল, আমার যখন মৃত্যু হবে তখন এই কাগজটা খলিফা হারুনুর রশিদের নিকট পৌছে দিবে। তাঁর মৃত্যুর পর জামা-কাপড় খুলে পকেট থেকে কাগজটা বের করে খলিফার নিকট পৌছে দেওয়া হল। খলিফা কাগজটা খুলে পড়লো। তাতে লেখা ছিল, *'দুই প্রতিপক্ষের একজন বিচারালয়ের দিকে চলে গেছে আর অপরজন তার পরে আসছে। তারা দুইজন এমন এক বিচারালয়ে উপস্থিত হবে, যার বিচারক হবেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আর সাক্ষী হবেন ফেরেস্তারা'*। এবং তাতে আরো লেখাছিল, *হে হারুনুর রশিদ! তুমি আমার প্রতি যুলুম করেছো, আমাকে বন্দি করে রেখেছো, আমার প্রতি ও আমার সন্তানদের প্রতি অবিচার করেছো; কিন্তু মনে রেখো, আমি এবং তুমি একদিন আল্লাহর সামনে অবশ্যই দাঁড়াবো'*।

নিশ্চয় যুলুমের পরিণতি অত্যন্ত ভায়াবহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআয ইবনে জাবাল রা.কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাঁকে যুলুম থেকে বেঁচে থাকার ওসিয়ত করেছেন। মুওয়ায রা. বলেন, আমি আমার উটের উপর ছিলাম আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হাঁটছিলেন তখন তিনি আমাকে বলেন, হে মুওয়ায! এই সাক্ষাতের পর হয়তো আমার সাথে তোমার আর সাক্ষাৎ হবে না। একথা বলার পর তিনি তাঁকে একটা ওসিয়ত করেন।কী ছিলো সেই ওসিয়ত?

মুওয়ায রা. হলেন একজন বিখ্যাত আলেম সাহাবি। তিনি উম্মতের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচে' বড় আলেম ছিলেন। তিনি ছিলেন হিফযুল কুরআন ও ইলমের পর্বত-চূড়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Contents

ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়ামানে মুআল্লিম হিসেবে প্রেরণ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, হে মুওয়ায! এটাই তোমার সাথে আমার মদিনায় শেষ হাঁটা। এই সাক্ষাতের পর হয়তো আমার সাথে তোমার আর সাক্ষাৎ হবে না। এরপর হয়তো তুমি আমার মসজিদ ও আমার কবরের পাশ দিয়ে হাঁটবে। সত্যিই মুওয়ায রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতে আর মদিনায় আসেননি। এরপর তিনি তাঁকে কয়েকটি ওসিয়ত করেন, তার একটা হল, হে মুওয়ায! তুমি মযলুমদের বদ দোয়া থেকে সাবধান থাকবে, কারণ মযলুমদের দোয়া আর আল্লাহ তাআলার মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।

জ্ঞানীগণ বলেন, এমন লোকদের বদ দোয়া থেকে সাবধান থাকবে, তুমি ঘুমিয়ে গেলেও যারা না ঘুমিয়ে তোমার বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করে।

কত মানুষ যেঅন্যের প্রতি অন্যায় কারার কারণে দুনিয়াতেএর শাস্তি ভোগ করে, তার কোনো হিসেব কি আমাদের কাছে আছে? মযলুম ব্যক্তি রাতের আঁধারে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট যালেমের বিরুদ্ধে দোয়া করে– ফলে মৃত্যুর পূর্বেই দুনিয়াতে তার আরেক মর্মন্তুদ মৃত্যু ঘটে যায়। সহিহ হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

‘দুই ব্যক্তির শাস্তি দুনিয়াতেই ত্বরান্বিত হয়, ১. যালেম; ২. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান।’

যালেমের শাস্তি দুনিয়াতেই বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। যেমন হয়তো সে আত্মিকভাবে অশান্তিতে ভোগে; কখনো ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তার অংশীদাররা তাকে ঠকায়; কখনো কখনো তোমার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে; তোমার সন্তানদের সাথে তোমার সমস্যা সৃষ্টি হবে; তুমি সড়ক দুর্ঘটনায় পড়বে;তোমার স্ত্রীর সাথে সমস্যা সৃষ্টি হবে; তুমি শারীরিক অনেক সমস্যায় পতিত হবে; কোনো কারণ ছাড়াই একদিন তোমার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শুরু হবে; একদিন সর্দি লাগবে; একদিন জ্বর হবে; একদিন রক্তচাপ বেড়ে যাবে কিন্তু তুমি এর কোনো কারণ খুঁজে পাবে না। হয়তো অন্ধকার রাতে কোনো মযলুমের দোয়ার কারণে তুমি এই বিপদের

Contents

সম্মুখিন হয়েছো। আর তুমি এর থেকে গাফেল-অসতর্ক ছিলে; কিন্তু তোমার এবং তাঁর রব আল্লাহ কখনই গাফেল নন।

আবু যার রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

'আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার বান্দারা! আমি যুলুমকে আমার নিজের উপর হারাম করেছি, এবং একে তোমাদের মাঝেও হারাম হিসেবেই রেখেছি, সুতরাং তোমরা যুলুম করো না।'

অর্থাৎ মালিকঅধীন শ্রমিকদের প্রতি যুলুম করবে না। স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যুলুম করবে না। ভাই তার বোনদের ও ছোট ভাইদের প্রতি যুলুম করবে না। শিক্ষক ছাত্রদেরকে অন্যায়ভাবে প্রহার করবে না। ইমাম মসজিদ ও মুসল্লিদের প্রতি জুলুম করবে না। বিচারক তার কাছে আসা বিচার প্রার্থীদের প্রতি যুলুম করবে না। নেতা অধীন লোকদের প্রতি জুলুম করবে না। রাজা প্রজাদের প্রতি যুলুম করবে না; এক কথায় কেউই অন্যের প্রতি যুলুম করবে না, কারণ*আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে আমার বান্দারা! আমি যুলুমকে আমার নিজের উপর হারাম করেছি, এবং একে তোমাদের মাঝেও হারাম হিসেবেই রেখেছি, সুতরাং তোমরা যুলুম করো না।* তুমি কারো গিবত করে তার প্রতি যুলুম করো না, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে তার প্রতি যুলুম করো না। কারো বেতন আটকে দিয়ে তার প্রতি যুলুম করো না, গাড়িওয়ালার ভাড়া আটকে দিয়ে তার প্রতি জুলুম করো না। করো বদনাম করে তার প্রতি যুলুম করো না। অর্থাৎ কোনোভাবেই কারো প্রতি যুলুম করো না।

অফিসের কোনো কর্মচারীযদি চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অন্যত্র যেতে চায়, তখন অফিসের প্রধান তাকে বলে, তুমি আমাদের এখানেই থেকে যাও; কিন্তু লোকটি বলে, না আমি বরং অন্য কোথাও যাওয়াকে ভাল মনে করছি, সুতরাং আপনি আমাকে এখান থেকে একটি অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট দিন। তখন তার বস বলে, না আমরা তোমাকে কোনো সার্টিফিকেট দেবো না, তুমি যাও; এখান থেকে তোমাকে কোনো সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না।

আরে ভাই এটা তো আমার হক, তোমাদের সাথে আমার চুক্তি শেষ হয়ে গেছে। আমি অন্য জায়গায় যেতে চাচ্ছি। আমি তোমাদের সাথে

Contents

নতুন চুক্তি করতে বাধ্য নই। আমি তোমাদের সাথে থাকা অবস্থায় তোমাদের সাথে কোনো ধরনের খেয়ানত করিনি, আমি তোমাদের সাথে কোনোধরনের যুলুম করিনি। তোমরা আমাকে আমার অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট দিবে, এটা তোমাদের নিকট আমার প্রাপ্য-হক। তখন অফিসের বস বলে, যাও যাও আমাদের কাছে কোনো সার্টিফিকেট নেই, আমরা তোমাকে কোনো সার্টিফিকেট দিবো না। এটা সম্পূর্ণ যুলুম, এটা প্রকাশ্য অন্যায়।

যারা কোনো হাসপাতালে, অফিস বা সরকারি কোনো দফতরে চাকরি করে, তাদের কাছে যখন কেউ সেবা গ্রহণ করতে আসে তখন অযথা তাদের হয়রানি করা হারাম; এটা যুলুম। কেউ কেউ শুধু মাত্র একটি সাইনের প্রয়োজনে কোনো অফিসে আসে; কিন্তু অফিসার তাকে বলে, অপেক্ষা করুন। তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখে, কখনো শুধু মাত্র একটি সাইনের জন্যে কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহ এমনকি কয়েক মাস পর্যন্ত বসিয়ে রাখে। তাকে বার বার ঘুরিয়ে পেরেশানিতে ফেলে। এটা অন্যায়, এটা যুলুম। আপনি কেনো তাকে বসিয়ে রাখবেন? আপনি কেনো তাকে কষ্ট দিবেন? একটি সাইন দিতে কি এক ঘণ্টা লাগে? এক সাইন দিতে কি মাস, সপ্তাহ বা দিন লাগে? আপনি কেনো অযথা ত সময় নষ্ট করছেন? তাকে পেরেশানিতে ফেলে কষ্ট দিচ্ছেন? এটা হারাম এটা যুলুম-অন্যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

'কেউ যদি তার কোনো ভাইয়ের প্রতি যুলুম করে থাকে, তাহলে সে যেনো ঐদিন আসার পূর্বেই তার সমাধান করে নেয়, যে দিন দিনার ও দিরহাম কোনো কাজে আসবে না।' (পরকালে)

সহিহ হাদিসে এসেছে, ইন্তেকালের পূর্বে অসুস্থতার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে এসে মিম্বারে দাঁড়ান এবং সাহাবায়ে কেরাম রা.কে উদ্দেশ্য করে খুৎবা দেন, তখন মসজিদ ছিল সাহাবায়ে কেরামে পরিপূর্ণ, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে একদৃষ্টিতে এমনভাবে তাকিয়ে আছেন, যেনো নিজ কলিজা ও আত্মার দিকেই তাকিয়ে আছেন, কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিকট নিজ সত্তার চেয়েও প্রিয় ও মূল্যবান ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উদ্দেশ্য করে

বলেন, হে মানুষ! তোমাদের মধ্য থেকে আমার প্রতিনিধিদের সময় নিকটবর্তী (অর্থাৎ আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী।)সুতরাং আমি যদি তোমাদের কারো পিঠে আঘাত করে থাকি, তাহলে এই তো আমার পিঠ, সে যেনো আমার থেকে এর কিসাস চুকিয়ে নিয়ে নেয়। আমি যার কাছ থেকে সম্পদ নিয়েছি, এই তো আমার সম্পদ, সে যেনো এখান থেকে যা খুশি নিয়ে নেয়। আমি যাকে গালি দিয়ে সম্মানে আঘাত করেছি, এই-যে আমার সম্মান, সে যেনো তা শোধ নিয়ে নেয়। অতঃপর তিনি বলেন, কেউ যেনো আমার পক্ষ থেকে শত্রুতার ভয় না করে, কারণ এটা আমার রুচি-প্রকৃতি নয়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন সাহাবায়ে কেরামের চোখ থেকে অজস্র অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের আত্মা কষ্টে জ্বলছে এবং তাঁদের মধ্য থেকে একজনও দাঁড়াচ্ছে না, তখন তিনি বললেন, তাহলে সে যেনো আমাকে ক্ষমা করে দেয়, সে যেনো আমাকে ক্ষমা কেরে দেয়– যাতে আমি আমার রবের সাথে একটি পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে সাক্ষাৎ করতে পারতে পারি। অথবা তিনি বলেছেন, আমি আমার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে পারি যে, আমার উপর কারো কোনো হক বাকি নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রকে সাহায্য করেন, যদিও সেটা কাফের রাষ্ট্র হয়। আর তিনি যালেম রাষ্ট্র ধ্বংস করে দেন, যদিও তা হয় কোনো মুসলিম রাষ্ট্র। হে ভাই! তুমি যুলুমের ভয়াবহতা নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখো। যুলুমের পরিণাম খুবই অশুভ ও ভয়ঙ্কর। সুতরাং আমাদেরকে শুধুমাত্র যুলুম থেকে বেঁচে থাকলেই চলবে না বরং অন্যকে যুলুম থেকে উত্তম পন্থায় বাধা দিতে হবে। যেমন কেউ তার কর্মচারীদের উপর যুলুম করল, কোনো স্ত্রী তার সন্তানদের উপর যুলুম করল বা তার স্বামী সন্তানদের উপর যুলুম করল, (অর্থাৎ তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কারণে বা মৃত্যুবরণ করার কারণে সন্তানরা মা হারা হয়েছে এবং তার তত্ত্বাবধানে এসেছে।) কোনো ভাই তার ভাই বা বোনদের প্রতি যুলম করল, কোনো বোন তার ভাই বা বোনদের প্রতি যুলুম করল, অথবা কোনো মেয়ে তার মায়ের প্রতি যুলুম করল বা কোনো সন্তান তার বৃদ্ধ বাবা-মায়ের প্রতি যুলুম করল, অথবা কোনো প্রতিবেশী তার অপর প্রতিবেশীর প্রতি যুলুম

Contents

করল, তাহলে আমাদের উচিত হল আমরা সাধ্যমত উত্তম পন্থায় তাকে সেই যুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবো।

আল্লাহ তাআলার নিকট এই প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেনো আমাদের সকলকে যা কিছু শুনলাম এর উপর আমল কারার তাওফিক দান করেন। এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেনো তিনি যেনো আমাদেরকে কল্যাণের সাথে রাখেন। আমিন।

অনিষ্টের কারণ হয়ো না

আ'শা বিন কায়েস ছিলেন ইয়ামামার নজদ এলাকার সবচেয়ে প্রবীণ লোক। সে সময় নজদ থেকে মদিনায় গম, ভুট্টা ও এজাতীয়খাদ্যদ্রব্য রপ্তানি হত। সেখানকার লোকেরা ব্যবসায়ী ছিল। এ কারণে লোকেরা তাদের প্রতি কিছুটামুখাপেক্ষী ছিল। তারা মক্কায়ও খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি করত। মক্কা তো ইসলামের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আরবদের কাছে হজ্জের মৌসুমে পণ্যসামগ্রী আদান-প্রদানের উৎস বলে গণ্য হত। আ'শা বিন কায়েস ছিলো নিজ জাতির অন্যতম সরদার। সে ছিলো একজন অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত কবি। তার কবিতা সর্বত্র আলোচিত হত।

যখন তার বয়স বেড়ে নব্বই ছাড়িয়ে গেল তখন সে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনতে পেল। সে জানতে পারল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে পথপ্রদর্শক হয়ে এক ঐশী কুরআন নিয়ে আগমন করেছেন।তারা তখন মূর্তি ও অন্যান্য বস্তুর উপাসনায় লিপ্ত ছিল। সে নিজ জাতির দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখতে পেল, তারা মূর্তির কাছে আসা-যাওয়া করে, মূর্তির চতুর্পাশে প্রদক্ষিণ করে, মূর্তিকে স্পর্শ করে, মূর্তিকে সেজদা করে এবং মূর্তির সামনে পশু উৎসর্গ করে। তারা পাথরের পূজা-আর্চনা করে, যা তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারে না– তখন সে মনে মনে ইসলাম নিয়ে ভাবল। এরপর সে এই বৃদ্ধ বয়সে উটের পিটে বসে রাসুলের শানে এ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে মদিনার পথে রওয়ানা হল-

'তোমার চক্ষু অন্ধকার রাতে বুজে থাকেনি। তবে তুমি অসুস্থ ব্যক্তির মত রাতযাপন করেছো।'

Contents

'হে প্রার্থী! তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছো? কারণ মদিনা ভূমিতে ৩তোমার একটা প্রতিশ্রুত সময় রয়েছে।'

এভাবে দীর্ঘ এক কবিতা আবৃত্তি করলেন। মদিনায় পৌঁছার আগেই রাসুলের শানে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকল; কিন্তু পথিমধ্যে কোরাইশ কাফেরদের একটি দলের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটলো। তারা বলল, আপনি কে? সে বলল, আমি আ'শা বিন কায়েস। তারা বলল, আশ্চর্য! আপনি কি ইয়ামামার সরদার আ'শা বিন কায়েস?

জাহেলি যুগে উকায ও যুলমাজাযের মত আরবদের কিছু বড় বড় বাজার ছিল যেখানে তারা সকলে সমবেত হত। সেখানে কেউ কেউ মানুষের সামনে নিজের কবিতা আবৃত্তি করত। সেখানে আবার কবিতা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত। বলা হত, কে আছো, হাসসানের কবিতা আবৃত্তি করবে। কে আছো, আ'শা বিন কায়েসের কবিতা আবৃত্তি করবে? এভাবে বিখ্যাত কবিদের কবিতা-আবৃত্তির আসর জমতো।

তারা বললো, আপনিই আ'শা বিন কায়েস? বলল, হ্যাঁ। কোথায় যেতে ইচ্ছা করেছেন? আমি মদিনায় যাচ্ছি, নবির সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামে দীক্ষিত হবো। তারা এবার তাঁর দিকে ভাল করে তাকাল। এবং বলল, হে আ'শা! তাহলে আপনার ধর্ম, আপনার বাপ-দাদার ধর্মের কী হবে? তাদের এ কথোপকথন মরুভূমিতে উটের পিঠেই চলছিল। তাঁর সাথে ছিলো তাঁর পরিবার-পরিজন ও নিজ কওমের কিছু লোক। কোরাইশ কাফেররা চাচ্ছিল না যে, আ'শা মদিনায় পৌঁছে ইসলাম কবুল করুক। আর সে চাচ্ছিল মদিনায় পৌঁছে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরসাক্ষাৎ লাভ করবে। কোরাইশ কাফেরদের আশঙ্কার কারণ হল, যদি আ'শা ইসলাম কবুল করে, তবে তো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝুলিতে আরো একজন শক্তিশালী কবি যুক্ত হবে– যা হবে মহাবিপদের কারণ। আর সে হাসসানের সাথে মিলে অন্য কবিদের প্রতিহত করবে।

আর পূর্বে কবিতার অনেক প্রভাব ছিল।এ কারণেই তো, ওমর রা.-এর আমলে যখন যাবরকান ইবনে বদর নামক আমির মদিনায় আসল তখন সে ওমর রা.-এর কাছে নালিশ করল। হে ওমর! এই জারির কবি আমার

Contents

নিন্দা জ্ঞাপন করে কবিতা বানিয়েছে। কবিতায় আমাকে মন্দ বলেছে। তখন ওমর রা. বললেন, সে তোমার ব্যাপারে কী বলেছে? সে বলল,

অর্থাৎ 'তুমি নিজেকে কষ্ট দিয়ো না, এখানে তোমার দেখভাল, খানাপিনা করানোর লোক আছে।'

ওমর রা. বললেন, আমি মনে করি সে তোমার প্রশংসা-ই করেছে। তখন সে বলল, আপনি হাসসানকে জিজ্ঞাসা করুন, সে কবিতা সম্পর্কে ভালো জানে। ওমর রা. বললেন, হাসসান! এব্যাপারে আপনি কী বলেন? সে কি তার নিন্দা করেছে? হাসসান রা. বললেন, নিন্দা করেনি বটে; কিন্তু তাকে আবর্জনাযুক্ত করেছে। তখন ওমর রা. জারিরকে শাসন করেছিলেন। বলা হয়, ঐ আমিরকে তিনি কিছু হাদিয়া দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন, মুসলমানদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমি তোমার কাছ থেকে কিনে নিব। আলেমগণ আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন– জনৈক কবি শহরের আমিরের কুৎসা গেয়ে একটি কবিতা বানিয়েছিল। এতে আমির চটে গিয়ে তাকে শাস্তির নির্দেশ দিয়েছিল। তার সারা শরীরে মানুষের মল মাখিয়ে শহরের অলি-গলিতে ঘোরানো হয়েছিল। তাকে যখন ছেড়ে দেওয়া হল, তখন সে বাড়িতে গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হল। এরপর আরেকটি কবিতা আবৃত্তি করল,

'তুমি আমার সাথে যা করলে তা পানিতে ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে যাবে; কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমার এ কবিতা ক্ষয়ে যাওয়া অস্থিতেও অবশিষ্ট থাকবে।'

তাতে সে বলেছে, তুমি এখন আমাকে ময়লা মাখিয়ে শহরের অলি-গলিতে ঘুরিয়েছো, আর শিশু ও অন্যরা পিছন থেকে আমাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করেছে। আমি তাদের কাছে একধরনের অপমান অনুভব করছিলাম, কারণ সব জায়গায় লোকেরা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এটা সত্য যে তুমি আমাকে অপমান করেছো; কিন্তু এ অপমান কিছুদিন পর শেষ হয়ে যাবে। তুমি যা করেছ, পানি তা ধুয়ে ফেলবে; কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমার এ কবিতা মহাকাল পর্যন্ত বাকি থাকবে। তোমার সম্পর্কে আমার কবিতা আবৃত্তি হতে থাকবে– যখন তুমি থাকবে আঁধার কবরে। তোমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে লোকজন বলবে, এটা অমুকের কবর, যার সম্পর্কে কবি এমন এমন কথা বলেছেন।

Contents

এ কবিতার প্রভাব বর্তমানেও রয়েছে। কত কবিতা যে, কবিকে হত্যা করেছে?কত কবিতা যে, কবিকে অমর করেছে?কত কবিতা যে, কবিকে পদচ্যুত করেছে?কত কবিতা যে, জাতির রক্ত ঝড়িয়েছে আর মস্তক বিদীর্ণ করেছে এবংএর কারণে কত নারী যে, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে?! এখনো আরবদের কাছে কবিতাই ডায়েরি ও নথিপত্র হিসাবে গণ্য হয়।

যাই হোক, কোরাইশ কাফেররা আ'শা বিন কায়েসকে দেখে বলল, এই আ'শা বিন কায়েস যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে ইসলাম কবুল করে তবে তাঁর কাছে শক্তিশালী দু'জন হয়ে যাবে; তাই তার ইসলাম কবুলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো। তারা তার কাছে অগ্রসর হয়ে বলল, হে আ'শা! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ব্যভিচার হারাম করে। যখন ইসলাম কবুল করবে তখন আর ব্যভিচারের সুযোগ পাবে না। তুমি এখন যা ইচ্ছা তা করতে পার। লাত-উযযা তোমাকে এ-কাজ করতে নিষেধ করছে না; কিন্তু তুমি ইসলাম কবুল করলে যখন-তখন ব্যভিচার করতে পারবে না। আ'শা বলল, আমি অতিশয় বৃদ্ধ, আমার ব্যভিচারের কোনো ইচ্ছে নেই। আমার সামনে থেকে চলে যাও। সে অগ্রসর হতে চাইল; কিন্তু তারা তার কাছ থেকে সরল না। তারা বললো, দেখো আ'শা! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু মদ নিষিদ্ধ করে। ইসলামে দাখেল হলে তোমার জন্যে মদের বৈধতা থাকবে না। বরং তুমি মদ পান করলে তোমার উপর দণ্ডবিধি কার্যকর করা হবে। আ'শা বলল, আমি অতিশয় বৃদ্ধ, আর মদ বিবেক-বুদ্ধিকে খেয়ে ফেলে। যে তা পান করে সে লাঞ্ছিতও অপমানিত হয়। আর এখন আমার মদের প্রতি কোনো আসক্তি নেই।

অবশ্য সেই জাহেলি যুগেও কিছু লোক ছিলো যারা মদ পান করত না। সেসময়ে এক কোরাইশ লোককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো– যে মূর্তি পূজা করত এবং কন্যাশিশুকে জীবন্ত দাফন করত, তুমি মদ পান করো না কেনো? সে বলেছিল,'আমি দেখেছি, যে ব্যক্তি মদ পান করে সে আপন মায়ের উপর অপবাদ আরোপ করে। এবং আপন বোনের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।' সে বলতো, মানুষ কীভাবে নিজেই নিজের বিবেক-

বুদ্ধিকে নষ্ট করতে পারে? অর্থাৎ এখন পর্যন্ত আমার মস্তিস্ক ঠিকঠাক আছে। আর মদ সে বিবেক নষ্ট করে দেয়।

একারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেন,

'যে দুনিয়াতে মদ পান করবে সে পরকালে (জান্নতে) মদপান থেকে বঞ্চিত থাকবে।'

তিনি আরো বলেন,

'যে মদপানে অভ্যস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহর সাথে সে মূর্তিপূজারীর ন্যায় সাক্ষাৎ করবে।'

একারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদকে সকল পাপের মা বলেছেন। আর ওলামায়ে কেরামও মদকে সকল পাপের মা বলেছেন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বড় বড় গোনাহের ক[illegible] আলোচনা করতেন তখন বলতেন,' আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে [illegible] গোনাহের কথা বলব না, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গোনা[illegible] কথা বলব না, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গোনাহের কথা বল[illegible] না?' সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল! তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, যাদু করা এবং শিরক করা। এবং তিনি মদ পানের কথাটিও উল্লেখ করতেন।আর মদ একারণেই বড় গোনাহ যে, মদ মানুষের আকলকে নষ্ট করে দেয়। তার দীন-ধর্মকেও নষ্ট করে দেয়। এবং কখনো কখনো তাব্যক্তিকে অনেক অন্যায়-অপকর্মের দিকে নিয়ে যায়। কখনো তাকে নিয়ে মানুষ ঠাট্টা-উপাহাস আবার কখনো সে পাগলের প্রলাপ করে; ফলে মানুষ তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করে। এসবকিছুই ঘটে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে।

যখন সেই জাহেলি যুগেও কিছু কিছু মানুষ কুফর-শিরক করেও মদ থেকে দূরে থাকত; তখন কীভাবে সে একজন মুসলিম হয়ে মদ পান করতে পারে? একারণে আল্লাহ তাআলা মদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

Contents

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক তীর– এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'

আল্লাহ তাআলা এখানে মদের আলোচনা মূর্তির আলোচনার সাথেই উল্লেখ করেছেন। যে মদ পান করে সে সফল হতে পারে না।

তো, তারা তাঁকে বলল, হে আ'শা! দেখ, তুমি যদি ইসলাম কবুল করো তবে তোমার জন্যে মদ হারাম হয়ে যাবে। সে বলল, আল্লাহর শপথ! আমার এ বয়সে মদপানের কোনো ইচ্ছে নেই; সেটা তো মানুষের বিবেককে নষ্ট করে আর ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করে। আর আমি এমনিতেও মদ পান করি না; তোমরা আমাকে ছাড়ো। এ বলে রওয়ানা হতে চাইল; কিন্তু তারা তাঁর পথ আগলে ধরে বলল, হে আ'শা! জি, বলেন; এবার তারা তার সামনে সর্বশেষ টোপটি ফেলল– যার থেকে আ'শা বাঁচতে পারেনি। সর্বশেষ টোপ; যার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'বনি আদম এক দিকে বৃদ্ধ হয় আর অপর দিকে তার হৃদয় দুটি জিনিসের ভালবাসায় নবযুবক হয়।'

সে জিনিস দুটি হচ্ছে– যার কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বনি আদম এক দিকে বৃদ্ধ হতে থাকে আর অপর দিকে তার হৃদয় দুটি জিনিসের ভালবাসায় যুবক হয়ে যায়। এক. দুনিয়ার ভালবাসা; দুই. দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা।'অথবা বলেছেন,' সম্পদের ভালবাসা আর দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা।'

দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে দীর্ঘ জীবন লাভের আশা করা। আর এটা কেউ তোমাকে দিতে পারবে না। আর সম্পদ, এটা মানুষ তোমাকে দিতে পারবে। তারা বলল, হে আ'শা! তুমি তোমার নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে যাও। নিজের ধর্ম ও রীতি-নীতির উপর স্থির থাক। আমরা তোমাকে একশ' উট উপঢৌকন দিচ্ছি। এ কথা শুনে আ'শার মনে একটা ধাক্কা খেলো। সে

Contents

কল্পনার জগতে হারিয়ে গেল এবং দেখতে পেল, একশ' উট তার সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করছে। আর পূর্ব থেকেই তাদের কাছে উটের একটা বিশেষ মূল্য ছিল। বর্তমানের অবস্থার মত নয়। মানুষ তো তখন সফর, কূপ থেকে পানি উত্তোলন, চাষাবাদ ও মহর আদায়সহ বিভিন্ন কাজে এই উটকে ব্যবহার করত।তাদের কেউ স্ত্রীকে মহর দিতে চাইলে এই উট দিয়ে মহর আদায় করত; একটি, দুইটি, দশটি বা একশটি যার যেমন সামর্থ্য হতো। কেউ সফর করতে চাইলে উটের ব্যবস্থা করত; কেউ জমি চাষাবাদ করতে চাইলে উটের দারস্থ হত; কূপ থেকে পানি উত্তোলন করতে এই উটকেই ব্যবহার করত– উটের পিঠে কাঠ বা বাঁশ বেঁধে দিত, অতঃপর তার সাথে রশি বেঁধে রশির অপর প্রান্তে বালতি বেঁধে দিত, উট একবার সামনে, আরেকবার পিছনে যেতো;এভাবেই তারা তা দিয়ে পানি উঠাতো। তারা রক্তপাতের রক্তপণ বা অন্য যে কোনো জরিমানা আদায়ে এই উটই প্রদান করত। উট যবাই করে মেহমানদের মেহমানদারি করত। উটের এই বহুবিধ উপকারের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

'তারা কি উটের দিকে তাকায় না, তাকে কেমন (উপকারী) করে সৃষ্টি করা হয়েছে?'[১]

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

'তিনি চতুষ্পদ জন্তুকে সৃষ্টি করেছেন; এতে তোমাদের জন্যেরয়েছে শীত-বস্ত্রের উপকরণ। আর এতে রয়েছে বহুবিদ উপকার এবং এর কিছু তোমরা আহার করে থাকো।'[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো যুদ্ধাভিযানে যেতে চাইলে সাহাবায়ে কেরামকে উট অনুদান করতে বলতেন। যেমন

---

১. সুরা গাশিয়া: ১৭
২. সুরা নাহল: ৫

Contents

উসমান রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক অভিযানের অভাবী বাহিনীকে প্রস্তুত করতে চাইলো তখন লোকদের বললেন, তোমরা দান করো। তখন উসমান রা. দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আসবাব-পত্রসহ একশত উট দান করলাম। এরপর আরেকজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আসবাব-পত্রসহ একশত উট দান করলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার দান করতে বললেন, উসমান রা. আবার বললেন, সমাগ্র ও বস্ত্রাদিপত্র একশত উট তার দান করলাম। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উসমান আজকে যে আমল করল, এরপর সে কোনো ভুলত্রুটি করলেতাঁর কোনো ক্ষতি হবে না।

মোটকথা তারা আ'শা বিন কায়েসকে এ জাতীয় বস্তুর মাধ্যমে প্ররোচিত করল। আর সে ছিলো অতিশয় বৃদ্ধ; কিন্তু তার সম্পদের প্রতি খুব মহব্বত ছিল। তারা তাকে বলল, আমরা তোমাকে একশত উট দিচ্ছি, তুমি তোমার কওমে ফিরে যাও। সে বলল, একশ' উট, তোমরা কি এখনি আমার সামনে এনে দিবে? হ্যাঁ, এখনি এনে দিব। দাও তাহলে; তখন তারা একশত উট তার সামনে হাযির করল। আর আল্লাহ তাআলা তো সত্যই বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

‘নিঃসন্দেহে কাফের সম্প্রদায় আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে নিজ ধন-সম্পদ ব্যয় করে। বস্তুত এখন তারা আরো ব্যয় করবে। আর তা হবে তাদের জন্যে আক্ষেপ ও হতাশার কারণ। শেষবধি তাদের পরাজয় নিশ্চিত, আর কাফের সম্প্রদায়কে তো জাহান্নামের তাড়িয়ে নেওয়া হবে।’[১]

লোকটি উটগুলো নিয়ে বাড়ির পথে রওয়ানা হল। সে সামনে চলছিলো আর উটগুলো চলছিল তার পিছু পিছু। সে উটগুলো টেনে নিয়ে যাচ্ছিল আর এ কল্পনা করছিলো যে, যখন নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে যাবে তখন এত

---

১. সুরা আনফাল: ৩৬

Contents

সম্পদ দিয়ে সে কী করবে? এক পর্যায়ে যখন সে নিজবসতির কাছাকাছি এলো তখন তার উটনীটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল আর সেও প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সাথে সাথে মারা পড়লো ....সে দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হল,কারণ তার কাছে এখন কোনো উট নেই; .... এবং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হল,কারণ সে ইসলাম কবুল করেনি। .... আর এটাই প্রকাশ্য প্রকৃত ক্ষতি।

এ ঘটনা বলে দিচ্ছে, কিছু মানুষ ভাল হতে চায়; কিন্তুকতক বন্ধু তার ভাল হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিছু মেয়ে পর্দা করতে চায় এবং হারাম সম্পর্ক ছাড়তে চায়।কিছু লোক তাওবা করে মদ্যপান ছাড়তে চায়, নামায শুরু করতে চায়, অন্যান্য গোনাহের কাজ পরিহার করতে চায়। এবং অশ্লীল ও বেহায়াপনার দেশে ভ্রমণ করা থেকে তাওবা করতে চায়; কিন্তু না; তার কিছু বন্ধু-বান্ধব যারা ঐ অন্যায় কাজগুলোকে তার সামনে স্বাভাবিক ও সুন্দর করে পেশ করে। তারা ভালো এবং সত্যের ব্যাপারে তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। তারা তাকে বলে, দেখো! তুমি যদি পর্দা করো তাহলে তোমাকে ভাল দেখাবে না; কলো দেখাবে, তোমাকে আকর্ষণীয় ও চিত্তগ্রাহী মনে হবে না। তোমার বিয়ে হবে না; কুমারী থেকে যাবে। আর যুবককে বলে, দেখো! দাড়ি রাখলে তোমাকে স্মার্ট দেখাবে না; বিদঘুটে দেখাবে; মানুষ হাসবে। ভাই! আপনি দাড়ি ছাড়াই নামায রোযা করুন এবং এজাতীয় আরো নানা কথা বলে তাকে ভালো কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। কখনও সুদ ছেড়ে দিতে চায়, সুদী কারবার থেকে বিরত থাকতে চায়; তখন তারা অভাবের ভয় দেখায়। কোনো যুবতী যখন নিজেকে পাক-পবিত্র রাখতে চায় তখন তারা দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং বলে, তুমি এটা না করলে দুঃখ-কষ্টে পড়বে; অনাহারে কাটাবে; সাবলম্বী হতে পারবে না। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

'আমি তোমাদের পিছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতঃপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের (খারাপ) আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে

দিয়েছিলো। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিলো তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের উপর। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।[১]

তো আল্লাহ তাআলা এখানে বর্ণনা করছেন, তাদের কিছু সাথী-সঙ্গী আছে যারা পথভ্রষ্টতার দিকেঠেলে দেয়। সুতরাং আমরা যেনো এমন সাথী-সঙ্গী থেকে সতর্ক থাকি যারা অন্যায় ও অনিষ্টতার হোতা। যেমন ছিলো আবু জাহেল, উমাইয়া ইবনে খলফ। মুসলিম নিজে অনিষ্টতার কারণ হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে, এবং এ ব্যাপারেও খুব সজাগ থাকবে যে, শয়তান যেনো তাঁকে তার মত শয়তান বানাতে না পারে। ফলে সে একজন মানুষ শয়তানে পরিণত হবে। আর শয়তান যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে তাকে নিয়ে খেলা করবে। যেমন জনৈক কবি বলেছেন,

অর্থ : 'আমি তো ইবলিসের একজন সৈনিক ছিলাম,এরপর সে আমাকে এ অবস্থায় পৌছিয়েছে। ফলে ইবলিস এখন আমার সৈন্য হয়ে গেছে'।

কিছু মানুষের সাথে তো ইবলিস লেনদেন করে। নিজের বিষয়বস্তু তার কাছে শেয়ার করে। সে বলে, আমার কোনো কাজ আসলে আমরা মিলেমিশে তা সমাধা করে নেবো। পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেনো আমাদের সকলকে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট-ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর ইবাদত, আনুগত্য ও হেদায়েতের উপর রাখেন; আমিন।

পণ্ডিত চোর

জগতে এমন কিছু লোক আছেযারা কখনো ভুলে নিপতিত হলে নিজেকে তিরস্কার করে না; উল্টো এ থেকে বাঁচতে সে বিভিন্ন বাহানা খুঁজতে থাকে; এর চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার হল, সে আত্ম-তিরস্কার থেকে বাঁচতে একের পর এক অজুহাত দাঁড়া করতেই থাকে। যেমন কোনো লোক পিতা-মাতার অবাধ্যতা করলেতার মন তাকে যখন বলে, তুমি পিতা-মাতার নাফরমানি করছো কেনো? এটা তো হারাম; এর কারণে

১. সুরা ফুসসিলাত ২৫

তুমি আল্লাহর দরবারে জাবাবদিহিতার মুখোমুখি হবে, তখন সে মনে মনে বলে, আমার বাবা তো আমাকে কোনো সম্পদ দেননি;আমাকে গাড়ি কিনে দেয়নি; অমুক ব্যক্তি নিজ ছেলে-মেয়েকে যেভাবে লালনপালন করে আমার বাবা তো আমাকে সেভাবে প্রতিপালন করেনি। অমুক ব্যক্তি ছেলেকে এটা-সেটা দিয়েছে, আমাকে তো আর দেয় নি– এভাবে সে অবাধ্যতা অব্যাহত রাখতে একের পর এক কারণ খুঁটতে থাকে। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি এতিমের মাল খেয়ে অথবা কোনো কর্মকর্তা কোম্পানির মাল চুরি করে বা কোনো ব্যবসায়ী বিক্রীত পণ্য থেকে কিছু রেখে দিয়ে এ বলে নিজেকে পাপমুক্ত রাখে যে, আমি কোনো নাজায়েযকরি নি; তারা তো আমার পাওনা দিতে বিলম্ব করে; অথবা তাদের সাথে আমার এক হাজার দিনার চুক্তি হয়েছে, তারা নয়শ' পঞ্চাশ দিনার দিয়ে বাকিটা দেয়নি। আর আমার প্রাপ্য পেতে আমি এমনটি করতে বাধ্য হয়েছি– এমন সব ব্যাখ্যা মানুষকে অন্যায়-অপরাধের দিকে আরো বেশি ঠেলে দেয়।

আজ আমরা এক পণ্ডিত চোরের আশ্চর্যজনক ঘটনা শুনব। চোর কীভাবে পণ্ডিতহল? এ এক আশ্চর্য ঘটনা।

এ ঘটনাটি আল্লামা তানুখি রহিমাহুল্লাহ 'আল ফারাজু বাদাশ শিদ্দা' (কষ্টের পরই স্বস্তি) নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এক যুবক, যে তালেবুল ইলম ছিল। সে এক দেশ থেকে আরেক দেশে সফর করতো। আপনারা জানেন যে, পূর্বেকার উলামায়ে কেরামের কাছে আজকের মত টেকনোলজি ছিলো না। বর্তমানে আপনি যখন কোনো ভার্সিটিতে যাবেন তখন দেখতে পাবেন, প্রফেসারের সামনে অনেক ছাত্র বসে আছে, যারা একেক দেশের একেক অঞ্চল থেকে এসেছে। আজকাল তো ইন্টারনেটের সুবাদে আমি এখানে বসে লেকচার দিচ্ছি, আর এ লেকচার হাজার হাজার মানুষ শ্রবণ করছে।এখন কেউ ইলম শিখতে চাইলে ইন্টারনেটের সাহায্যে শিখতে পারে। তার জন্যে এটা এখন সম্ভব এবং সহজও; কিন্তু আগে এটা সম্ভব ছিলো না। ইলম শেখার জন্যে এক শহর থেকে আরেক শহরে সফর করার কষ্ট করতে হত। আবুল আলা আল মুআররি উল্লেখ করেন, আমি একবার আমার কিতাবাদি নিয়ে এক শহর

থেকে আরেক শহরে গেলাম। যখন ঐ দেশে পৌঁছলাম, দেখি– শরীরের ঘামে কিতাবের একটা অংশ ভিজে গেছে।

এই যুবক তালেবুল ইলম। এক দেশ থেকে আরেক দেশে সফর করতে চাইল। একটি ব্যগে কিতাবাদী ও কিছু কাপড় নিল। এরপর সে এক ক্যারাভানের সাথে যোগ দিল। সে কাফেলায় ছিলো বিভিন্ন ব্যবসায়ী, আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে গমনকারী এবং আরো অনেকে। আগে সফর করতে হলে অনেক কাফেলা জোটবদ্ধ হয়ে সফর করত। কাফেলায় নারী ও শিশুরাও থাকত। উটের পর উট সারিবদ্ধ হয়ে চলত। এসব কাফেলা চলত মরুপথ অতিক্রম করে। তারা যথাসম্ভব কাফেলাকে বড় রূপ দেয়ার চেষ্টা করত। তাদের সাথে প্রহরী থাকত। যে কাফেলা যত বড় হতো চোর-ডাকাত থেকে সে কাফেলা থাকত ততোটা নিরাপদ।

এ যুবক এক কাফেলার সাথে যুক্ত হল। সে বাহনে চড়ে তাদের সাথে রওয়ানা হল। তার সাথে ছিলো কিতাবাদি ও কিছু পরিধেয় বস্ত্র। সে কিতাবগুলোকে চোখে চোখে রাখতো। কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। সে কাফেলার লোকদের নামায পড়াত এবং ওয়ায-নাসিহাত করত। কাফেলাটি মরুপথে যাত্রা করছিলো, এমন সময় হঠাৎ একটি ডাকাত-দল তাদের উপর হামলেপড়লো।তাদের আসবাবপত্র ও যানবহন সবকিছুই লুট করলো। তারা এতটাই বেপরোয়া ছিলো যে, যাত্রীদের পরনের কাপড়টা পর্যন্ত খুলে নিল; শুধু লজ্জা ঢাকার মত কাপড় ছেড়ে দিলো। যুবকটি ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলো, যেখান থেকে ডাকাতদের চুরিকৃত সম্পদ ভাগ-আসর দেখা যাচ্ছিল। কাপড় ও সম্পদ নিয়ে তার চিন্তা হচ্ছিল না বরং সে কিতাবগুলো নিয়ে বেশ চিন্তিত,কারণ ডাকাতরা এর কোনো মূল্য জানতো না; তারা কিতাবগুলো পশুর সামনে ফেলে দিল। আর কেনোই-বা এমনটি করবে না। কিতাবের সম্মান ও মূল্য তো শুধু জ্ঞানীরাই জানে।

উদাহরণস্বরূপ, আজ যদি আপনার কাছে 'রিয়াযুস সালেহিন'-এর একটি কপি থাকে অথবা 'তাফসিরে ইবনে কাসিরের' কোনো কপি থাকে, তারপর কিতাবটি কোনো ভাবে নষ্ট হয়ে যায়; তখন আপনি কী করেন?

Contents

কোনো লাইব্রেরি থেকে অল্পমূল্যে আরেকটি কপি কিনে নেন। অথবা ফটোকপি করে সেটা সংগ্রহ করেন; কিন্তু অতীতে কোনো ছাত্র কিতাবের মালিক হতে চাইলে প্রথমে লিপিকারের কাছে যেতে হত, তার সাথে দামাদামি করে এক কপি লিপির চুক্তি করতে হত। অথবা তার কাছেই লিখিত কোনো কপি পেয়ে তা কিনে নিতো। তা না হলে নিজেকেই বসে বসে এক কপি লিখে নিতে হত। কখনও কখনও রাতের আঁধারে মোমের নিভুনিভু ক্ষীণ আলোতে লিখতে হতো। এ ধরনের বহু কষ্ট তাঁরা করত। তো এ তালিবে ইলম তার কিতাবের দিকে তাকাচ্ছিল। কিতাবগুলো তার নিজস্ব ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পানীযুক্ত ছিল। এখন তা এমনি এমনি চলে যাচ্ছে। তারা এর কোনো কদরই করছে না।

যুবক ডাকাত সরদারের কাছে গিয়ে সালাম দিল। সরদার বলল, এখান থেকে যাও নইলে শেষ করে দিব। যুবক সাহস করে বলল, আপনারা আমার এমন জিনিস নিয়েছেন যা আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে অথচ এতে আপনাদের কোনো উপকার হচ্ছে না। সরদার বলল, কী সেটা? আমরা কিন্তু তোমার বাহন, কাপড় ও টাকা পয়সা কিছুই ফেরত দিব না। যুবক বলল, না না... শুধু ঐ ব্যাগটি, ঐ ব্যাগে আমার কিতাবাদি আছে। আমি কিতাবগুলো খুব কষ্ট করে জমা করেছি। আমি মানুষকে নামায পড়াই, মাসআলা-মাসায়েল ও দীন শিক্ষা দেই। এই কিতাবগুলো আপনাদের কোনো কাজে আসবে না। সরদার বলল, কোন ব্যাগ? ঐ ব্যাগটি। সরদার ব্যাগটি আনতে বলল। ব্যাগ খুলে দেখল, তাতে শুধু কিতাব আর কিতাব। সরদার বলল, আচ্ছা তোমার কিতাব নিয়ে নাও। যুবক খুশি হয়ে বলল, আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দান করুন।

ডাকাত সরদার যুবকের কারণে বিস্মিত হল। যুবক ছেলে, তালিবুল ইলম, কাপড় ছাড়া বসে থাকবে? তাকে তার কাপড় দিয়ে দাও। সে কাপড় পরে পাগড়ী বাঁধল। এবার বলল, তাকে তার বাহনও দিয়ে দাও। সরদার যুবকের প্রতি একটু মুগ্ধই হল। কিছু টাকা দিয়ে বললো, নাও এগুলো তোমার জন্যে হাদিয়া। যুবক বলল, না; এটাকা নিবো না। কেনো? এটা হারাম মাল, আমি তা গ্রহণ করব না। সরদার বলল, এটা হারাম মাল? হ্যাঁ, হারাম। আপনি এখন আমার সামনে এই অসহায় লোকদের থেকে চুরি

করেছেন। সরদার বলল, কোনো সন্দেহ নেই– এ মাল আমার জন্যে মায়ের দুধের এত হালাল এবং বৃষ্টির চেয়েও পূত-পবিত্র। যুবক বললো, এটা কীভাবে হয়? আপনি আমার সামনে চুরি করলেন, আবার বলছেন হালাল? হ্যাঁ, তা হালাল। যুবক বললো, কীভাবে? আপনি প্রমাণ করুন।ডাকাত বললো, তুমি কি চাও, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দেখাই? হ্যাঁ প্রমাণ করুন। আচ্ছা বসো তাহলে; যুবক বসল। সরদার এক ব্যবসায়ীকে ডাকল। ব্যবসায়ী সামনে এলে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ব্যবসা কী? বললো, উট আর ছাগলের ব্যবসা। আচ্ছা, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্যে ক'টি উট থাকতে হয়? ব্যবসায়ী বলল, জানিনা। তোমার কাছে যদি দশটি উট, পাঁচটি ছাগল আর ছ'টি গরু থাকে তাহলে তুমি কী পরিমাণ যাকাত দিবে। ব্যবসায়ী বলল, জানিনা। অর্থাৎ তুমি সারা জীবন মালের কোনো যাকাত দেও নাই; যাও। এরপর দ্বিতীয়জনকে ডেকে বলল, তুমি কী কর? আমি স্বর্ণ-রূপার ব্যবসা করি। কী পরিমাণ স্বর্ণের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়? বললো, জানি না; মনে হয় সত্তর দিনার, ভুল; না.. আশি, আশি দিনার; ভুল। আচ্ছা, তোমার কাছে যদি কিছু স্বর্ণ থাকে আর কিছু রূপা থাকে যার দ্বারা স্বর্ণের নেসাব পূর্ণ হয় তাহলে কি তুমি যাকাত দিবে?বললো, জানিনা। তাহলে তো তুমি সারা জীবন মালের কোনো যাকাতই দাও নাই; যাও। আরেক জনকে ডেকে বলল, তোমার কী ব্যবসা? আমি কাপড়ের ব্যবসা করি। আচ্ছা, তাহলে তো বিশাল কারবার। যদি বছরের শুরুতে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এরপর বছরের মাঝে হ্রাস পায়, আবার বছরের শেষে তা পূর্ণ হয়; তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে কি-না? এ সরদার এভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন করছে আর বলছে যাকাত আদায় করতে হবে কি-না। তারা কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারছিলো না।

এরপর সরদার যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাই! এগুলো হচ্ছে এসব লোকের যাকাত। তারা যখন এর যাকাত আদায় করে নাই তখন তাতে অতিরিক্ত কিছু হক এসে গেছে, যার মালিক তারা নয়। তাদের কারো কাছে এক হাজার দিনার ছিলো, বছরান্তে তার উপর পঁচিশ দিনার যাকাত ওয়াজিব হয়েছিলো; কিন্তু সে তা আদায় করেনি। এখন তার কাছে এই পঁচিশ দিনার আছে, যেটার মালিক সে নয়; এর মালিক হলগরিব-দুঃখীরা। সুতরাং এরা যেহেতু মালের যাকাত আদায়

করে নি, তাই যাকাত পরিমাণ অংশ তাদের অধিকার বহির্ভূত। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের শায়েস্তা করে গরিবদের সে হক বের করতে আমাদের পাঠালেন।

পাঠক! স্বভাবতই এটা ভুল এবং অন্যায়। মানুষ যাকাত না দিলেও আমার জন্যে তার সম্পদ চুরি করা বৈধ হবে না। এটা ঐ পতিতা নারীর মত, যে বেশ্যাবৃত্তি করে ইয়াতিম প্রতিপালন করে। অথচ লক্ষ করুন, এই ডাকাত অন্যায়-অবিচার করে নিজেকে দোষমুক্ত রাখতে কীভাবে বিভিন্ন অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছে।

উলামায়ে কেরাম অনুরূপ আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এক কাযির সামনে এক চোরকে হাযির করা হল,যে দেয়াল টপকিয়ে চোরা পথে এক বাড়িতে প্রবেশ করেছে। এবং মস্ত বড় এক লোহার সিন্দুক ভেঙ্গে মালামাল লুটপাট করেছে। কাযি তাকে বলল, হে অমুক! শুনো, তুমি অপরাধী এজন্যে আমি আশ্চর্য নই। মালের প্রতি তোমার লোভ বা দেয়াল টপকিয়ে বাড়িতে ঢুকেছো, এ কারণেও আমি আশ্চর্য নই। আমি তোমার একটি জিনিসের কারণে খুব আশ্চর্যিত। চোর বলল, সেটা কী? কাযিবলল, তুমি কীভাবে এত বড় লৌহ-সিন্দুক ভেঙ্গে সম্পদ চুরি করলে? চোর তখন বলল, কাযি সাহেব! আপনি কি এ কবিতা শোনেননি?

'শুনো! লোভের মাধ্যমেই তোমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাসিল হবে।আর তাকওয়ার মাধ্যমেই তোমার জন্যে লোহা নরম হবে'।

কাযি বলল, বাহ! তুমি তো দেখি দাউদ আ.-এর সমকক্ষ হয়ে গেছো! ওহে ইতর! তোমার কাছে তাকওয়া থাকলে তুমি কি আর চুরি করতে? এরপর তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হল।

এ ঘটনা উল্লেখ করার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল, আমরা কখনো ভুল করে ফেলি। যে কারণেই হোক আমরা যখন ভুলের মধ্যে পড়েই যাই তখন বিভিন্নধরনের অজুহাত ও খোঁড়া যুক্তি তালাশ করতে থাকি। যেমন ইবলিস, সে-ই সর্বপ্রথম নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্যে যুক্তি তালাশ করেছে। আল্লাহ তাআলা যখন ইবলিস সমেত ফেরেশতাদের আদম

Contents

আ.-কে সেজদার আদেশ দিলেন; তখন ফেরেশতারা সেজদা করেছিলেন; কিন্তু ইবলিস সেজদা করেনি।আল্লাহ তাআলা তার কথা কুরআনে কারিমে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

'আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাঁকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।'[১]

অপর আয়াতে এসেছে, সে বললো,

أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

'আমি কি তাকে সেজদাহ করব, যাকে আপনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।'[২]

দেখুন! ইবলিস আল্লাহর আদেশ অমান্য করল। আদম আ.কে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানাল; কিন্তু একটি অজুহাত বা যুক্তি প্রস্তুত। যখন বলা হল, তুমি কেনো আদমকে সেজদা করলে না? সে বলল, আমি আদমকে বিনা কারণে সেজদা করি নি; আমার যুক্তি আছে। আমি তার চে' উত্তম; তার চে' শ্রেষ্ঠ।

সে কিন্তু মিথ্যা বলেছে, কারণ আগুনের চেয়ে মাটি উত্তম।সবচে' বড় কথা হল, মহান আল্লাহর সামনে যুক্তি পেশ করা যায় না।এভাবে ফেরাউনও যুক্তি পেশ করেছিলো, যখন নিজেকে স্রষ্টাদাবি করতে চেয়েছিল। আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের দাবিগুলো এভাবে কোরআনে এনেছেন–

ইরশাদ হয়েছে :

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

১. সুরা সাদ: ৭৬

২. সুরা বনি ইসরাইল: ৬১

Contents

'ফেরাউন বললো, হে পরিষদবর্গ! আমি জানি না যে, আমিব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য আছে কি-না? হে হামান, তুমিইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে আমি মুসার উপাস্যকে উঁকি মেরে দেখতে পরি। আমার ধারণা তো সে একজন মিথ্যবাদী।'[১]

অন্য আয়াতে এসেছে,

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

'ফেরাইন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বললো, হে আমার কওম! আমি কি মিসরের অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমাদের নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি তা দেখো না?'[২]

অর্থাৎ সে লোকদের বলল, আমি তোমাদের প্রভু; তোমাদের বাদশাহ। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না যে, নদীগুলো আমার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। তোমরা কি তা দেখতে পাও না? মোটকথা সে আল্লাহর নাফরমানি করার জন্যে অনেক অজুহাত ও যুক্তি প্রস্তুত করেছিল।

মানুষ কখনও কখনও ভুলের মধ্যে পড়ে যায় এবং তার অজুহাত সত্যিও হয়। মনে করুন, কেউ নিজেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামনের লোকটি মারা পড়ল। যেমন মুসা আ.-এর ঘটনা। কুরআনে কারিমে মুসা আ.-এর ঘটনা এভাবে এসেছে–

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ

---

১. সুরা কসাস: ৩৮
২. সুরা যুখরুফ: ৫১

Contents

'তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন অধিবসীরা ছিলো বেখবর। সেখানে তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন; এদের একজন ছিলো তাঁর নিজ-পক্ষের আর অপরজন তাঁর শত্রুপক্ষের। অতঃপর নিজ দলের লোকটি শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলো। তখন মুসা তাকে এক ঘুসি মারলেন এবং এতেই সে মারা পড়লো । মুসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে চরম বিভ্রান্তকারী ও প্রকাশ্য শত্রু।'[১]

মুসা আ. মূলত তাদের মধ্যকার সমস্যা মিটমাট করতে গিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁর শত্রু লোকটির কাছে গিয়ে বুকের নিচে একটা ঘুসি মারলেন আর এতেই লোকটি মারা পড়লো। অথচ মুসাআ. কিছুতেই এমনটি চাননি। সুতরাং এখানে মুসাআ.-এর অজুহাত বা যুক্তি খোঁজার কোনো প্রয়োজনই ছিলো না; তার সামনে আজুহাত প্রস্তুতই ছিলো যে, 'আল্লাহ! আমি তো এটা চাইনি।' এমন একটা অজুহাত তার সামনে প্রস্তুতই ছিল; কিন্তু মুসা আ. আল্লাহ তাআলার সামনে কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে চাননি; তাই নিজের ভুল স্বীকার করে স্পষ্ট বলে দিলেন, 'এ-তো নিশ্চিত শয়তানের কাজ, নিশ্চয় সে বিভ্রান্তকারী প্রকাশ্য শত্রু।' মুসা বলল,

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

'তিনি বললেন, হে আমার রব! নিশ্চয় আমি নিজের উপর যুলুম করেছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।'[২]

অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করে হত্যা করি নি বটে; কিন্তু লোকটিকে ভুলে হলেও তো হত্যা করেছি। আর আল্লাহ তাকে ক্ষমাও করেছেন।

فَغَفَرَ لَهُ. إِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُقَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ

১. সুরা কসাস: ১৫

২. সুরা কসাস: ১৬

'আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।'

মুসাআ.-এর উক্তি এ কথাই প্রমাণ করছে যে, কেউ কখনো অনিচ্ছায় ভুল করে ফেললে তার উচিত অতিসত্বর তাওবা করা। সুতরাং কেউ যখন ইচ্ছা করে ভুল করে, আবার সে ভুলের অজুহাতও তালাশ করে তখন তার সে অজুহাত কীভাবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে?

আল্লাহ তাআলা জাহান্নামিদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

'আমি তাদের জন্যে কিছু সাথী-সঙ্গী নিয়োজিত করে দিয়েছিলাম, যারা তাদের পূর্বাপরের ও বিষয়গুলো সুন্দর করে দেখাত।'[১]

অর্থাৎ তাদের কিছু বন্ধু-বান্ধব থাকে, যারা তাদের জন্যে বিভিন্ন যুক্তি ও অজুহাত তালাশ করে। যেমন, কোনো যুবক বন্ধুদের বলল, এই! আমি মদ পান করা ছেড়ে দিতে চাচ্ছি। তখন তারা তাকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বলে, আরে! তুই তো এখনো যুবক। আগে যৌবনটা উপভোগ কর, এরপর যখন বৃদ্ধ হবি তখন তাওবা করে নিবি। সামনে আরো বহু সময় আছে। এভাবেই তারা তাকে অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে বিভিন্ন যুক্তি দেখাতে থাকে– ঐ ডাকাতের মত, যে বলেছিলো, আমরা এ মাল চুরি করেছি,কারণ তারা এর যাকাত আদায় করেনি বলে। অথবা ঐ মহিলার মত, যে ব্যাভিচারের মাধ্যমে উপার্জিত টাকা দ্বারা দান-খয়রাত করে অথবা মসজিদ নির্মাণ করে। অথবা চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে টাকা কামিয়ে ইয়াতিম-বিধবাদের ভরণপোষণ করে। আর প্রত্যেকেই নিজেদের অন্যায়-অপরাধের পক্ষে কোনো না কোনো অজুহাত দাঁড় করাতে চায়।

অনুরূপভাবে কোনো যুবতী পর্দা করতে চায়। হোক তা সাউদি আরবে বা অন্য কোনো দেশে; যেমন আমি যেসব দেশে সফর করেছি। ভার্সিটির

---

১. সুরা হা-মিম সেজদাহ: ২৫

মেয়েরা উদোম এবং আঁটসাঁটপোশাক পরে। কেউ কেউ আবার মাথায় স্কার্ফ পরে বলে, আমি পর্দা করেছি! কীভাবে তুমি পর্দা করলে? অথচ তুমি টাইট-ফিট ও চোস্ত পোশাক এবং সংকীর্ণ ট্রাউজার পরে দেহের অবয়ব ও সৌন্দর্য প্রকাশ করে দিয়েছ, তারপরও বলছো, আমি পর্দা করেছি। তুমি কোথায় আর তোমার পর্দা কোথায়? এতকিছুর পরও তাকে কোনো কোনো বান্ধবী বলে, তুমি অন্যের চে' অনেক ভাল আছো। অন্যরা তো এর চেয়েও সর্ট ট্রাউজার পরে। তোমারটা তো কমপক্ষে গোঁড়ালী পর্যন্ত পৌছে। হ্যাঁ, একটু টাইট-ফিট; কিন্তু অন্যেরটা তো হাঁটু পর্যন্ত বা তারচে' সর্ট। অন্যরা তো মাথা ঢাকে না, তুমি অন্তত মাথা ঢেকে রাখো। অনুরূপভাবে ধরে নিলাম কোনো যুবক বাড়িতে নামায পড়ে; মসজিদে নামায পড়ে না। যখন সে বন্ধুদের বলে, আমি তো মসজিদে নামায পড়ি না, আমি মসজিদে নামায পড়তে চাই। তখন তারা বলে, ভাই! তুমি অন্যের চেয়ে হাজার গুণে ভাল আছো। অমুক তো নামাযই পড়ে না। তুমি তোর কমপক্ষে নামাযটা পড়!

সাহাবায়ে কেরাম রা. কিন্তু আমাদের মত আমল থেকে বাঁচার জন্যে কোনো ছুতো তালাশ করতেন না। তাঁদের কেউই ছোট ছোট আমল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন না। বরং তাঁরা সর্বদা বড় থেকে বড় আমল খুঁজে বেড়াতেন। তাঁদের কেউই আরাম-আয়েশে থাকতে পছন্দ করতেন না। তাঁদের কেউই ভুল থেকে মুক্তি পেতে যুক্তি তালাশ করতেন না। হোক তা আল্লাহর নাফরমানি বা অন্য কারো সাথে জুলুম করার ক্ষেত্রে। তাঁরা শুধু একটি পথই তালাশ করতেন; জান্নাতের পথ। তাঁদের মনবলও ছিলো অতিউঁচু; তাই তাঁদের প্রশ্নও হতো ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর। এক সাহাবি এসে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কাছে সবচে' প্রিয় আমল কোনটি? তিনি প্রশ্ন করেননি কোন আমল তাঁকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। বরং জানতে চেয়েছেন,কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচে' প্রিয়। আরেক সাহাবি যুদ্ধের শুরুতে এসে জিজ্ঞসা করলেন, আল্লাহর বান্দার কোন আমল দেখে হাসেন? আরেক সাহাবি প্রশ্ন করেন, কোন আমল পাল্লায় সবচে' ভারী হবে। আরেক সাহাবি প্রশ্ন করেন, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি আপনার সবচে' নিকটে থাকতে ?

Contents

প্রিয় পাঠক! নিজের মুক্তির পথ তালাশ করুন। তাদের মত হবেন না, যারা অপরাধ করে সেই অপরাধের পক্ষে কোনো যুক্তি বা ছুতো তালাশ করে বেড়ায়। অন্যায় করে ফেললে স্বীকার করুন; যেমন মুসাআ. করেছিলেন– হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দিন। আর তিনি তাঁকে মাফ করে দিলেন। এটা না করে যদি নিজের জন্যে বা অন্য কারো জন্যে যুক্তি বা মুক্তির পথ খোঁজেন, তাহলে তো আপনি অন্যায়-অপরাধ অব্যহক রাখারপ্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে দিলেন।

আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাদের সকলকে সঠিকটা বুঝে উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

যে আল্লাহর জন্যে কিছু ত্যাগ করে...

কথায় বলে, 'যে ব্যক্তি স্মৃতিপটে ইতিহাস সংরক্ষণ করে, তার জীবনায়ু বৃদ্ধি পায়।' মানুষ যখনই অতীতে দৃষ্টি দিবে এবং ইতিহাস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে তখনই তার সামনে অনেক জ্ঞান ও শিক্ষনীয় বিষয় চলে আসবে। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর চিরন্তন-শাশ্বত গ্রন্থে পূর্ববর্তীদের ইতিহাস আলোচনা করেছেন; যখন আমরা সেগুলো নিয়ে চিন্তা করি তখন তা আমাদের শিক্ষা ও উপদেশই বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা নবিকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

'নিশ্চয়ই তাঁদের ঘটনায় বুদ্ধিমানদের জন্যে রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোনো মনগড়া কথা-উক্তি নয়; বরং এটা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ এবং মুমিনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমতের মহাউপকরণ।'[১]

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا

---

১. সুরা ইউসুফ: ১১১

'আমি এভাবে আমি অতীতে যা ঘটেছে তা কিছু সংবাদ আপনাকে অবহিত করি আর আমার পক্ষ থেকে আপনাকে দান করেছি এক উপদেশবাণী।'[২]

আসুন! আমরা একটু হিজরি তিনশ' পয়ষট্টির দিকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করি। সেখানে আমরা বাদশা মুজাফফরের একটি ঘটনা জানতে পারবো। এই বাদশা মুজাফফর ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তাঁর ছিলো বিশাল সৈন্যবাহিনী ও অঢেল সম্পদ। তাঁর রাজত্ব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিয়ে কথা বলতে গেলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ রচিত 'আল মুনতাজিম ফি আখবারিল মুলুকি ওয়াল উমাম' গ্রন্থ পড়ছিলাম; সেখানে তাঁর একটি আত্মসংযমতার ঘটনা পড়ে আমি থমকে গেলাম। মুসলিম ভাই-বোনদের জন্যে এখানে তা উল্লেখ করছি।

বাদশাহ মুজাফফরের মৃত্যু তিনশ' পয়ষট্টি হিজরিতে। তিনি অনেক বড় বাদশাহ ছিলেন। বহু অঞ্চল তাঁর শাসনাধীন ছিল। তাঁর আজ্ঞাধীন এক অঞ্চলের গভর্নর মৃত্যুবরণ করল। উত্তাধিকার হিসাবে একটিমাত্র মেয়ে রেখে যায়। পরবর্তী গভর্নর তার সমস্ত সহায়-সম্পত্তি নিজের কতৃত্বে নিয়ে নেয়। ফলে মেয়েটি খুব অভাব-অনাটনে পড়ে যায়। একজন বৃদ্ধা মহিলা বাদশাহ মুজাফফরের কাছে এসে বলল, আপনার অমুক অঞ্চলের গভর্নর একটি মেয়ে রেখে ইন্তেকাল করেছে। মেয়েটির কাছে অনেক ধন-সম্পদ ছিল; কিন্তু পরবর্তী গভর্নর তার সব সহায়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাঁকে রিক্তহস্ত করে দেয়। সে আপনার কাছে অভিযোগ করতে চায়; তার জন্যে কি এ সুযোগ আছে? বাদশাহ বলল, হ্যাঁ, তাঁকে আসতে বলেন। মেয়েটি তাঁর সামনে আসল। সে এমনই অনিন্দ্য সুন্দরী ও রূপবতী ছিলো যে, বাদশাহ তাঁর দেহাবয়ব দেখেই তা বুঝে ফেলেন। সে গভর্নরের মেয়ে কি-না এ ব্যাপারে বাদশাহ নিশ্চিত হতে চাইল। কিছু লোক সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে এগিয়ে এলো। আগে তো কোনো পরিচয়পত্র বা আইডিকার্ড ছিলো না। তাই সাক্ষ্য দিতে চেহারা দেখা আবশ্যক ছিল। যখন সে চেহারার অবগুণ্ঠন সরালো; সাথে সাথেই রূপ-লাবণ্যে

---

২. সুরা তোয়াহা: ৯৯

আশপাশ যেনো ঝলমল করে উঠল। আর এই অভাবনীয় রূপ-লাবণ্যদেখে বাদশাহর শরীরে রীতিমত কাঁপন ধরে গেল, কারণ তাঁর জীবনে সে এমন সুন্দরী-রূপসী ললনা কখনো দেখে নি।তাঁকে চেহারা ঢাকার নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমার কী প্রয়োজন? মেয়ে বলল, আমার বাবার মৃত্যুর পর অমুক গভর্নর সমস্ত সহায়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে।সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করেছে। আমার সম্পদ ফিরিয়ে পেতে আপনার সাহায্য প্রয়োজন। বাদশাহ তৎক্ষণাত তার সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার ফরমান জারি করলেন। তাঁকে বললেন, তোমার বর্তমান অবস্থা কী? মেয়ে বলল, নিজ হাতে উপার্জন করে রুটি-পানি খেয়ে খুব কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। বাদশাহ তখনই তাঁকে কিছু টাকা দিতে বললেন এবং তাঁর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার হুকুম দিলেন।

ঐ বৃদ্ধা মহিলা লক্ষ করেছে যে, বাদশাহ এই যুবতীর রূপে কাবু হয়ে গেছে। তাই সে বলল, বাদশাহ নামদার! যদি সে আজকের রাত আপনার প্রসাদে কাটাতো। মহিলার উদ্দেশ্য হল, বাদশাহ যুবতী মেয়েটির সাথে নৈশগল্প উপভোগ করবে। বাদশাহ বলেন, আমি তো প্রায় হ্যাঁ বলেই ফেলেছিলাম; কিন্তু তখন আমার স্মরণ হল, আমারও তো কয়েকজন মেয়ে আছে। কিছুদিন পর আমিও মৃত্যুবরণ করব। হয়তো অন্য কেউ আমার সম্পদে হস্তক্ষেপ করবে। আর আমার মেয়েরা নিরুপায় হয়ে পরবর্তী বাদশাহর কাছে আসবে। আর সেও আমার মেয়ের উপর যুলুম করবে, আজ যেমন আমি আরেক জনের মৃত্যুর পর তার মেয়ের উপর যুলুম করছি।

একটু কল্পনা করুন। এ আলিশান রাজপ্রাসাদ, এত এত জাঁকজমক ও আড়ম্বরতা এবং এত বড় রাজত্ব আর ক্ষমতা; এ সবকিছুই মানুষের মনে আত্মহমিকা ও প্রতারণার বিষ ঢুকিয়ে দেয়, কখনো অবাধ্যতার দিকেও ঠেলে দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'না, মানুষ তো অবাধ্যতা করেই।' বাদশাহ মুজাফফরের প্রাচুর্য ও ক্ষমতার সবকিছুই ছিল; কিন্তু এসব তাকে আল্লাহর বিধান ভুলিয়ে দেয়নি। তাই তিনি বলেছেন, না; বরং সে পরিবারের কাছেই চলে যাক। আল্লাহ তাঁকে বরকত দান করুন।

Contents

বাদশাহ বলেন, মেয়েটি আমার সামনে থেকে তো ঠিকই গেল; কিন্তু আমার মন তো তাঁর সাথে চলে গেল।

এ ঘটনা চারিত্রিক পবিত্রতা এবং আত্ম-সংযমতারই পরিচয় দিচ্ছে। কখনো মানুষের জন্যে পাপের পথ সহজ হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও সে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। আবার কখনো সে পরিণামের কথা ভেবে দুনিয়াতেই পরিণতির আশঙ্কা করে। ফলে আল্লাহর দয়ায় এই ভাবনাই তাঁকে এধরনের পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারে।

আল্লামা তানুখি তাঁর 'অসুবিধার পরেই স্বস্তি' নামক কিতাবে এ জাতীয় চারিত্রিক পবিত্রতা ও আত্ম-সংযমতার অনেক অভাবনীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একটি হল, এক কাতান কাপড়ের ব্যবসায়ী; যে ছিলো অস্বাভাবিক রকমের কালো। তার কাছে এক লোক মেহমান হল। একটু পরে মেহমান তার ঘরে কিছু ফুটফুটে সুন্দর বালক দেখতে পেল। মেহমান জিজ্ঞাসা করল, এরা কারা? ব্যবসায়ী বললো, আমার সন্তান। মেহমান বড় আশ্চর্য হয়ে গেল। তখন ব্যবসায়ী বলল, তাদের মা হচ্ছে এক ইউরোপিয়ান নারী। তার সঙ্গে আমার এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। মেহমান বলল, আমাকে ঘটনাটি একটু বলুন–

ব্যবসায়ী বর্ণনা করে, সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যায়। তখন সিরিয়া ছিলো খৃস্টানদের শাসনাধীন। তার সাথে কিছু মুসলিম বণিকও ছিল। সে সেখানে কাতান কাপড় বিক্রি করত। একদিন তার পাশ দিয়ে এক বৃদ্ধা মহিলা গেল। তার সাথে ছিলো এক অপরূপা সুন্দরী যুবতী। তারা ছিলো খৃস্টান। তারা সামনে অগ্রসর হয়ে একবার ঐ ব্যবসায়ীর দিকে তাকায় আরেকবার তার পণ্য-সামগ্রীর দিকে তাকায়। তখন মহিলা লক্ষ করল যে, এ যুবক এই রমণীর প্রতি বেশ আকৃষ্ট হয়েছে। ব্যবসায়ীরা যখন সেখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে লাগল তখন মহিলা যুবকের কাছে ফিরে এলো। তাকে বলল, তুমি কি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছ? যুবক বলল, হ্যাঁ। মহিলা বলল, সে তো অমুক খৃস্টান নেতার স্ত্রী। যুবক বলল; কিন্তু আমি তো তার প্রতি পাগল হয়ে পড়েছি। আমি তাকে কিছুক্ষণের জন্যেপেতে চাই। কত দিলে আপনি ব্যাপারটি সহজ করে দিবেন? মহিলা বলল,

একশ' দিনার দাও। আমিই তোমাকে সুযোগ করে দিব। ব্যবসায়ী বলে, আমি তাকে একশ' দিনার দিয়ে দিলাম। যখন রাতে এসে তার ঘরে ঢুকলাম 'সুবহানাল্লাহ' কী বলব, তখন আমাকে এক চিন্তা ও পেরেশানি ঘিরে বসল; ফলে আমি সেখান থেকে চলে আসলাম; কিন্তু পরের দিন আফসোস করতে লাগলাম– কীভাবে আমি এ সুযোগ হাত ছাড়া করলাম আর একশ' দিনার খেয়ে দিলাম।

পরদিন মহিলা এসে বলল, তোমাকে সুযোগ করে দেওয়ার পর কী করলে? আমি বললাম, জানিনা আমার কী অর্জন হল। লোকটি বললো, আচ্ছা, এবার আরো বেশি করে নিন। তাকে চারশ' দিনার দিয়ে যুবতীর কাছে গেলাম; কিন্তু আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম, আল্লাহ আমাকে দেখছেন আর আমি এক খৃস্টান নারীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হব, এটা কীভাবে সম্ভব?। এ বলে আমি বের হয়ে এলাম। যখন বের হলাম তখন শয়তান হাযির হয়ে বললো, তুমি কীভাবে এ সুযোগ হাত ছাড়া করলে। অথচ তোমার মন তার জন্যে উতাল। এভাবে মহিলাকে দিনার দেই আর যুবতীর সাথে নির্জনে মিলিত হই; কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহর কথা স্মরণ করে চলে আসি। একসময় এ কাজে আমার সমুদয় দোকান বিক্রি করে ফেলি।

দোকান বিক্রি ও সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর সে বলে, যখন দু'তিন দিন চলে গেল তখন আফসোস করতে থাকলাম, হায়! আমার কাছে এখন দোকানও নেই আবার দিনারগুলো শুধু শুধু ঐ মহিলার কাছে গেল। যা ভোগ করতে চাইলাম; কিছুই হল না। প্রত্যেক বারই বলছি, এটা হারাম, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। আমি এ চিন্তায়ই পড়ে ছিলাম; এরই মধ্যে এক ঘোষককে বলতে শুনলাম, মুসলিম ব্যবসায়ীদের প্রতি ঘোষণা–'যাদের সাথে আমাদের চুক্তি আছে, সে চুক্তি দু'দিনে শেষ হয়ে যাবে। তাই যার পণ্য আছে সে যেনো এ সময়ের মধ্যেই বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় দাঙ্গা বাজিয়ে দিয়ে মালামাল নিয়ে নিব।' এ শুনে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। তারপর দেশে ফিরে এলাম। সেখান থেকে আসলাম বটে কিন্তু আমার মন ঐ যুবতীর কাছেই রয়ে গেল।

এরপর আমি বাঁদি-দাসীর ব্যবসা শুরু করলাম; বাঁদি ক্রয়-বিক্রয়। আগে তো যুদ্ধের সাথে বাঁদি-দাসীরও প্রচলন ছিল।গনিমত হিসেবে মুসলিমরা বাঁদি-দাসী পেতো। মুসলিমরা দুশমনদের বন্দি করত আবার দুশমনরা মুসলমানদের বন্দি করত; কিন্তুবন্দিদের সাথে মুসলিমদের আচরণ আর মুশরিকদের আচারণের মাঝে বিরাট তফাত ছিল। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন বদর যুদ্ধের বন্দিরা আসল তখন তাদের সাথে সদয় আচারণের নির্দেশ দিলেন। কারো শরীরে জীর্ণশীর্ণ কাপড় দেখে তাদেরকে উত্তম কাপড় দিতে বললেন। এমনকি বন্দিদের প্রহরী সাহাবিরা নিজেরা নিম্নমানের খাবার খেতো আর বন্দিদের দিতো ভালো খাবার; অথচ সে তাদের হাতে বন্দি। তাদের উত্তম স্বভাব-চরিত্রের কথা কোরআনে কারিমেও বর্ণিত হয়েছে, 'নিজের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা অসহয়, এতিম ও বন্দিদের খাবার দিয়ে দিত।' অথচ বন্দি লোকটি কাফের। তারপরও তার সাথে এ আচরণ! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বন্দিদের প্রতি ভালো আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন; তাই তাঁরা নিজেরা সাধারণ খাবার গ্রহণ করত আর বন্দিদের ভালো খাবার দিত। উদাহরণস্বরূপ- দুধ, রুটি আর খেজুর থাকলে বন্দিকে দিতো দুধ, খেজুর আর নিজেরা পানি দিয়ে শুকনা রুটি খেতো। এটা বন্দির প্রতি নিতান্তই অনুগ্রহ; অথচ তারা ছিলো কাফের। যারা কিছুক্ষণ আগেও তাঁদের সাথে সম্মুখসমরে যুদ্ধ করেছে। তারপরও তাদের সাথে এ সুন্দর আচরণ।

এই বন্দিদের নারী ও শিশুরা মুসলমানদের দাস-দাসী হয়ে যেতো। নারীরা তাদের মালিকানায় চলে আসত। যেমন কোরআনে এসেছে, 'অথবা তোমাদের মালিকানা-ভুক্ত দাসী।' আবার এই দাস-দাসীদের বিভিন্নভাবে আযাদ-মুক্তির ব্যবস্থাও ছিলো। যেমন, কেউ ভুলে কাউকে হত্যা করলে জরিমানা হিসাবে একটি গোলাম বা একটি দাসী আযাদ করতে হয়। অথবা কেউ রমযানে রোযা অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করলে একটি দাস আযাদ করতে হয়। অপর দিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাস মুক্ত করার প্রতি উৎসাহও দিতেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি দাস মুক্ত করবে আল্লাহ ঐ দাসের

প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রত্যেকটি অঙ্গ জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবেন। এমনকি তার গুপ্তাঙ্গের বদলায় এর গুপ্তাঙ্গ মুক্ত করবেন।' অর্থাৎ যে আল্লাহর বন্দাকে মুক্ত করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন।

লক্ষ করুন, ইসলাম তাদেরকে বন্দি করে গোলাম বাঁদি বানানোর অনুমতি দিয়েছে; সাথে সাথে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ও সুন্দর আচরণেরও নির্দেশ দিয়েছে। তারপর বলেছে, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মুক্ত করে দাও। ইসলাম বন্দিদের প্রতি সদাচারের কতটা গুরুত্ব দিয়েছে তা প্রমাণের জন্যে এ ঘটনাটিই যথেষ্ট– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু-শয্যায় যে বাক্যটি বারবার বলেছিলেন তা হচ্ছে, সালাত, সালাত (-এর প্রতি যত্নবান থেকো) আর তোমাদের অধীন ব্যক্তি (-দের প্রতি খেয়াল রেখো)।

কিন্তু বন্দিদের সাথে তাঁদের এ আচরণ আর বর্তমানে বন্দিদের সাথে কাফেরদের আচরণকে একটুতুলনা করে দেখুন। ইরাকে আবু গারিব কারাগারে আমেরিকা বন্দিদের সাথে কী পাশবিক আর নির্মম আচরণ করেছে? যদি তারা এরূপ আচরণ কোনো পশুর সাথেও করত তবুও তা বৈধ হত না; এমনকি নিকৃষ্ট প্রাণী শুকর-পালের সাথে করলেও তা নিতান্তই হারাম হত। তারা এ নিকৃষ্টতম আচরণ এমন লোকদের সাথে করেছে যাদের কেউ উচ্চশিক্ষিত, আলেমে দীন, কেউ হাফেযে কোরআন, কেউ ভার্সিটির প্রফেসর-ডক্টর। আমরিকা 'গুয়ান্তামো বে' কারাগারে বান্দীদের সাথে কী আচরণ করেছিলো?বন্দিদেরকে এমন জালে আটকে রেখেছিলো, যা দিয়ে চতুষ্পদ জন্তুকেও আটকানো হয় না। এই জালে যদি তারা কুকুরকেও আটকে রাখত তাহলে পশু-অধিকার সংস্থা আন্তর্জাতিক উচ্চ আদালতে এর মামলা করে বিচার দাবি করতো। তারা তাদের সাথে অতিজঘন্য এবং নিকৃষ্টতম আচরণ করেছে। ফিলিস্তিনিবন্দিদের সাথে ইসরাইলের আচরণ লক্ষ্য করুন; এরপর বন্দিদের সাথে ইসলামের আচরণ আর এতদোভয়ের আচরণের মাঝে তুলনা করুন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমি তো আপনাকে পুরো বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।'

Contents

আচ্ছা, পূর্বের কথায় আসি। এই ব্যবসায়ী বলছে, আমি গোলাম-বাঁদিকেনা-বেচা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম; যাতে ঐ যুবতীর কথা মন থেকে সরে যায়; কিন্তু না, সে আর মন থেকে গেল না। একদিন শুনতে পেলাম খলিফা একটি বাঁদি খুঁজছে। তখন আমি এক সুন্দরী বাঁদি নিয়ে খলিফার সামনে পেশ করলাম। খলিফার তাকে খুব পছন্দ হল। তাই বলল, কত দিতে হবে। বললাম, দশ হাজার দিনার। খলিফা দিনার দেওয়ার নির্দেশ দিল; কিন্তু তারা শুধু পাঁচ হাজারদিনার দিলো। খলিফা বলল, আগামীকাল এসো। বললাম, আমি মুসাফির মানুষ, আমার এখনি দরকার। খলিফা বলল, তাকে ইউরোপ থেকে আগত নতুন বাঁদিদের কাছে নিয়ে যাও। পাঁচ হাজারের পরিবর্তে তাকে পছন্দমতএক বাঁদি নিয়ে নিতে বলো। আমি যখন সেখানে এসে বাঁদি দেখতে লাগলাম, হঠাৎ দেখি ঐ যুবতী মেয়েটি আমার সামনে উপস্থিত; যার সাথে আমি কয়েক বছর পূর্বে নির্জনে একাকী মিলিত হয়েছিলাম। সে তার স্বামীর সাথে যুদ্ধে এসেছিলো, তারপরবন্দি হয়ে এখানে এসেছে। তখন আমি তাকেই জিনিসপত্রসহ বাড়িতে নিয়ে আসলাম। বাড়িতে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ? বলল, না,চিনতে পারিনি। তখন তাকে বললাম, তোমার কি ঐ যুবকের কথা স্মরণ আছে, যে এত বছর আগে অমুক শহরে ব্যবসায়ী বেশে গিয়েছিল। টাকার বিনিময়ে কয়েকবার তোমার সাথে নির্জনে মিলিত হয়েছিল; কিন্তু প্রতিবারই সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলত, 'আল্লাহর পানাহ, আল্লাহ আমাকে দেখছেন আর আমি এক খৃস্টান নারীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হব' এ বলে সে তোমার কাছ থেকে চলে যেতো। তখন বলল, হ্যাঁ, মনে পড়েছে; সে লোক কি আপনি? বললাম, হ্যাঁ। এরপর সে ব্যাগ খুলে তিনটি মুদ্রা-থলে দিয়ে বলল, আপনার একটি মুদ্রাও নেই নি। আর এ মুদ্রাগুলো আমার কোনো প্রয়োজনও ছিলো না। অর্থাৎ সে হুবহু ঐ মুদ্রাগুলোই আমার কাছে ফিরিয়ে দিল। ঘটনা শেষ করে লোকটি বললো, সে এখন আমার কয়েক সন্তানের জননী। সে-ই আপনার জন্যে এ খাবার প্রস্তুত করেছে।

এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তাঁকে এরচে' বহুগুণ উত্তম বিনিময় দান করেন। বিশেষতঃ

বর্তমানে বহু ফেতনার ছড়াছড়ি। ইচ্ছা করলেই এর থেকে বেঁচে থাকা যায়। মনে করুন, আপনি বাজারে গেলেন; সেখানে চলে-চলছে বহু চালের পাপাচার।অনেক অশ্লীলতা-নির্লজ্জতাআর বিশ্রী-পচা গানবাজনা চলছে সেখানে। কেউ সেখানে কোনো হারাম কাজ বা চোখের গোনাহ করতে চাইলে, তা খুব সহজেই করা সম্ভব।আপনি কোনো হসপিটাল বা ভার্সিটিতে গিয়ে দেখুন, দেখবেন ছেলে-মেয়েরা কেমন অবাধ মেলামেশা আর চলাফেরা করছে, যেনো সে তার কোনো নিকটাত্মীয় বা রক্ত সম্পর্কীয়; গায়ের সাথে গা মিলাচ্ছে,হাত ধরাধরি করছে, আবার কখনও তাকে চুম্বন কিংবা আদর-সোহাগও করছে। এ মরণব্যাধিটি এখন ব্যাপকাকার ধারণ করেছে; কিন্তুমানুষ চাইলেইক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এ থেকে বাঁচা ও তা পরিহার করা সম্ভব।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেনো আমাদেরকে এসব ফেতনা-দুষ্কর্ম থেকে পাক-সাফ রাখেন; আমাদেরকে তাঁর আনুগত্যে লেগে রাখেন এবং প্রকাশ্য-অপ্রকশ্য সকল ফেতনা-বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন।আমিন।

এক সাহাবির প্রেম

এক সম্ভ্রান্ত সাহাবি ও এক মহিলার মাঝে জাহেলি যুগে প্রেম-সম্পর্ক ছিলো। যখন ইসলামের শুভাগমন ঘটলো, তখন সে সাহাবি ইসলাম কবুল করলেন।একদিন এক সঙ্কটময় মুহূর্তেএকে অপরের সাথে দেখা; তা ছিলো খুবই কোমল ও স্পর্শকাতর মুহূর্ত এবং নিজ-দেশে থেকে অনেক দূরে; ফলে মহিলার সাথে তিনি যে কোনো আচরণ করতে পারতেন। কে সেই সাহাবি? ঐ মহিলার সাথে তাঁর কী হয়েছিলো? ঐ অবস্থা থেকে আল্লাহ তাঁকে কীভাবে রক্ষা করলেন? তাঁর সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান কী ছিল? এই ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কি কোরআনে কোনো আয়াত নাযিল করেছেন?

তিনিহচ্ছেন সাহাবি মারসাদ ইবনে আবু মারসাদ আল-গনাবি রা.। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত

করলেন এবং ইসলামের খুঁটিগুলো মযবুত করে সাহাবায়ে কেরামকে ইসলামের বিধিবিধান শিক্ষা দিতে শুরু করলেন তখন একেক সাহাবি একেক কাজে লেগে গেলেন; যেমন হাদিস মুখস্থ, হাদিস লেখা, যুদ্ধাভিযানে বের হওয়া ইত্যাদি।

সাহাবি মারসাদ ইবনে আবু মারসাদ রা. ছিলেন কর্মতৎপর বীর-বাহাদুর বলিষ্ঠ একজন পুরুষ। তিনি ভালোভাবে হাদিস আয়ত্ত করতে পারতেন না, যেমন আবু হুরায়রা রা. করতে পারতেন; কিন্তু তিনি অন্যসব কাজে বেশ পারদর্শী ছিলেন; তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাফের কোরাইশদের নিকট মুসলিম বন্দিদের উদ্ধার করতে পাঠাতেন। মুসলিম বন্দিদের সেখানে হাত-পা বেঁধে রাখা হত। তিনি এসে দেয়াল টপকিয়ে ঘরে ঢুকে একজন একজন পিঠে বহন করে দূরে কোনো এক নিরাপদ স্থানে এনে বাঁধন খুলে দিতেন। এরপর তাঁদেরকে মদিনায় পালাতে সাহায্য করতেন। কোরাইশ ও মুসলিমদের মাঝে তখনো যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল। কোরাইশরা মুসলিমদেরকে বন্দি বা অপহরণ করার চেষ্টায় থাকত। একবার কাফের কোরাইশদের একটি দল তদোদ্দেশ্যে মদিনার দিকে আসল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার পাশে সদকার উট চড়াতে দিতেন। কোরাইশের সে দলটি আক্রমণ করেউটগুলো চুরি করে নিয়ে যায়; সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী কসওয়া এবং একজন মুসলিম নারীকে নিয়ে যায়, যে ঐ সময় উট চড়াচ্ছিলো; কিন্তু আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেন, তাই সে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। মুসলিমরা তাদের উপর যুলুম করত না. বরং তারাই প্রথম মুসলিমদের উপর যুলুম করে।যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

'যারা তোমাদের উপর যুলুম করবে তোমরাও তাদের উপর ঐ পরিমাণ যুলুমের বদলা গ্রহণ করো যে পরিমাণ তোমাদের উপর যুলুম করেছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যারা দীনদার-পরহেযগার, আল্লাহ তাঁদের সাথে আছেন'[১]

---

১. সুরা বাকারঃ ১৯৪

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

'আর মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ দ্বারাই দেওয়া হবে।'[২]

অর্থাৎ তোমরা আমাদের সাথে যেরূপ আচরণ করবে আমরাও তোমাদের সাথে সেরূপ আচরণ করব। তো মারসাদ রা. মুসলিম বন্দিদের চুরি করে মুক্ত করেতন।

একদিন মারসাদ রা. মক্কার উদ্দেশ্যে বেরুলেন। যে বাড়িতে একজন মুসলিম বন্দি ছিলো, সে-বাড়ির দিকে চুপেসারে অগ্রসর হতে হতে বাড়ির কাছে এসে পড়লেন। এরপর বাড়িতে তিনি ঢুকতে যাবেন অমনি তাঁকে এক মহিলা দেখে ফেলল; তার নাম ইনাক। এই মহিলাই জাহেলি যুগে মারসাদ রা.-এর প্রেয়সী ছিল। যখন একে অপরকে দেখে ফেললো,তখ তিনি দেয়ালের ছায়ায় লুকালেন; চাঁদের আলোতে তখন দেয়ালের ছা পড়েছিল। মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল, মারসাদ! স্বাগতম, তোমার আগমন শুভ হোক! তিনি কথা না বলে চুপ করে রইলেন। মহিলা বলল, হে মারসাদ! আসো, একসাথে রাত কাটাই। তিনি বললেন, হে ইনাক! আল্লাহ ব্যভিচার হারাম করেছেন; অথচ তখন তিনি নিজ-ভূমি থেকে দূরে অন্য গ্রামেপাহাড়ের উপত্যকায় ছিলেন। রাতের আঁধারে দেয়ালের ছায়ায় লোকচক্ষুর অন্তড়ালে ছিলেন; আল্লাহ ছাড়া তাঁকে কেউ দেখছিলো না। তিনি আত্মগোপন করে আছেন। এক দিকে ঐ মুসলিম বন্দি মুক্তির অপেক্ষায় আছে, অপর দিকে এ মহিলা তাঁকে ডাকছে এবং তিনি ভিনদেশে আছেন। এখানে এমন কোনো মুসলিম বা অমুসলিম নেই যে তাঁকে পর্যাবেক্ষণ করবে।তিনি আল্লাহকে পরোয়া না করে যদি তা করতে চাইতেন তবে অতি সহজেই তা হয়ে যেতো; কিন্তু তিনি বললেন, হে ইনাক! আল্লাহ ব্যভিচার হারাম করেছেন। সে বলল, আরে এসো, এখানে আমাদের কেউ দেখবে না। তিনি বললেন, না; হে ইনাক! আল্লাহ তো ব্যভিচার হারাম করেছেন। মহিলা বলল, এসো, নইলে চিৎকার

---

২. সুরা শুরা: ৪০

এইতো দিলাম...। তিনি মহিলার সামনে থেকে দৌড় দিবেন, অমনি সে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, হে কোরাইশের লোকেরা! হে কোরাইশের লোকেরা! এই যে এই লোক তোমাদের বন্দিদের ছিনিয়ে নিতে এসেছে, সে তোমাদের বন্দিদের নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তাকে ধরো...। এই আওয়ায শুনে অনেকেই সেদিকে ছুটে গেল এবং তাঁকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল; কিন্তু ততক্ষণে তিনি এক বাগানে লুকিয়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণ পর যখন খোঁজাখুঁজি বন্ধ হয়ে গেল, তখন আবারও তিনি ঐ বাড়িতে আসলেন। আপনারা এমন সাহসিকতা কি কখনো দেখেছেন না শুনেছেন!? তিনি একথা বলেননি, আলহামদুলিল্লাহ, কোনো রকম প্রাণে বেঁচেছি; বরং তিনি বলেছেন, আমার একটা লক্ষ্য আছে; যে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে আমি মক্কায় এসেছি তা পূর্ণ না করে আমি মক্কায় যাচ্ছি না; তাই তিনি মদিনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে বলেন নি, আলহামদুলিল্লাহ, তারা তো আমাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল। আল্লাহ আমকে বাঁচিয়েছেন, আমি কোনো রকম জান নিয়ে মদিনায় ফিরতে পেরেছি। বরং তিনি আবার এসে দেয়াল টপকিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়েন এবং বন্দিকে পিঠে বহন করে দরজা খুলে বের হয়ে আসেন। তারপর দূরে এক নিরাপদ স্থানে এসে বন্দির বাঁধন খুলে দিলেন। এবার তারা মদিনা পানে হাঁটা শুরু করলেন।

বেশ কয়েকদিন চলার পর তাঁরা মদিনায় এসে পৌছলেন। মক্কা-মদিনার মাঝে পাঁচশত কিলোমিটার দূরত্বের পথ। তাঁরা এ পুরো সফরে কখনো গিরিপথআর কখনো মরুপথ অতিক্রম করেছেন। এখন আপনি মারসাদ রা. ও তাঁর সঙ্গী সাহাবির চিত্রটি একটু মনে ধারণ করুন, বিস্ময়ে ভরে যাবে আপনার মন। তাঁরা কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো উটের পিটে চড়ে আরোহণ করেছেন। অপর দিকে মারসাদ রা. মক্কা মদিনার এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছেন আর তাঁর মন-মগজে ইনাকের কথা ঘুরপাক খাচ্ছে এবং স্মরণ হচ্ছে রাতের ঐ নিরালামুহূর্তের কথাও। আবার পূর্বের দুঃখ-কষ্ট ও ভালোবাসার স্মৃতিগুলোও তাঁর মনে ফের জেগে উঠছে। তিনি পায়ে হাঁটছেন বা উটে আরোহণ করছেন, তাঁর মন শুধু সে মহিলাকে নিয়েই ভাবছে। এভাবে একদিন-দুইদিন করে অতিবাহিত হচ্ছিল আর মদিনা কাছে আসছিল। অবশেষে তাঁরা মদিনায় এসে পৌছলেন।

Contents

বন্দি পরিবারের কাছে গেল আর মারসাদ রা. মসজিদে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং ঘটে যাওয়া সবকিছুর বিবরণ দিলেন। তিনি ঐ মহিলাকে ভালোবাসেন এবং তাঁর সাথে পুর্ব-সম্পর্কের কথাও জানালেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি ইনাককে বিয়ে করতে পারি? তাকে স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করতে পারি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবললেন, হে মারসাদ! আল্লাহ ব্যভিচার হারাম করেছেন। তিনি (মারসাদ রা.) বললেন, আমি কি তাকে কি বিয়ে করতে পারি? তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন-

الزَّانِيْ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

'ব্যভিচারি পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিবাহ করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।'[১]

আল্লাহ তাআলা পূর্ণাঙ্গ সমাধান নাযিল করলেন। মারসাদ রা. প্রথমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুধু পরামর্শ করতে এসেছিলেন; কিন্তু সেখানে এসে পূর্ণাঙ্গ সমাধান পেয়ে গেলেন। এটাই শরয়ি নিয়ম। মানুষ যখন কোনো সমস্যায় পড়বে, তখন কর্তব্য হল কোনো অনুগ্রহশীল ও কল্যাণকামী মুরব্বি বা শায়খের কাছে তা পেশ করা। অথবা মা-বাবা বা কোনো বুঝমান বড় ভাইয়ের কাছে বলা, যে তাঁকে কোনো অন্যায় কাজে প্ররোচিত করবে না; যাতে সমস্যার সমাধান হয়। মারসাদ রা. যখন অনুভব করলেন, তার মন পূর্বের অবস্থার দিকে ঝুঁকছে তখন তিনি মনকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেননি। বরং তিনি মনের ডাক্তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বলেছেন। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি একটি প্রেমরোগে আক্রান্ত হয়েছি। ইনাকের প্রতি আমার ভালোবাসা

---

১. সুরা নুর: ৩

উথলে উঠতেছে। আমি ইনাককে বিয়ে করে ফেলি? তাকে বিয়ে করব কি? তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উত্তরণের সরাসরি পন্থা বলে দিয়েছেন ।

এখন প্রশ্ন হল, এটা কি তাঁর ও ইনাকের মধ্যকার সমস্যার সমাধান? 'ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী নারী বা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করবে।' এ আয়াতের কী অর্থ? এ আয়াত কি শুধু একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, না আমাদেরকে কোনো ফিকহি বিধান সম্পর্কে জানান দিচ্ছে? এটাও আমাদেরকে ভলোভাবে বুঝতে হবে, যাতে আমরা যথাযথভাবে সমস্যার সুরাহা করতে পারি।

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

'ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেবিবাহ করবে।'[১]

আল্লাহ তাআলার এ বাণীর অর্থ, যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে; তা থেকে তাওবা করে না– তার সাথে যে নারী বিবাহে সম্মত হয় সে ব্যভিচারিণী নারীর মতই অনিষ্ট হবে। এটা কীভাবে? অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, ঐ নারীর ব্যভিচারের গোনাহ হবে; কিন্তু এ ব্যক্তি যখন সহবাস ও মেলামেশা করবে, তখন সে স্ত্রী ও বেশ্যা নারীদের মাঝে কোনো পার্থক্য করবে না। সে একবার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে, অন্যবার অন্য নারী সাথে মিলিত হবে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এর মাঝে আর তার মাঝে শুধু একটি শরয়ি বন্ধন রয়েছে। সুতরাং সে তার দৃষ্টিতে অন্যান্য বেশ্যা নারীর মতই মনে হবে; ফলে সেও বেশ্যা নারীর মত হয়ে যাবে। এর অর্থ এ নয় যে, তার ব্যভিচারের গোনাহ হবেঅথবা সে কোনো মুশরিকা নারীকে বিবাহ করবে– যে তার সাথে কোনো ব্যভিচারী পুরুষ মিলিত হওয়া পছন্দ করে যেমন তার সাথে তার স্বামী মিলিত হয়।এ কারণে যে ব্যক্তি ব্যভিচারী বলে পরিচিত (আল্লাহর পানাহ) তার কাছে কাউকে বিবাহ দেওয়া ঠিক নয়। এমন হুকুম ঐ নারীর ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে, যার ব্যভিচারী হওয়ার বিষয়টি সমাজে পরিচিত; তাকে বিবাহ করা ঠিক হবে না। অবশ্য যে

১. সুরা নুর: ৩

Contents

তাওবা করে ভাল হয়ে গেছে এবং অবস্থার সংশোধন হয়েছে তার কথা ভিন্ন। আর যে পুনরায় তাতে ফিরে যাবে,আল্লাহ তার প্রতিশোধ নিবেন।আল্লাহ যখন তাওবার কারণে শিরিকসহ অন্যান্য সব বড় গুনাহ ক্ষমা করে দেন, তখন ব্যভিচারের গোনাহের ব্যাপারে আপনার কী ধারণা? অনুরূপ কথা ব্যভিচারিণী নারীর ক্ষেত্রেও। যখন সে তাওবা করে ভালো হয়ে যাবে এবং তার অবস্থার সংশোধন হবে তখন তাকে কোনো মুমিন বিবাহ করতে পারবে; কিন্তু তাওবার পূর্বে যে তাকে বিবাহ করবে তাকেও ব্যভিচারী হিসাবে মনে করা হবে।

তো, যখন কোনো ব্যক্তি দীনি বিষয়ে সমস্যার কারণে অন্যের কাছে যায় তখন সে ভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর মনে কোনো বিষয়ে খটকা-দ্বিধা বা সন্দেহ লাগলে সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে সমাধান চাইতেন। পূর্বের ওলামায়ে কেরামও এভাবে তাঁদের শায়খদের কাছে যেতেন। ছাত্ররা ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর কাছে এসে সমস্যার কথা জানাতেন। বলতেন,শায়খ! আমার মনে এমন এমন কথা অনুভব করছি। এর কোনো সমাধান আছে কি? এভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়িরহিমাহুমুল্লাহর কাছেও তাঁদের ছাত্ররা আসতো এবং সমস্যার সল্যুসন খুঁজতো। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ

'আর যখন তাদের কাছে কোনো শান্তি বা ভীতিকর কোনো সংবাদ পৌঁছে, তারা তা (যাচাই না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়।'

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

'আর যদি তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবা তাদের কর্তৃত্ববান লোকদের কাছে নিয়ে যেতো, তাহলেতাদের মধ্যে যারা তথ্যানুসন্ধানী–

তারা এর যথার্থতা জেনে নিতো। এবং (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হতো, তাহলে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ছাড়া সবাই শয়তানের অনুসরণ শুরু করতো!'[১]

আল্লাহ তাআলা আদেশ করছেন যে, যখন কোনো ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিবে তখন কর্তব্য হবে সেই ব্যাপারটি নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারস্থ হওয়া। তাঁর জীবদ্দশায় যেমনটি সাহাবায়ে কেরাম করতেন। আর তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁদের কর্তৃত্ববান, আলেম-উলামা বা জ্ঞানী-গুণীজনদের শরণাপন্ন হওয়া। যেনো তাঁরা ব্যাপারটির সমাধান করে দেন।

এ কারণে হানজালা রা.-এর মনে যখন কোনো বিষয়ে খটকা লাগতো তখন তিনি সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হতেন অথবা যিনি সমাধান দিতে পারবেন তাঁর কাছে বিষয়টি শেয়ার করতেন। একবার আবু বকর রা.-এর সাথে হানাজালা রা. দেখা করলেন। তাঁকে বললেন, হানজালা তো মুনাফেক হয়ে গেছে! আবু বকর রা. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তো কীভাবে হলে? তিনি বললেন, যখন আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকি; জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে তাঁর আলোচনায় আমার অন্তর এতটা বিগলিত হয়, যেনো জান্নাত-জাহান্নাম আমার সামনে উপস্থিত; কিন্তু যখন তাঁর কাছ থেকে চলে এসে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে হাসি-রসিকতা করি তখন এর অধিকাংশটাই ভুলে যাই। আবু বকর রা. বললেন, এমন অবস্থা তো আমিও অনুভব করি। যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থাকি তখন আমার কলব এতটাই নরম হয়, যেনো আমি জান্নাত-জাহান্নামের সামনে অবস্থান করছি; কিন্তু সেখান থেকে চলে গেলে সেই নম্রতা আর বাকি থাকে না।

পাঠক! এটি একটি স্বভাবজাত ব্যাপার। আপনি যখন সালাত আদায় করবেন বা দোয়া-দরুদ পড়ে কাঁদবেন তখন আপনার মন স্বভাবতই নরম হবে। আর যখন সালাত বা দোয়া শেষ হবে তখন আপনার মন আগের

১. সুরা নিসা: ৮৩

অবস্থায় ফিরে যাবে;ঐ নরম অবস্থা আর থাকবে না, অথবা অন্ততপক্ষে কিছুটা হলেও কমে যাবে। তো আবু বকর রা. হানজালা রা. কে বললেন, চলো আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই।

বর্তমানে আলেম-উলামার সাথে যোগাযোগ করা এবং তাঁদের কাছে সমস্যার কথা বলা সহজ হয়ে গেছে, কারণ বিভিন্ন মজলিসে এবং নামায পড়তে গিয়ে বা মোবাইল ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁদের সাথে কথা আদান প্রদান করা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। কোনো প্রসিদ্ধ আলেম বা কোনো প্রসিদ্ধ দায়ির কাছে যাওয়া শর্ত নয়। যিনি বেশি ব্যস্ত থাকেন, আপনি তাঁর কাছে যাবেন না। বরং আপনি প্রত্যেক এমন বক্তির কাছে যান যাঁর কাছে শরয়ি ইলম আছে, যদিও তিনি তেমন একটা প্রসিদ্ধ নন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল, যাঁর কাছে আপনি যাবেন তাঁর কাছে যেনো এই পরিমাণ শরয়ি ইলম থাকে, যা দিয়ে তিনি আপনার সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন। যেমন হানজালা রা. আবু বকর রা.-এর কাছে গিয়েছিলেন, কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তাই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপস্থিতিতে আবু বকর রা.-এর শরণাপন্ন হয়ে বলেছিলেন, হানজালা তো মুনাফেক হয়ে গেছে।

যাই হোক, এরপর তাঁরা উভয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। হানজালা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! হানজালা তো মুনাফেক হয়ে গেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা কীভাবে? তিনি বললেন, আমরা যখন আপনার কাছে থাকি আর আপনি জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন আমাদের কলব এতটা নরম হয় যেনো জান্নাত-জাহান্নাম আমাদের সামনে উপস্থিত। অন্যদিকে যখন আপনার কাছ থেকে চলে আসি এবং স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে হাসি-মজা করি, তখন আমরা এর অনেকটাই ভুলে যাই। হানজালা রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি অন্তঃকরন সমস্যাকে খোলাখুলিভাবে পেশ করেছেন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তৎক্ষণাত এর সমাধান করেছেন। তিনি যদি ব্যাপারটিকে আমলে না নিতেন, মনের ভিতর রেখে দিতেন এবং মন

থেকে এর কল্পনা-জল্পনা বের করে দিতেন, তবে হয়তো এটিই তাঁকে প্রকৃত নেফাকের দিকে নিয়ে যেতো। অথবা তিনি একসময় বলতেন, আমি তো মুনাফেক। আমি সালাত সিয়াম করব কেনো? হয়তো শয়তান তাকে এতদূর পর্যন্ত ঠেলে দিতো; কিন্তু তিনি কাল বিলম্ব না করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে গেছেনএবং বলেছেন, আপনার কাছে থাকাকালীন আমাদের অন্তর নরম থাকে; আপনার কাছ থেকে চলে গেলে অন্তর পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে হানজালা! আমার কাছ থেকে যাওয়ার পরও যদি তোমাদের সে অবস্থাই থাকত, তাহলে ঘর-বাড়ি এবং পথে-ঘাটে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে মোসাফাহা করত; কিন্তু হে হানজালা! এটা একসময় আর ওটা ভিন্ন সময়।' অর্থাৎ একটা সময় ভয়-ভীতি আর কান্নাকাটি হবে; আরেকটা সময় হাসি-রসিকতা আর আনন্দ-বিনোদন হবে।

এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরও কর্তব্য হবে মারসাদ রা.-এর মত কাজ করা। সমস্যা নিয়ে সরাসরি কোনো কল্যাণকামী-হীতাকাঙ্ক্ষী আলেম বা মুরব্বির কাছে যাওয়া। তাই কোনো যুবক বা যুবতী কোনো সমস্যায় পড়লে করণীয় হবে সত্বর কোনো অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত আলেম বা শায়খের কাছে যাওয়া। আর এঁদের কর্তব্য হবে মনোনিবেশের সাথে তাদের সমস্যার কথা শোনা এবং সমস্যা সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করা; বিশ্বস্ততা ও কর্তব্য-পরায়ণতার পরিচয় দেওয়া। তাহলে তাদের সমস্যা আর সামনে এগুবে না এবং সব জায়গায় তাচ্ছিল্যের শিকার হতে হবে না। আর সাবধান! আপনার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ রাখুন এবং এর একান্ত বিষয়টিকে ঝেড়ে ফেলুন; যাতে অন্য কেউ এ গোপন বিষয় সম্পর্কে জানতে না পারে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে মিনতি! তিনি যেনো আমাদের সকলকে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদেরকে উপকৃত ও উপকারী হিসেবে মনোনীত করেন। আমিন।